শিখা গ্রন্থমালা

প্রথম প্রকাশ

বৈশাখ—১৩৬৭

প্রকাশক

শ্রীঅমিয়কুমার ভট্টাচার্য

৪২বি, হরমোহন ঘোষ লেন

কলিকাতা-১০

মুদ্রক

শ্রীনিশিকান্ত হাটই

তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৬, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

ভূমিকা

১৯৪২ সাল হইতে দমদমে সারা বাঙলা দেশের বহু অভিজ্ঞ কর্মীর সহিত একত্রে কয়েক বৎসর যাপন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। তখন মনে হইয়াছিল, সকলের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া গোটা বাঙলা দেশের একটি চিত্র রচনা করা যাইতে পারে। এই ক্ষুদ্র পুস্তক সেই চেষ্টারই ফল। যাঁহাদের সহায়তায় ইহা রচনা করা সম্ভব হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে আজ সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করিতেছি। তাঁহাদের নাম শেষে সন্নিবিষ্ট হইল।

বন্ধুবর বিনয়কৃষ্ণ দত্ত দীর্ঘদিন ধরিয়া দর্শক নামক সাপ্তাহিকে এই লেখা-গুলিকে স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে ও উদ্যমের ফলে বিভিন্ন জেলার বৃত্তান্ত একত্র হইয়া পুস্তিকার আকার ধারণ করিয়াছে। শ্রীযুক্তা উষা সেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের মানচিত্র অঙ্কনের শিল্পীগণের নিকটেও আমার ঋণ অপরিসীম। তাঁহারা আমার দমদমে আঁকা মানচিত্রগুলি হইতে বর্তমান মানচিত্রগুলিকে শুদ্ধভাবে আঁকিয়া দিয়াছেন।

১৯৪২ এর পরে বাঙলা দেশের চেহারা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থান অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে। দেশের পুরাতন রূপ আর নাই। তবু বাঙ্গালী মাত্রের নিকটে জন্মভূমি চিরকালই প্রিয় থাকিবে এই বিশ্বাসে পুস্তিকাখানি প্রকাশণের বিষয় রাজি হইয়াছি। ইহার সাহায্যে দেশকে, দেশের মাটি ও মানুষকে, তাহাদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট, হাট বা মেলার সম্বন্ধে যদি আমাদের অনুরাগ এবং অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

যাঁহারা তথ্যসংগ্রহের ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বাখরগঞ্জ: বিনোদ কাঞ্জিলাল, কলস কাঠি। নির্মল ঘোষ, গাভা। অশ্বিনী গাঙ্গুলী, নাথুল্লাবাদ।

ফরিদপুর: পঞ্চানন চক্রবর্তী, মাদারিপুর। মনোরঞ্জন গুহ, মোচনা। নগেন্দ্র-শেখর চক্রবর্তী, ইদিলপুর। নির্মল ঘোষ (বরিশাল) পালং। প্রসূন দাশগুপ্ত, পিঞ্জুরি, কোটালিপাড়া। এন্তাজ আলি, মহাদেবপুর, মানিকগঞ্জ।

ঢাকা ঃ বিমলামোহন গাঙ্গুলী। অমর বল, কাঠিয়াপাড়া, বিক্রমপুর। এন্তাজ আলি, মহাদেবপুর, মানিকগঞ্জ।

মৈমনসিংহ ঃ বিনোদ চক্রবর্ত্তী, মানকোনা, মুক্তাগাছা। গিরীন দাস। পরেশ মৈত্র, এলাসীন, টাঙ্গাইল। বিনয় রায়, খলাপাড়া, নেত্রকোনা। দুর্গেশ পত্রনবীশ, বাররি, নেত্রকোনা।

ত্রিপুরা ঃ বলাইধর, কুড়িঘর, নবীনগর। নরেশ দেবগুপ্ত, নাটাই, ব্রাহ্মণবেড়িয়া। রেবতী দে, পাইকপাড়া, চাঁদপুর। সুরেন রায়, ভেপানগর, নবীনগর।

নোয়াখালী ঃ হারাণচন্দ্র ঘোষচৌধুরী, দত্তপাড়া। কালীকেশব ঘোষ, কাঠগড়, সন্দ্বীপ। রাজেন রায়, দুর্গাপুর, চৌমুহানি। অম্বিকা মজুমদার, দক্ষিণমন্দিরা, ছাগলনাইয়া। যোগেশ চৌধুরী, বাগমারা, পরশুরাম।

চট্টগ্রাম ঃ শ্যামাচরণ বিশ্বাস, গুজরা, রাউজন। মধুসূদন গুহ, পটিয়া। মৌলবী লোকমানখাঁ, সেরওয়ানি, পাঠানতলি।

পাবনা ঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস, হিমাইতপুর। বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সিরাজগঞ্জ।

রাজসাহী ঃ যতীন্দ্র মোহন রায়, বোয়ালিয়া, যশোহর এবং গনমঙ্গল, বগুড়া। দ্বিজেন তলাপাত্র, তাহেরপুর।

বগুড়া ঃ যতীন্দ্র মোহন রায়, গনমঙ্গল, বগুড়া। আজিজ উল বারি, বগুড়া।

দিনাজপুর ঃ সরোজকুমার বসু, রায়গঞ্জ। প্রিয়রঞ্জন সেন, দিনাজপুরে ১৯০২-৭, ১৯২১। যতীন্দ্রমোহন রায়, বগুড়া। হরিপদ সরকার, নীলফামারী, রঙ্গপুর।

রঙ্গপুর ঃ সতীন্দ্রনাথ গুহ, মোগলহাট ও রঙ্গপুর। নগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তী (ইদিলপুর), চিলমারিতে ৮ মাস। হরিপদ সরকার, নীলফামারী।

জলপাইগুড়ি ঃ প্রফুল্ল ত্রিপাঠী (কেশপুর, মেদিনীপুর) পাটগ্রাম, জলপাইগুড়ি। শশধর কর (সাঁথিয়া, পাবনা) জলপাইগুড়ি।

দার্জিলিং ঃ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মিতরা, মানিকগঞ্জ।

যশোহর ঃ জীবানন্দ ভট্টাচার্য, ইটনা, লোহাগড়া। প্রমোদ বসু, পাঁজিয়া।

খুলনা ঃ কিশোরী চট্টোপাধ্যায়, মানকা। শান্তিশরণ রায়, বারুইপাড়া।

নদীয়া ঃ বিমল চট্টোপাধ্যায়, রানাঘাট। নিতাই পাল চৌধুরী, শান্তিপুর। জগন্নাথ মজুমদার, যদুবয়রা, কুমারখালি।

মুর্শিদাবাদ ঃ বিজয়কুমার ভট্টাচার্য, কাঞ্চনতলা, জঙ্গীপুর। ছত্রপতি রায়,

কাদাই, বহরমপুর। জগদানন্দ বাজপেয়ী, প্রতাপপুর। নির্মলকুমার ভট্ট, খড়গ্রাম। সুধীর মুখোপাধ্যায়, গাঙ্গাড্ডা, জঙ্গীপুর।

চব্বিশপরগণা: চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, ডায়মণ্ডহারবাব।

বর্ধমান: বিজয়কুমার ভট্টাচার্য (কাঞ্চনতলা, জঙ্গীপুর) পূর্বে হরিপাল, হুগলী, বর্তমানে নবগ্রাম, বর্ধমান। জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী, চৈতন্যপুর, মঙ্গলকোট। বৈদ্যনাথ মজুমদার, অকালপৌষ, কালনা।

হুগলী: বিজয়কুমার ভট্টাচার্য, কাঞ্চনতলা, জঙ্গীপুর।

বাঁকুড়া: বিজয়কুমার ভট্টাচার্য, কাঞ্চনতলা, জঙ্গীপুর। ভবতারন চক্রবর্তী, বাগডহর, পাত্রসায়ের। রামলোচন মুখোপাধ্যায়, অমরকানন, বিসিন্দ্যা, গঙ্গাজলহাটি।

মেদিনীপুর: বিপিন অধিকারী, ভবানীচক, এগরা। গোবিন্দসুন্দর সিংহ, গড়বেতা। ধূর্জ্জটীকুমার ভট্টাচার্য, পঁচেট কাঁথি। ভূপালচন্দ্র পাণ্ডা, নন্দীগ্রাম।

বীরভূম: সৌরীন্দ্র সেন, সিরশে। দুর্গা চট্টোপাধ্যায়, দাস পলসা।

নির্মলকুমার বসু

সূচীপত্র

চট্টগ্রাম

মাটি :—পাহাড় অঞ্চলে কাঁকর ও বালি মেশান মাটি ; সমতলভূমি আঠাল ; নদীর কাছে বর্ষার কয়েকদিন বান হয় ও পলি পড়ে। সীতাকুণ্ডের নিকট হইতে দক্ষিণ দিকে ছোট খাট উঁচু নীচু পাহাড়িয়া জমি আছে। নদনদী—কর্ণফুলী নদীতে লাহাজাবি রেল লাইনের জন্য পুল (ও তাহার রক্ষার জন্য লোহার অনেক থাম) এবং সমুদ্রগামী জাহাজের জন্য মোহনার কাছে বাঁধ দেওয়ার ফলে পুলের উত্তরাংশে নদীর বান বেশী দিন ধরিয়া থাকে, ফলে ধান নষ্ট হইয়া যায়। পূর্বে বান শীঘ্র নামিয়া যাইত এবং পলি পড়ার জন্য ঐ সব জমি লাভবান হইত। পুলের কাছাকাছি জলের ধারা কমিয়া যাওয়ায় বহু নূতন চড়া পড়িতেছে এবং জল অগভীর হইয়া গিয়াছে। হালদা প্রভৃতি পার্বত্য নদীতে শীতের সময় অল্প জল থাকে, বর্ষায় জল ভরিয়া আসে।

কূয়া, পুষ্করিণী ইত্যাদি :—পূর্বে পুষ্করিণীর খুব চলন ছিল, আজকাল মজিয়া যাইতেছে। এমন কি কেহ কেহ খাল কাটিয়া পাহাড়িয়া নদীর জল পুকুরে আনিয়া পলির দ্বারা পুকুর ভরাট করেন। নলকূপের প্রাদুর্ভাবে পুকুরের আদর কমিয়া গিয়াছে। নওপাড়া গ্রামে বহু দীঘি আছে, জেলার সর্বত্র পুষ্করিণী দেখা যায়।

নলকূপের জল আঠাল মাটিযুক্ত অঞ্চলে লোহার গন্ধযুক্ত ও কষা হয়। পাহাড়িয়া অঞ্চলে, বালিযুক্ত মাটিতে গন্ধ অল্প হইলেও কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবার পর গন্ধ চলিয়া যায়। ফটিকছড়ি এবং রাঙ্গানিয়া থানার সর্বত্র ও রাউজান এবং হাট হাজারির অংশ বিশেষে নলকূপে পাম্পের প্রয়োজন হয় না, অবিশ্রান্ত ফোয়ারার মত জল উঠে। সেই জলধারা নালার সাহায্যে মাঠে মাঠে বিতরণ করিয়া চাষীরা চাষের সুবিধা করিয়া লয়।

চাষ :—ধানই প্রধান, সমতল ভূমিতে আমন এবং আউস দুইই হয়, পাহাড়িয়া অঞ্চলে আউস ধানই বেশী। পাট খুব কম, গৃহস্থ স্বীয় প্রয়োজন অনুসারে করিয়া লয়।

ডালের মধ্যে মাষকলাই এবং মুগ কলাই জেলার সর্বত্র হয়, খেসারি কম, ধানের আগা কাটার আগে, মাটি কর্দমাক্ত থাকিতে থাকিতে মাষ কলাই বুনিয়া দেয়, সময় মত কাটে।

তুলার কিছু চাষ জেলায় আছে, তাহা রাঙ্গানিয়া অঞ্চলে বেশী। [চাকমারা জুমে ধান, কাপাস, আখ প্রভৃতির চাষ করে।] রাঙামাটি অঞ্চল হইতে বেশী আসে।

জেলার উত্তর ভাগে আখের চাষ আছে, সীতাকুণ্ডের গুড় বিখ্যাত।

সারা জেলায় মরিচের (লঙ্কা) চাষ হয়, ব্যবহারও যথেষ্ট। তরিতরকারী বেশ উৎপন্ন হয়। কর্ণফুলী নদীর পাড়ে লাম্বুর হাটে সপ্তাহে দুই দিন তরিতরকারীর বড় হাট বসে।

সুপারি :—পাৎলা ছাল (খোলে) বর্ষায় চালান যায় ও নারিকেল কিছু কিছু সর্বত্রই আছে। বোয়ালখালি থানার কন্তুরীখাল এবং সাকপুরা নামক দুইটি গ্রাম সুপারী বাগিচার জন্য প্রসিদ্ধ।

পাহাড় অঞ্চলে ছন ও বাঁশ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পাহাড়ে পাইয়া বাঁশ নামক এক প্রকার বাঁশ হয়, তাহা ঘরের বেড়া নির্মাণ করিতে লাগে। নীচু জমিতে অপেক্ষাকৃত মোটা বাঁশ হয় তাহা খুঁটির কাজে ব্যবহৃত হয়।

চালানি সরিষার তেলে জেলার কাজ প্রধানতঃ চলে।

চা :—জেলায় আট-দশটি চায়ের বাগান আছে। ইংরাজ, বাঙালী, মাড়োয়ারির কারবার।

দুধ : -জেলার প্রয়োজন মত হয়। হাটে বাজারে যথেষ্ট বিক্রয় হয়। গোয়ালা এবং ভদ্রলোকেও দুধের ব্যবসা করে। (দুধের বিষয়ে চট্টগ্রামের সুখ্যাতি ত্রিপুরা, নোয়াখালিবাসিগণের নিকট নাই)।

খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি : -সীতাকুণ্ডের আখের গুড়—(রাঙামাটি ও কক্সবাজারেও ভাল হয়)—এর কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। দুধের খাবার হয় না বলিলেই চলে, শুধু সহরে বাজারে পাওয়া যায়।

রাউজনের চিঁড়া প্রসিদ্ধ, সর্বত্র চলে। জেলার সর্বত্র খৈ খুব চলে (বিধবারা রাত্রে শুধু খৈ খান)। সহরে মুড়ি ও খৈ-এর চলন বেশী বলিয়া মনে হয়।

মাছ :—প্রচুর শুঁটকি মাছের ব্যবহার জেলার সর্বত্র আছে। মহিষখালি, কক্সবাজার অঞ্চলে বেশী তৈয়ারী হয়। এখানে মগেরা করে। চট্টগ্রামের হিন্দু জেলেরা নোয়াখালি ও বরিশালের মধ্যে রাঙ্গাবালি ও সোনাবালি দ্বীপে সুস্বাদু শুঁটকি তৈয়ারী করিয়া চাটগাঁতে আনে ও বিক্রয় করে। মাছের ব্যবসায়

হিন্দু জেলেদের হাতেই আছে। কর্ণফুলীর উপরে হালদা নদীর মোহনায় মস্ত বড় মাছের বাজার ও ব্যবসায় কেন্দ্র আছে (চাকতাই বাজার—এখান থেকে আসাম বর্মা অঞ্চলে চালান যায়) বহু পাকা ইমারতও এখানে জেলিয়াদের চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে। চট্টগ্রামের হিন্দু জেলেরা ব্রহ্মদেশে (মৌলমিনের নিকট?) নিজেদের লোক দিয়া শুঁটকি করাইয়া বড় বড় শামপানে হালদা নদীর মোহনায় লইয়া আসে। জেলার প্রয়োজনের অনুপাতে শুঁটকি সামান্যই তৈয়ারী হয়।

মাংস :—মুরগীর জন্য চট্টগ্রাম বিখ্যাত।

ঘর :—জেলায় মাটির একতালা, দোতলা কোঠাই বেশী, তাহার চাল টিনের হয়। নিতান্ত গরীব গৃহস্থ বাঁশের বেড়া বুনিয়া দেয়। ছনের চালেরও বেশ চলন আছে। [যুদ্ধের পূর্বে মাটির ঘর তোলার দর ছিল: একতলা লম্বা যত হাত প্রতিহাত ১৵০ ; দোতলা ১॥০—রাউজান থানার গুজরা গ্রামের দর।] ঘর নির্মাণের কারিগর হিন্দুই বেশী। মুসলমানরা ধান কাটার পর মাটি কাটা, পুকুর কাটা ইত্যাদি কাজ বেশী করে।

চাকমা জাতি মাচার উপরে ঘর বানায়, আরাকানিদেরও সেই রকম, তবে ঘর দুয়ার আরও ভাল, বাঁশের ঘরের উপরিভাগকে (সিলিং-এর উপর!) 'দমদমা' বলে।

জ্বালানি :—কাঠ সর্বত্র ব্যবহার হয়, যথেষ্ট পাওয়াও যায় ; কেননা নিকটে পাহাড় ও জঙ্গল অনেক, বৃষ্টিও প্রচুর।

চাকমা জাতি চৈত্র মাস নাগাদ জুমের জন্য জঙ্গল কাটে। তাহার পর বর্ষার প্রচণ্ড বৃষ্টিতে সেই সব কাঠ ও বাঁশ হালদা এবং কর্ণফুলীর স্রোতে ভাসিয়া আসে। জেলেরা ধরিয়া জমা করে, ধরিতে গিয়া কেহ কেহ জখম হয় [রেলের পুলে বড় বড় গুড়ির আঘাত না লাগে তাহার জন্য পুলের কিছু আগে লোহার থাম নদীগর্ভে পোঁতা আছে। সেগুলিতে ঘা খাইতে খাইতে গাছগুলির পুলকে জখম করিবার শক্তি আর থাকে না। কিন্তু স্রোত প্রতিহত হওয়ার ফলে পার্শ্ববর্তী গ্রামে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বন্যা হয়, ইহার ফলে শস্য হানির কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

গোবরের ঘুঁটেও যেমন হয় তেমনই 'ঘুঁটের লাঠি' তৈয়ারী করে। একটি সরু বাঁশের (২।১ হাত) উপরে টিপিয়া টিপিয়া গোবর জমান হয়, ইহা বেশ জ্বলে।

শিল্প :—রাঙ্গনিয়া, রাউজান থানায় কিছু তাঁতি আছে। চাকমারা মণিপুরী তাঁতে ছোট বহরের কাপড় বুনিয়া লয়।

মুসলমানেই তেলির কাজ করে। হিন্দু তেলিরা তেলের ব্যবসায় আজকাল করে না, ব্যবসায়ের দ্বারা অনেকেই বেশ ধনী হইয়া সামাজিক উচ্চপদের মর্যাদা লাভের চেষ্টা করে।

নৌকার মাঝি ৭৫% মুসলমান কিন্তু জেলের কাজ ও মাছের ব্যবসায় হিন্দুরাই বেশী করে। মাছের কাজে জেলেরা ব্রহ্মদেশে যথেষ্ট যায়।

মাটিকাটা ইত্যাদি কাজ মুসলমানরা বেশী করে, চট্টগ্রাম বন্দরে কিন্তু হিন্দু, মুসলমান এবং উড়িয়া মজুর যথেষ্ট, ইহাদের অধিকাংশ চট্টগ্রামের অধিবাসী নয়।

বাঁশ :—তলই (চ্যাটাই—ধানকলে খুব ব্যবহার হয়), ছাতার বাঁট (মধ্যবিত্ত, চাটগাঁ শহরে)। কাগজের কলে, ছাতার বাঁট, জাহাজের কামরার ছাত (সিলিং) করার জন্য যথেষ্ট চালান যায়। স্থানীয় মহাজনেরা (হিন্দু ও মুসলমান) এই ব্যবসায় করে।

পাটি :—যুগীজাতি (হিন্দু, অ-জলচল, মরিলে মাটি দেয়) এই পাটি করে। জেলার বহু অংশে হয়। সাতকানিয়ার কাছে ভাল পাটি হয়। পাটি যে কাঠি হইতে হয় তার ভিতরের আঁশ দিয়া ঠোঙা বাঁধা হয় সেজন্য ইহা অন্যত্রও চালান যায়।

চাটাই :—সেলপাতা (হোগলা) মুসলমান মেয়েরা বেশী করে ও সকলেই ব্যবহার করে।

মাটির বাসন :—মির্জাপুর, কালিপুর (সাতকানিয়া থানা) খুব মিহিমাটির বাসন হয়, কুমোর হিন্দু ('কুলাল' উপাধি) ও মুসলমানেরা করে।

কাগজ :—পটিয়া থানা কাগজিপাড়াতে মুসলমানেরা করে। পোয়াল (খড়), পাট, পুরাণো কাপড় দিয়া করে। সাদা ও বাদামী কাগজ করে। এখন এই শিল্প মৃতপ্রায়।

জাল :—মুসলমান গৃহস্থেরা সাতকানিয়া গ্রামে খুব বেশী জাল করে। বর্মা আসাম পর্য্যন্ত চালান যায়। তা ছাড়া জেলেরা (হিন্দু) জাল প্রয়োজন মত করিয়া লয়।

লুঙ্গি :—তাঁতের সুতি লুঙ্গি সাতকানিয়া ইত্যাদিতে হয়। কক্সবাজার বা রাঙ্গামাটিতে জুম্মা (যারা জুম করে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়), মগ, চাকমা, পোয়াঙ।

(রাঙামাটি হইতেও আরও অভ্যন্তরে থাকে) ছোট তাঁতে রেশমের ছোট ও সারের থান করে।

জোঁর :—(পেক) সুন্দরবন থেকে পাতা চালান যায় (কুরুপপাতা বলে, এতে ঘরও ছায়) ও তাইতে বর্ষার জন্য পোক বা জোঁর তৈয়ারী করে। বাজারে বিক্রয় হয় ।/০, ।৶০।

চামড়া :—চট্টগ্রামের কাছে মোগলটুলিতে যথেষ্ট চামড়া পাকাই হয়। মুসলমানেরা করে। হামজারবাগ ও চারিয়া (সহরের কাছে) আধপাকা করিয়া চালান দেয়। এ কারবার মুসলমানে করে, একজন ধনী পাঞ্জাবী মুসলমান আছেন। সম্প্রতি চামড়া পাকানর জন্য একটি লিমিটেড কোঃ হইয়াছে, কাজ আরম্ভ হয় নাই।

দড়ি :—পাঠানটুলি, মোগলটুলি, মাদারবাড়ী, আগরাবাদ আলাদি (ষ্টিমার বাঁধার কাছি) পাওয়া যায়। [সমুদ্রের ও কর্ণফুলীর কাছে বলিয়া আবহাওয়ার কারণে ভাল দড়ি করা সম্ভব। অন্যত্র দড়ি এত ভাল করা যায় না] শন উদাল গাছের ছাল দিয়াও করে। গৃহস্থেরা এই দড়ি নিজেরা ব্যবহার করে। এই দড়ি জলে নষ্ট হয় না এবং মজবুত, পাট, কাতা, ইস্তক (হিঃ মোরব্বা) ইত্যাদি দিয়া তৈরী হয়। দড়ি নানাবিধ তেলের আলাদি (তেলের মধ্যে চুবান হয় বলিয়া ওয়াটার প্রুফ), কাতার আলাদি, ইস্তকের আলাদি, দোতন, ধাতন, লইত (সরু), সুতি, সুতলি, টপলাইন (জালের উপর যে শক্ত সুতা থাকে), টঁওর।

আলাদি পাড়ায় শুধু আলাদি তৈরী হয়।

ইতালি থেকে মালয় সিংহল-বর্মা পর্যন্ত সব জায়গায় একাধিপত্য ছিল। এখন পাঠানটুলি-আগরাবাদ যৌথশিল্প সমিতি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আজকাল এই ব্যবসায় সম্পূর্ণ দখল করিয়াছে।

ডোরা :—চরকায় কাটা রঙীন সুতার ডোরা মুসলমান মেয়েরা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত চুলের মত ব্যবহার করে। বড়লোকেরা জরির ডোরা পরে। মোগলটুলির অন্তর্গত ডোরাপাড়ায় যথেষ্ট হয় (মেয়েরা করে)। মুসলমানদের বিবাহে ডোরা না হইলে চলে না। বর্মাতেও চালান যায়।

বিস্কুট :—চট্টগ্রামে মুসলমানেরা ভাল বিস্কুট করে। বর্মা, আসাম পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্র চালান যায়। এখানকার পাউরুটিও ভাল।

বিড়ি :—গোঁসাইর ডাঙ্গা (চট্টগ্রামের মধ্যে), মাদার বাড়ী, আনন্দীপুরে

মুসলমান মেয়েরা প্রচুর বিড়ি করে। বর্মা ও আসামেও চালান যায়।

জাহাজ শিল্প :—শাম্পান, নৌকা ইত্যাদির বড় কারবার। সমুদ্রগামী নৌকা সেলাই করিয়া হয়, লোহা ব্যবহৃত হয় না।

ডলইন :—রাঙ্গামাটি, কক্সবাজারের ভিতরে যেখানে জুম্মারা থাকে সেখানে ইহার খুব চলন। আজকাল আকিয়ার অঞ্চলে ধানকল হওয়ায় কমিয়া যাইতেছে।

কাঠশিল্প :—সেগুন, জারুল, গাম্ভারি, লোহাকাঠ পাহাড় জঙ্গল থেকে নদীর পথে আসে। ভাল আসবাপত্র, নৌকাদি হয়। এক কাঠের এক নৌকায় ৫০/৬০ জন বসিতে পারে।

মেলা ও উৎসব :—(১) মুরগীর, ষাঁড়ের, মহিষের লড়াই বাজী ধরিয়া খুব চলে। (২) বালীখেলা-কুস্তি কিন্তু কোমরের নীচে কোন জায়গা হাতে ধরা নিষেধ। পায়ের প্যাঁচ খুব দেয়। মাটিতে পিঠ ঠেকিলে পরাজয়, চট্টগ্রামে খুব চলে।

ঐতিহাসিক :—চক্রশালা (বিক্রমশিলার মত বৌদ্ধ শিক্ষাপীঠ ছিল) সহর থেকে ১২।১৪ মাইল দূরে বর্মা ট্রাঙ্ক রোডের উপর পড়ে। পটিয়া থানায়, এখন ছোট গ্রাম নাম চক্রশালা।

চট্টগ্রাম শহরে ফিরিঙ্গিবাজার, পাথরঘাটা, বাণ্ডেল রোড প্রভৃতি জায়গায় এখনও পর্তুগীজগণের বংশধরেরা বাস করে।

চট্টগ্রামের বহুস্থানে বৌদ্ধ বিহার (ছোট ছোট) আছে।

মুসলমান আমলেরও বড় বড় মসজিদ (আলিখান মসজিদ, জুম্মার মসজিদ) ও বাজার আছে।
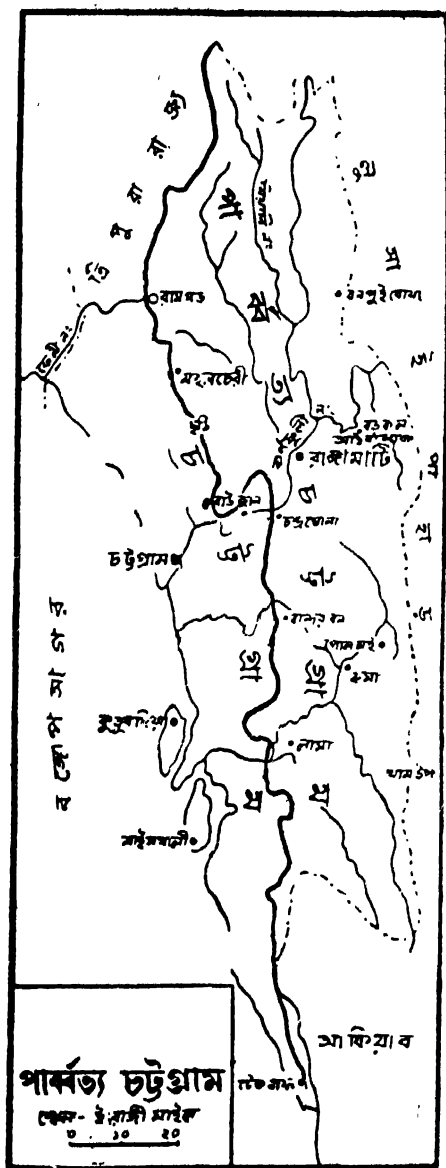
পার্বত্য চট্টগাম জেলার মহকুমা ২টি। রাঙ্গামাটি মহকুমার থানা: কাশলঙ, দীঘিনালা, মহলছড়ি, রামগড়, রাঙ্গামাটী, চন্দ্রঘোনা। বান্দরবন মহকুমার থানা: বান্দরবন, রুমা, লামা, নখইয়ঙছড়ি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম

মাটি :—পাহাড়িয়া অঞ্চলে বালি পাথর প্রধান। অন্যান্য জায়গায় দোঁয়াশ মাটি দেখা যায়। বৃষ্টির সময় পাহাড়ের গা বাহিয়া জল নামে ও দুই পাহাড়ের মধ্যের নীচু জায়গায় পলি জমিতে থাকে।

নদী, বিল :—কর্ণফুলী সবচেয়ে বড় নদী। সাঙ্গুনদী যখন যে জায়গা দিয়া বহিয়া গিয়াছে সেই অঞ্চলের লোকেদের বংশের নাম অনুসারে নদীর নাম হইয়াছে। যেমন উৎপত্তির স্থানে এই নদীর নাম সাবকথিয়ঙ, বান্দরবনের কাছে রিণীরিখিয়ঙ্, সমতলে সাঙ্গু (শঙ্খ)। সাঙ্গুনদীর কাছে বোগাকাইন হ্রদের জল পাহাড়িয়ারা পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করে। ঐ হ্রদে মাছ নাই, আর আগাছাও জন্মায় না। পাহাড়িয়াদের নিকট ইহা পুণ্যস্থান। রাইন খিয়ঙ কাইন (Rhain Khyong Kine) হ্রদে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।

গাছ :—পর্বতে জারুল, তুন, গর্জন বাঁশের অরণ্য।

চাষ :—পাহাড়িয়ারা জুম প্রথায় চাষ করে। মাটি দা বা শক্ত কোন ধারাল জিনিস দিয়া খুঁড়িয়া একই সময়ে একত্রে ধান, তুলা, তরমুজ, কুমড়া, তিল ও অন্যান্য শস্যের বীজ বোনা হয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শস্য পাকে। ভাদ্রের শেষে গেলং, রঙ্গী, কোবরক জাতীয় ধান পাকে। আশ্বিনের প্রথমে বোরো ও আশ্বিনের শেষে টাকি ও কামরাঙ ধান পাকে। ইহাদের মধ্যে টাকি ও কামরাঙ সবচেয়ে ভাল। তিল আশ্বিনের প্রথমে পাকিয়া যায়। তিল বর্মায় রপ্তানী হয়। তুলাও বাহিরে চালান যায়। বাজারে তুলার বীজের চাহিদা আছে। তুলার বীজ গরু ছাগলদের খাওয়ান হয়। সমতলের লোকেরা লাঙ্গল দ্বারা চাষ করে। আশ্বিনের শেষে রবিশস্যের জমি তৈয়ারি করে। সরিষা, নানা প্রকার ডাল, তামাক ও নানা প্রকার শব্জীর চাষ হয়। সরিষার জন্য জমি খুব ভাল ভাবে তৈয়ারি করে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী চাষ করিবার আগে কয়েক রাত জমিতে গরু মহিষাদি 'দিগড়ি' দেয় (জমিতে বাঁধিয়া রাখে) রবিশস্যের জমির জন্য সারা বৎসর গোবর কুড়াইয়া রাখে। উঁচু আইলের

মত করিয়া তাহাতে কচু বা আলু লাগাইয়া সূর্যের তাপ হইতে রক্ষার জন্য খড় দিয়া ঢাকিয়া দেয়। বড় বড় কুমড়া, তরমুজ, কচু (ওজনে ১ মণের উপরও হয়) বাজারে পাইকারদের কাছে বিক্রয় করা হয়। ইহারা লংকা, ট্যাঁড়সের চাষও খুব করে। কিছু কিছু পানের চাষও হয়। নদীর ধারের তামাক অতি উৎকৃষ্ট। মাতামুড়ি অঞ্চলের তামাকের সুখ্যাতি আছে। ফলের মধ্যে কাঁঠাল আম, লিচু প্রধান। ইক্ষুচাষও প্রচুর হইয়া থাকে।

দুধ, মাছ ও পশুপালন ঃ—এই অঞ্চলে গরু বেশি নাই, মহিষই বেশি। পাহাড়িয়াগণ দুধ পছন্দ করে না। দই বাজারে বিক্রয় হয়। প্রত্যেকে ছাগল, শুয়োর, মুরগী পোষে। মুরগী নানা পূজায় বলি দেয়। পায়রা পোষার চল আছে। নদীগুলি মাছে পূর্ণ। সমতলে ডোমেরা শীতকালে মাছের ব্যবসায় করে। যা মাছ হয় স্থানীয় লোকেদের মধ্যেই বিক্রয় হইয়া যায়। অন্যত্র চালান যায় না। মাছ ধরার জন্য সাধারণতঃ ছিপ, জাল, টানাজাল ব্যবহৃত হয়। শীতকালে কোন কোন জায়গায় নদীতে বাঁশের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া স্রোতের মাছ আটকান হয়। প্রধান মাছ মহাশোল, রুই, কাল বাউশ, মৃগেল, কাতলা, বোয়াল, চিতল, ভেটকী বাইন ও চিংড়ী। কচ্ছপও যথেষ্ট ধরা হয়।

শিল্প ঃ—চাষের যন্ত্রপাতির মধ্যে দা বা খন্তার প্রচলন বেশি। ইহাদের বাঁট কাঠের হয় তবে বাঁশের বাঁটই সবচেয়ে ভাল। প্রতি বৎসর সিলেট বা অন্য জায়গা হইতে কামারেরা এখানে দা বেচিতে আসে। দা-এর ব্যবসা বেশ লাভজনক। পাহাড়িয়াদের নিকট দা অমূল্য সম্পদ। নানা কাজে ইহার ব্যবহার হয়। দা-এর ফলা ছাড়া কুঠারের ফলাও পাহাড়িয়াগণ এই সব ব্যবসায়ীদের নিকটে খরিদ করে। ফসল কাটিবার সময় ছোট কাস্তে ব্যবহার হয়।

তুলার ব্যবসায় বেশ বড়। স্ত্রীলোকেরা কাপড় বোনে। নানা আদিবাসী নানা রঙের ও নানাভাবে কাপড় বোনে। কাপড় সাধারণতঃ তাহার দেশীয় প্রথায় রং করে। কাল রং কালা গাব গাছের ছাল হইতে, লাল রং রং গাছের শিকড় ও তেঁতুল গাছের ছাল গুঁড়া করিয়া মিশাইয়া করা হয়। হলদে ও সবুজ রং রং গাছের শিকড়ের সহিত হলুদ ও আমগাছের ছাল মিশাইয়া তৈয়ারি করে।

মানুষ ঃ—পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক আদিবাসী বাস করে। চাকমা ও মগ, আরাকানী এবং টিপ্‌রা, কুমি খেয়াঙ, বানজোগী পাংখারা মিশ্রিত।

চাকমা জাতির অন্যজাতির সহিত বিবাহে বাধা নাই। সন্তান জন্মালে চাকমা পিতা সন্তানের মাথার নিকট ঝুড়ি করিয়া মাটি আনিয়া বিছানার নিকট ছড়াইয়া দেয় ও কয়েকদিন বাতি জ্বালাইয়া রাখে। কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণে বেশীর ভাগ মগ বাস করে। স্ত্রী ও পুরুষ পরচুলা পরিতে ভালবাসে। বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী। আফিম ও মদ খায়। কচু ও শুঁটকী মাছের আদর বেশি। টিপরারা জেলার সব জায়গাতে ছড়াইয়া আছে। ইহারা ভূত, প্রেত ও অপ-দেবতায় বিশ্বাসী। সকল পূজা পার্বণে প্রথমে ওঝা আসে। নববর্ষে 'গরাইয়া' দেবতার পূজা হয়। বানজোগীরা মৃতদেহ পোড়ায় না, কবর দেয়। কুমিগণ মৃতদেহ পোড়ায় ও অস্থি সংগ্রহ করিয়া নূতন কাপড়ে বাঁধিয়া একটি ঘরে রাখে। ঐ ঘরে পরিবারের সকল মৃতদেহের অস্থিই রাখা হয়।

খেয়াঙগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। কুকীরা যাযাবর। ইহারা ভূত প্রেতের পূজা করে। এখন অনেক আদিবাসী খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিতেছে।

ঘর ঃ—চাকমা জাতি সাধারণতঃ মাটী হইতে ৬ ফুট উঁচু মাচার উপর ঘর বানায়। বড় ঘরকে চাটাই দিয়া ভাগ করিয়া প্রয়োজন অনুসারে কামরার সংখ্যা বাড়ায়। বাহিরের কামরাকে পিনাগুড়ী বলে, এখানে অতিথি অথবা অবিবাহিত পুরুষেরা একত্রে থাকে।

ভাষা ঃ—বাঙলা ইহাদের সরকারী ভাষা সাধারণভাবে সকলে বোঝে। ইহা ছাড়ী আদিবাসীদের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা আছে।

শহর ঃ—অযোধ্যা বাজার—তুলা ও শিশমের ব্যবসায়ের বড় কেন্দ্র। ফেণীনদীর ধারে বান্দরবন গ্রামে অবস্থিত। এখানে দুইটি সুন্দর মন্দির আছে।

বরকল বাজার—কাঠ, বাঁশ, তুলার বড় গঞ্জ। এখানে নৌকার ব্যবসায়ও খুব বড়।

চন্দ্রঘোনা বাজার—কর্ণফুলি নদীর দক্ষিণ তীরে, চট্টগ্রাম হইতে জলপথে ২৬ মাইল দূরে একটি বন্দর। এখানে কাঠ, বাঁশ, তুলা ও নৌকা বেচা কেনা হয়।

মংলছড়ি বাজার—তুলা ও শিশমের বড় বাজার। চেংরী নদীর তীরে মানিকছড়ি এই অঞ্চলের বড় গঞ্জ। এখান হইতে চট্টগ্রাম যাইবার ভাল রাস্তা আছে। বেইন খিয়ং বাজার কর্ণফুলী নদীর তীরে একটি বড় গঞ্জ। তুলা, বাঁশ, শিশম ব্যবসায়ের বড় কেন্দ্র।
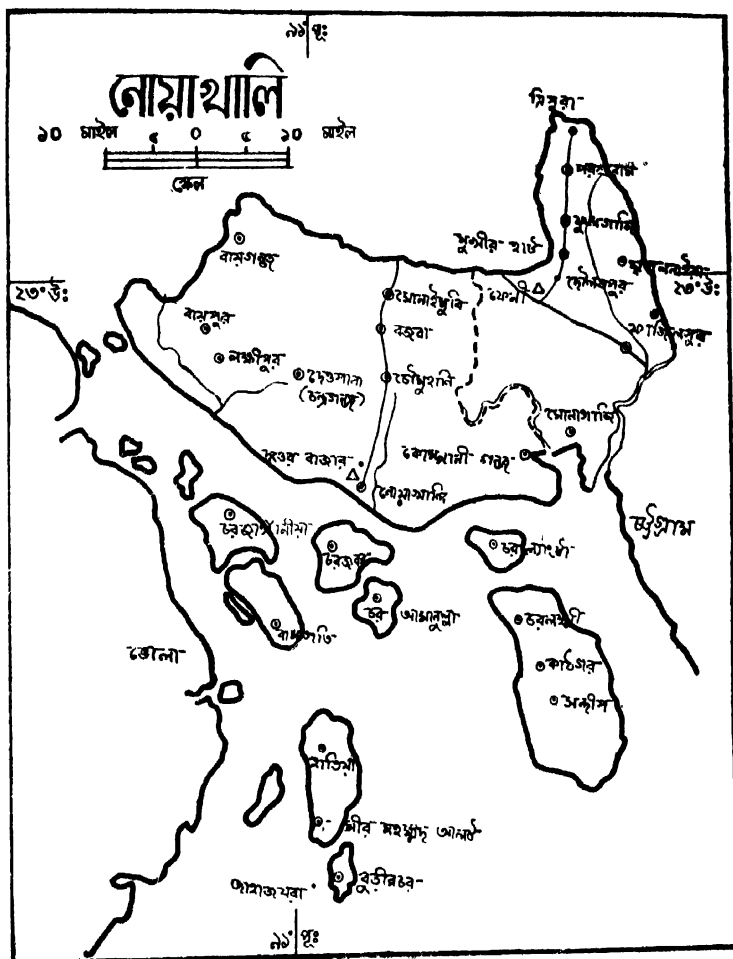
নোয়াখালি চট্টগ্রাম বিভাগের একটি জেলা। ইহার দুইটি মহকুমা। সদর মহকুমার থানা: রায়পুর, লক্ষ্মীপুর, রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, সেনবাগ, সুধারাম, কোম্পানীগঞ্জ, রামগতি, হাতিয়া সন্দীপ।

ফেণী মহকুমার থানা: ফেণী, সোনাগাজী, ছাগলনাইয়া ও পরশুরাম

নোয়াখালি

মাটি ঃ—এ জেলায় সোনাইমুড়ির পশ্চিম দিকে কিছু নিচু জমি ছাড়া ঠিক বিল বলিতে যাহা বুঝায় তাহা নাই। সদর মহকুমায় দোআঁশ বেশী, কিছু এঁটেল আছে। সদরের মধ্যে সন্দীপ বালি ও এঁটেলের মাঝামাঝি। দেশাল ও চর নামে দুই ভেদ সন্দীপে করা হয়। দেশাল কিছু উঁচু হয়, চর ভরিয়া দেশালে পরিণত হয়; চর নদীতে পড়ে। ফেনী মহকুমায় এঁটেলই বেশী, জায়গায় জায়গায় বালি (নদীর পাশে); পশ্চিমভাগে অর্থাৎ সদরের সংলগ্ন অঞ্চলে এঁটেলই বেশী।

চর যখন প্রথম উঠিতে আরম্ভ করে, অত্যন্ত নরম ও কর্দমাক্ত থাকে তখন তাহাতে উড়ি নামে এক প্রকার মুথার মত ঘাস হয়, তাহার শস্য ধানেরই মত। গরুতে সেই ঘাস খায়। কিছু উঁচু হইলে সিরিঙ্গা নামে অপর একপ্রকার ঘাস (দেখিতে দুর্বার মত, রং লাল) জন্মে, তাহার পর চাপড়া (দুর্বা) ঘাস জন্মায়। একই চরে বিভিন্ন অংশে মাটির অবস্থা অনুসারে হয়ত তিন রকম ঘাসই জন্মায়।

এই সকল স্থানে শত শত ভেড়া, মহিষ, গরু পালে। (হিন্দু) মাহিষ্যজাতি বেশ উৎসাহী। তাহারা নূতন চরে গিয়া বাসা বাঁধে। মুসলমান চাষীই বেশী, হিন্দু চাষীও (মাহিষ্য জল অচল) আছে।

এ জেলায় অনেক নলকূপ হইয়াছে, তবে প্রায়ই গভীর নয়। ২৫-৩০ ফুট খুঁড়িলে নোনা জল সময়ে সময়ে পাওয়া যায়; ৩০-৪০ ফুটে ভাল জল বাহির হয়। ৫-৬ হাত পর হইতেই মাটির নীচে মিহি বালি বাহির হয়। দুর্গাপুর গ্রামে পুষ্করিণী খোঁড়ার সময়ে ১০-১২ হাত নীচে জাহাজের মাস্তুলের মত কাঠ পাওয়া গিয়াছিল। অনেক জায়গায় পুকুর খুঁড়িতে গিয়া কাঠের গোড়া পাওয়া গিয়াছে।

সন্দীপে কাঠগড়ে কোন কোন নলকূপে পাতাপচা গন্ধ বাহির হয় (জল পরিষ্কার, দেশলাই দিলে আগুন জলে ও ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ হয়) একটু কষ ধরা হয়। কোন কোন জল বেশ ভাল। কোন কোনটি হইতে লোনা জল বাহির হয়।

জল ঃ—জেলায় কূয়ার প্রচলন আদৌ নাই। পুষ্করিণী এবং দিঘীর খুব ব্যবহার দেখা যায়। আজকাল নলকূপের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, সংস্কারের অভাবে পুষ্করিণী নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সন্দীপে গৃহস্থের বাড়ীতে সামনে এবং পিছনে দুইটি করিয়া পুকুর থাকেই ; নিতান্ত গরীবের বাড়িতেই থাকে না।

৬।৭ বা ৫।৬ হাত খুঁড়িলেই সর্বত্র জল পাওয়া যায়, তাহার পর জল আর সারা বৎসর শুকায় না। [সন্দীপের আশপাশে জল ঘোলা, ১০ মাইল দক্ষিণে নীল জল।]

চাষ ঃ—(ক) ধান ও পাট—ফেণী মহকুমায় ধানই প্রধান, আউশ এবং আমন, দুইই হয়। সদরে চাল ফেণী অঞ্চল হইতে চালান দেওয়া হয়। সদরে সোনাইমুড়ির পশ্চিমে নীচু জমিতে আউশ ও আমন একত্র লাগায় পর পর কাটিয়া লয়। সন্দীপে ধানই বেশী, অনেক জমিতে ২টা ধানও ভাল হয়। লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে পাট বেশী। দেওপাড়ার কাছে চন্দ্রগঞ্জের পাট বেশী দরে বিক্রয় হয়।

(খ) সন্দীপে মরিচ এবং খেসারি প্রচুর হয়, বাহিরে চালান যায়। পরশুরাম ও বিলোনিয়া অঞ্চলে মুখী কচু এবং লাল আলু প্রচুর জন্মে। তরিতরকারিতে ফেণী মহকুমা বিশেষতঃ উত্তর পূর্ব কোণে প্রচুর জন্মে—শশা, কুমড়া, শাকশব্জী. মূলা (জয়পুর গ্রাম, ছাগলনাইয়া থানা) প্রধান। কপির চাষ তেমন নাই। খেসারির ডাল জেলায় খুব চলে, তবে মুসলমান ডাল কম খায়, মাছই বেশী খায়।

(গ) ফল ঃ—দেশী আম সর্বত্র। ফেণীর পশ্চিমভাগে কলা ও কাঁঠাল প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট হয়। রায়পুর লক্ষ্মীপুর ও রামগঞ্জ থানা নারিকেল ও সুপারির জন্য প্রসিদ্ধ। রামগঞ্জে কাগজিলেবু ও কলার চাষ বেশী আছে, চালানই বেশী হয়। সন্দীপেতে নারিকেল সুপারি খুব হয়। পানও সেইরকম। জেলা হইতে সুপারি আসাম, উত্তরবঙ্গ, বিহার ও যুক্তপ্রদেশে প্রচুর পরিমাণে চালান যায়।

(ঘ) ফেণী অঞ্চলে আখের চাষ যথেষ্ট। পরশুরাম অঞ্চলে আখের গুড়ও বেশ হয়। সন্দীপে আখের চাষ আছে, তার গুড় না করিয়া খাইয়া ফেলে। সদর মহকুমাতে খেজুর গুড় হয়।

(ঙ) ছন ইত্যাদি :--সন্দীপে ঘরের ছাউনির জন্য ছন বা উলু খড়ের চাষ করে। পাটির জন্য পাটিপাতা লাগাইয়া রাখে, দরকার মত কাটিয়া লয়।

(চ) সদর ও ফেণীতে বারুইজাতি পানের যথেষ্ট চাষ করে। সন্দীপে নমঃশূদ্র ও কায়স্থরাও পানের চাষ করে। এখন মুসলমানে এই ব্যবসা ধরিতেছে।

(ছ) পরশুরাম বিলোনিয়ার কাছে পাহাড়ী জায়গায় তুলার চাষ আছে। ফাজিলপুরেও কিছু তুলা পাহাড় হইতে নামে।

দুধ :—লক্ষ্মীপুর, রায়পুর, ভবানীগঞ্জ ও ভুলুয়া অঞ্চলে দুধ ও ঘি সস্তা ও প্রচুর। নোয়াখালির দক্ষিণে ছোট ছোট অনেক চর আছে। সেই সকল স্থান হইতে সহরে দই আসে। সন্দীপেও দুধ প্রচুর। (বড় বড় বাথান আছে।) গাইমহিষের দুধ এই সকল জায়গায় পাওয়া যায়, সাধারণ হিন্দু মুসলমান গৃহস্থেরা বেচে। গোয়ালারা শুধু দুধ কেনে এবং দই, ঘি, মাখন তৈয়ারী করিয়া বেচে ও চালান দেয়। গোয়ালাজাতি সংখ্যায় কম।

মুসলমানেরা ক্ষীর ছানার খাবার সারা জেলায় খায় না বলিলেই চলে, সেখানে হয়ও না।

ফেণী মহকুমার পশ্চিমোত্তর ভাগে দুধ ভাল পাওয়া যায় না, গরুতে মাত্র /।৵০, /৵০ দুধ দেয়।

মাছ :—ফেণীর পূর্ব-উত্তর ভাগে দুধের মত মাছও খুব কম। শীতকালে নদীর মাছ প্রচুর। সদরে মাছ বেশ পাওয়া যায়, সোনাইমুড়ির পার্শ্ববর্ত্তী জলায় কৈ, সিঙ্গি প্রভৃতি ধরিয়া চালান দেওয়া হয়।

বর্ষায় নোনা ইলিশ জেলার সর্বত্র বিক্রয় হয়। শুঁটকিরও বেশ চলন আছে। রৌদ্রে শুখায় অথবা রান্নাঘরে আঁচে ও ধোঁয়ায় শুখাইয়া লয়। নোনা ইলিশ ও অধিকাংশ শুঁটকি বাহির হইতে চালান আসে। শুধু সন্দীপে শুঁটকি তৈয়ারি হয়, ফেণী ও সদরে প্রায় হয় না।

শিরিং নামে একটি বেশ তৈলাক্ত মাছ সম্বন্ধে সন্দীপে বিশ্বাস যে ইহার তৈল কাশরোগে (কডলিভার অয়েলের মত) উপকার দেয়। ছোট ছোট হাঙ্গর ধরা পড়িলে তাহাও খাইয়া থাকে।

সমস্ত চরে প্রচুর বড় কাঁকড়া ধরে, মুসলমানেরা খায় না। তাহারা কচ্ছপও খায় না।

মাংস :—কিছুকাল হইতে (কলকাতায় ১৯২৬-এর দাঙ্গার পর হইতে) বড় হাটে গোমাংস বিক্রয় যথেষ্ট হয়। সন্দীপে শত শত ভেড়ার বাথান আছে (কম্বল, আসন তৈয়ারি চেষ্টা করিয়াও টিঁকে নাই)। মুসলমানেরা মুরগী যথেষ্ট খায়, মাছ ত খায়ই (ইহারা ডাল কিছু কম ও তরকারী খুবই কম খায়) কবুতরের বাচ্চা হিন্দু মুসলমানের খুব প্রিয় খাদ্য, বাজারে যথেষ্ট বিক্রয় হয়।

লবণ :—গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর লক্ষ্মীপুর, রায়পুর, সোনাগাজি, সদর কোম্পানীগঞ্জ থানা এবং সমস্ত চর অঞ্চলে প্রচুর তৈয়ারী ও বিক্রয় হয়। মুসলমানরাই বেশী করে। কিছু মুসলমানের ইহাই প্রধান উপজীবিকা। জেলার সমুদ্র সংলগ্ন থানাগুলি ও চরেতে প্রায় লক্ষ টাকার নুন বৎসরে হয়। বিলাতী নুন পড়তায় বেশী পড়ে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবেরা পূর্বে নূনের ব্যবসা করিতেন। সদর লক্ষ্মীপুর ও রায়পুরে এখনও নূনের কুঠি ও কোথাও কোথাও বংশধরেরাও বর্ত্তমান। ১৮২১ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং-এর নূনের কুঠিয়াল জেলার প্রথম ম্যাজিষ্ট্রেট হ'ন।

খাদ্যদ্রব্য :—পরশুরামের চিড়া বিখ্যাত। খৈ এবং মুড়ির যথেষ্ট চলন আছে। সন্দীপে খেজুর গুড় হয়, ধানে কলসী গুঁজে রাখে, বছর ভর সেই গুড় খায়। ("সন্দীপের ডাব, রাব, হাতিয়ার দধি")। "সন্দীপের ডাবরাব নারীবাড়ী"।

রাব :—খেজুর গুড়, (ঝোলা)। মুসলমানেরা অতিথি ঘরে আসিলে চাল গুঁড়া করিয়া নানারকম পিঠা গড়ে ও মুরগী রাঁধে।

কলসীতে বালি বালি ধরণের যথেষ্ট আখের গুড় পরশুরাম এবং ছাগল নাইয়া অঞ্চলে তৈয়ারি ও বিক্রয় হয়। লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে খেজুর গুড়ের চলন আছে।

তৈল :—সদরে চালানি তেলই বেশী। খাবার জন্য সরিষা প্রধান। তিল ও নারিকেল আছে। সন্দীপে তিসির তেল খাওয়ার চলন আছে, তারপর তিল, সরিষাই প্রধান। পুন্নাগ (এখানে পুন্নাল বলে) তেল প্রদীপে জ্বালায়। রেড়ি জলে সিদ্ধ করিয়া উপর হইতে ঢালিয়া নেয়, তাহা মাথায় মাখে পুন্নালের খইল জ্বালান হয়

চম্পক নগরে (ছাগল নাইয়া থানা) যথেষ্ট মুসলমান তৈলকার পাহাড় অঞ্চল হইতে সরিষা কিনিয়া তেল করে। ইহারা মাটির বাসন কিছু কিছু তৈয়ারি করে।

ঘর-দুয়ার :—ফেণী মহকুমার পূর্ব-দক্ষিণভাগে (চট্টগ্রামের প্রভাববশতঃ) যথেষ্ট মাটির ঘর আছে, ঘরগুলি খুবই সুন্দর ও মজবুত। মাটির ঘরে টিনের চাল দেওয়াই রীতি। সাধারণতঃ বাঁশের বেড়া বেশী এবং ছনের ছাউনি। মুইদা নামক এক প্রকার কাঠির বেড়ার চলন আগে ছিল, এখন কম। তাহার উপর গোবর লেপা থাকে।

সন্দীপে ঘরের কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। চাটগাঁর পাহাড় হইতে মুলি বাঁশ আনিয়া তাহার বেড়া ও ছনের চাল করা লোকে পছন্দ করে। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ টিনের বা কাঠের বেড়াও দেয়, তাহার উপরে টিনের চাল। ছনের ঘরগুলির চাল কনভেক্স ধরণের হয়, ইহাকে ভাঙর দেওয়া চাল বলে। সন্দীপে অত্যধিক হাওয়া চলে বলিয়া এই কার্ভেচার (বক্রতা) খুব বেশী ও ঘরগুলি তিন চালা হয়। তাহা ছাড়া সন্দীপে এবং সদরেও বড় লোক বা গরীব লোকের বাড়ীমাত্রেই নিজের জমির মধ্যখানে হয়, মাঝখানে বাড়ী, তাহার চারিদিকে সুপারি নারিকেলের বাগান (প্রাচীরের পরিবর্তে) এবং তাহার পর চতুর্দিকে ক্ষেত (নিজের গরু যেন অপরের ক্ষেতে মুখ না দেয়।) চারদিকে গরুও থাকে, মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের হাত হইতে রক্ষার জন্য এরূপ ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক গৃহস্থ ঘরের আগে ও পাছে দুইটি পুকুর কাটে। সদর মহকুমায় দক্ষিণে (অত্যধিক ঝড়ের ভয়ে) বাগান করা হয়। পূর্ব দুয়ারি ঘর ও দক্ষিণে বাগান। (প্রতি ৬৫ বছরে বড় ঝড় হয় ; ১৮১১, ১৮৭৬, ১৯৪১-এ হইয়াছিল।)

জেলার সর্বত্র ঘরের সিলিংকে 'কার' (কাঁড়) বলে। অপেক্ষাকৃত নীচু মাচাকে 'উঘইর' বলে, ময়মনসিংহের মত ইহাতে বেড়া বা দরজা থাকে না। কারের উপরে যে ঘর তাহাকে 'দমদমা' বলে।

জ্বালানি :—সন্দীপ প্রভৃতি চরে স্থানীয় কাঠ, গোবরের ঘুঁটে, নারিকেল-সুপারির পাতা, গাছ (মাদার প্রভৃতি বৃদ্ধিশীল, অসার) জ্বালায়। ফেণীর উত্তরভাগে ত্রিপুরা রাজ্য হইতে কাঠ আমদানী যথেষ্ট হয়। সদরে কাঠের চলনই বেশী, তবে রেললাইনের পার্শ্ববর্তী গ্রামেও আজকাল কয়লা ঢুকিতেছে।

শিল্প :—(ক) ফেণী মহকুমার ফাজিলপুরের মুলিবাঁশের চ্যাটাই বেশ নাম করা। এ অঞ্চলে পাটি পাতা হইতে যুগীরা পাটি বানায়। অন্য যে যুগী তাঁত বোনে তাহাদের সঙ্গে এই যুগীরা এখন খায়, কিন্তু বিবাহের চলন নাই।

সন্দীপ, লক্ষ্মীপুর ও রায়পুরে হোগলার চ্যাটাইএর (ধারি বা হোগলা বলে) যথেষ্ট প্রচলন। মুসলমান মেয়েরা বোনে। শীত গ্রীষ্মে পেতে শোযা হয়, ঘরের বেড়া দেয়, অল্পদিনের জন্য ধান রাখার মরাই এই দিযা করে চালিযে নেয়। লক্ষ্মীপুর ও সদরের কিছু অংশে হোগলা আছে।

(খ) হিন্দু কুমোর, কামার গ্রামে কিছু কিছু সব দিকেই আছে কিন্তু নাম করবার মত কোথাও নয়। কাঁসারিরা লোহজঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বর্ষায় নৌকায় মাল আনিয়া গ্রামে গ্রামে ফেরি করিয়া যায়।

স্থানীয় কুমোরেরা সরা, কলসী, ভাঁড়, মালসা করে; হাঁড়ি, পাতিল, ঢাকা ফরিদপুর, ও ত্রিপুরা থেকে আসে। সেদিককার কার্তিকপুরের (নড়িয়ার কাছে) বাসন নামকরা। মুসলমান তেলিরা মাটির সরা, ও প্রদীপ ও মাটির বাটি (বটুয়া বলে) করিয়া বেচে (সন্দীপ)।

(গ) তৈল :—মুসলমান তেলি সর্বত্র (এক বলদ, ফুটা যুক্ত ও ঠুলি), তাদের তেলিই বলে। অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে এদের কচিৎ বৈবাহিক সম্পর্ক হয়। পুন্নাগ (পুন্নাল) তেল সন্দীপে বেশ হয়, ফলে যথেষ্ট রোজকার হয়। গৃহস্থেরা শুখাইয়া গুঁড়া করিয়া, বাঁশের চ্যাটাই দিয়া ছোট গেলাসের মত করিয়া কাঠের উপর রাখিয়া ঢেঁকি দিয়ে চাপ দেয়। ঢেঁকির উপর দু-তিন জন চড়ে বসলে তেল বেরিয়ে যায়। [সাবানের জন্য ঢাকায় আজকাল চালান হয়। আগে তেল জ্বালাত, খোলটা আগুনে দিত।] রেড়ির তেল গৃহস্থ জলে সিদ্ধ করে উপরে ভাসিয়ে বার করে নেয়। ফেণীর পরশুরাম অঞ্চলে গৃহস্থে বেতাই দিয়ে পীতরাজ (=রয়না) ফলের তেল, কেঞ্জা (=ডহর করঞ্জ) তেলও করে।

(ঘ) তাঁত :—জেলায় যুগী-(নাথ) রাই তাঁতের কাজ করে। মশারির কাপড় মুসলমান স্ত্রীপুরুষের পরণের জিনিষ তাঁতেই হয়। গামছাদিও হয়। তাঁতের বোনা মেয়েরাই প্রধানতঃ করে। পুরুষেরা বেচার কাজ করে। ঠকঠকিতে আজকাল ভাল চাদরও হইতেছে।

(ঙ) সুতা :—ফেণী মহকুমার অধিকাংশে এবং সন্দীপে অসহযোগ আন্দো-

লনের পূর্ব থেকে বরাবর মাঠভাঙ্গা, মগধারা ও স্যারিকাত গ্রামে মুসলমান মেয়েরা চরকায় সুতা কেটে বুনিয়ে নিত এখনও নেয়।

[(চ) কাপড়ের একটি বিশেষত্ব :—সন্দীপে মেয়েরা 'ডুমা' পরে। ডুমা সাড়ি নয়। দুখানি চারহাত কাপড়, একখানি পরে, একখানি গায়ে দেয়। নোয়াখালির অন্যত্র এ প্রথা নাই বলিলে চলে।] বগুড়া তুলনীয়।

(ছ) বৃষ্টিতে ব্যবহারের জন্য কুরুপ নামে এক প্রকার পাতা দিয়ে ফেণী অঞ্চলে উৎকৃষ্ট পেকের মত তৈয়ারি হয়, ইহাকে জোংরা (ফ্রেম ও ছাউনি আছে।) ও টালা (বা 'পাৎলা'=বাঁশের হ্যাট বা টোকা) বলে।

দত্তপাড়াতে কামারেরা ভাল ছুরি, কাঁচি, দা, তোলা, খড়্গ প্রভৃতি তৈয়ারি করে।

বাজার, হাট মেলা :—বাজার (সকালে) রোজ বসে, হাট সপ্তাহে ২ বার, মেলা বৎসরে পূজা-পার্বন উপলক্ষে বসে।

মেলা—পৌষ সংক্রান্তি, চৈত্র সংক্রান্তি, বৈশাখের আরম্ভ ও কয়েকদিন পরে জেলার নানা জায়গায় মেলা বসে। সন্দীপে চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় কুস্তির প্রতিযোগিতা হয়। যাহারা জেতে তাহাদের নামের সঙ্গে লোকে 'বলী' (=পালোয়ান) শব্দ যোগ করে, যেমন রামানন্দী বলী, খালেক বলী ইত্যাদি। দর্শকেরা তেল, সাবান প্রভৃতি উপহার দেয়। ইহা সন্দীপে খুব প্রিয় খেলা। (কিন্তু জেলায় আখড়ার চলন নাই।) সন্দীপের মেলার পরও কয়েকদিন বিভিন্ন জায়গায় কুস্তির প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে।

দালালবাজারের ঝুলনের মেলা লক্ষ্মীপুর থানায় বিখ্যাত। ঢাকা, ফরিদপুর, লৌহজঙ্গ থেকে বহু কাঁসারি আসে। তারা মেলার পরও প্রায় ১৫ দিন থাকে। ১৫ দিনে বহু কাঁসার বাসন বিক্রয় হয়।

বরোইতলা (লক্ষীপুর থানা) এবং দুধমুখায় (কোম্পানীগঞ্জ থানা) ৩ দিন মেলা হয়, প্রচুর কাঠের জিনিষ বিক্রয় হয়। খাট, চৌকি, পিঁড়ি, সিন্দুক, রেকাবি প্রভৃতি স্থানীয় মিস্ত্রীরা গড়িয়া বিক্রয় করিতে আনে।

সদরে : চৌমুহানি—রায়পুর—সোনাইমুড়ি—ভবানীগঞ্জ—লক্ষ্মীপুর—সোন্নাপুর—চন্দ্রগঞ্জ—চাটখিল।

ফেণী : ফেণী—পরশুরাম—ফুলগাজি—পাঁচগাছিয়া—ফাজিলপুর—বসুরহাট

(কোম্পানী গঞ্জ)—সোনাগাজি বাজার—চৌমুহানি ব্যবসায়ের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র বৎসরে মুলি বাঁশ ২/২॥০ লক্ষ টাকার বিক্রয় হয়। পাটের ইহা বড় বাজার, অনেক পাট কোম্পানীর (সাহেবী) অফিস আছে । চামড়াও যথেষ্ট বিক্রয় হয়। পাট—স্থপারি—ধান—মরিচ—নারিকেল-রপ্তানি হয়। বালাম চাল—মুলি বাঁশ আমদানী হয়।

রায়পুর: স্থপারি—পাট—ধান—মরিচ—হলুদ রপ্তানী হয়, আমদানী বালাম চাল।

সন্দীপে চামড়ার খুব বড় ব্যবসা আছে। শুধু হিন্দু (ডোমিসাইলড বিহারি, জুতাও করে) মুচিরা মরা গরুর চামড়ার ব্যবসা করে ও (মুসলমান অন্যথা পতিত হয়) তেলিতে কাটা গরুর চামড়ার ব্যবসা করে।

(সাপ্তাহিক) হাট:—নোয়াখালির ৩ মাইল উত্তরে দত্তেরবাজারে গরু খুব বিক্রয় হয়। সোনামুড়ির ৪ মাইল দূরে ছাতাবভাইয়াতে গরু ও নৌকা খুব আসে। চৌমুহানির ৪ মাইল পূবে জমিদারের হাটও বেশ বড়। ফেণী মহকুমার শুভপুর হইতে জেলার অন্যত্র নৌকা চালান যায়।

যাতায়াত:—নৌকা (বর্ষায় রায়পুরেতে ফেরিতে মাল আমদানী হয়), ষ্টিমার, রেল ছাড়া মাল এবং মানুষের যাতায়াতের জন্য গরুর গাড়ীর চলন আছে। দেশী বা হিন্দুস্থানী পাল্কির খুব চলন আছে। ডুলি খুব কম, নাই বলা চলে। ঘোড়া অল্প। সন্দীপে পাল্কি বেহারা বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমান নাই। [পূর্বে নমঃশূদ্রদের বহিত না, আজকাল কংগ্রেসের চেষ্টায় পরিবর্তন হইয়াছে। সন্দীপের মুসলমানরাও অন্যত্র গিয়া বেহারার কাজ করে। মেনল্যাণ্ডে হিন্দু বেহারারা আজকাল আর পাল্কি বয় না]।

সামাজিক ব্যবস্থা:—ধোপা, নাপিতের বাৎসরিক নগদ ঠিকা আছে। পুরানো ঘরে ধোপা, নাপিত, চাকর, ভুঁইমালি ও জেলেকে বৃত্তি দেওয়া থাকে। তদ্ভিন্ন তাহারা গৃহস্থের বিবাহ, ছেলে হওয়া, অশৌচ প্রভৃতি উপলক্ষে কিছু কিছু পায়। কামানো ও কাপড় কাচার জন্য চলতি দর ১৲ জুড়ি (=স্বামী-স্ত্রী) বৎসরে। গৃহস্থের ছেলে হইলে শ্বশুর বাড়ীতে ও প্রত্যেক নিকট আত্মীয়ের ধোপা নাপিত উভয়ে সংবাদ দিতে গিয়া বেশ উপঢৌকন পায়, নয়ত কুটুম্বের নিন্দা হয়।

বৃত্তির ব্যবস্থা কামার, কুমোরদের নাই। তাহাদের সঙ্গে নগদ কারবার চলে। সন্দীপে (হিন্দু) জেলে মাছ বিক্রী করিতে ঘরে আসিলে সিদ্ধ এবং শুখানো ধান দেওয়াই রীতি যেন সে তাহা ভানিয়া সেই দিনই রাঁধিতে পারে। সমুদ্রের কাছে হিন্দুরাই মাছ ধরে, মুসলমানেরা কিছু কিছু আরম্ভ করিয়াছে, তারা চরের কাছাকাছি থাকে। (এই দুর্ভিক্ষে সন্দীপে জেলেরা বোধ হয় সব মারা গেল।) মজুরকে জেলার সর্বত্র বদল্যা (বা কামলা) বলে। একজনের কাজ অপরে করিয়া দেয়, বদলে তাহাকেও আবার সমান খাটিয়া দিতে হয়। কোন কোন বদল্যাকে নগদ পয়সা দিলেও বদল্যাই ভাল।

মুসলমানেরা রাজমিস্ত্রী, কাঠের মিস্ত্রী, দর্জির কাজ করিত (হিন্দুরা করিত না)। তাহারা ধোপা, নাপিত, জেলে, কামার (জলচল), সেকরা ('স্বতার' বলে, জল অচল), কুমোর, বারুই-এর কাজ করিত না। আজকাল করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক সন্দীপে মোটের উপর ভাল। 'জন্মের থেকে ধর্ম বড়' প্রবাদের অর্থ ধর্মমা, ধর্মবোন, ধর্মভাই (ফস্টার বা পাতান) হইলে তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা খুব নিবিড় হয়। হিন্দু-মুসলমান অপক্ষপাতে এই সম্বন্ধ পাতায়।

সন্দীপে (জেলার অধিকাংশে) মুসলমান সমাজে 'জায়গীর' রাখিবার এক প্রথা আছে। যাহারই ঘরে একটি কাছারি (=বৈঠকখানা) থাকে, সে একটি ছোট ছেলেকে পালে। ছেলেটি লেখাপড়া করে, ঘরের ছেলেমেয়েদের পড়ায়, নমাজ পড়া শেখায় ইত্যাদি। যাহাদের কাছারি নাই, তাহারাও সময়ে সময়ে 'জায়গীর' রাখে। সে ছেলেরা ঘরেই থাকে, ঘরের ছেলেদের মতন হইয়া যায়। (এ আদর্শ সকলের অনুকরণযোগ্য।)

সংস্কৃতিমণ্ডল (কালচারাল প্রভিন্স) ভাগ—হিন্দুদের মধ্যে রায়পুর, রামগঞ্জ থানার কথাবার্তা ইত্যাদি ঢাকার মত। বিবাহাদি ত্রিপুরা ও ঢাকায় হয়। ফেণী অঞ্চলের বিবাহাদি ত্রিপুরার চৌদ্দগ্রাম এবং চট্টগ্রামের সঙ্গেই সমধিক। সন্দীপের ব্রাহ্মণ-কায়স্থেরা বরিশালের সঙ্গে বিবাহাদিতে গৌরব বোধ করেন। হিন্দু ভদ্র পরিবারের মধ্যে ফেণীর সহিত প্রধানতঃ চট্টগ্রামের, সদরের পশ্চিম-ভাগের বরিশাল (চন্দ্রদ্বীপ), বিক্রমপুর (ফরিদপুর ও ঢাকার) সম্বন্ধ বেশী। কিছু ত্রিপুরার সঙ্গেও চলে। রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য ও তাঁহার পূর্ব-পুরুষরা

যশোহর, মুর্শিদাবাদ, চন্দ্রদ্বীপ ও বিক্রমপুর হইতে বহু পরিবারকে আনাইয়া বসতি করান।

[দত্তপাড়ায় মোহনগঞ্জ আশ্রম নামে হরিদ্বার গুরুকুলের আদর্শে একটি আশ্রম ৺চন্দ্রকুমার ঘোষ চৌধুরী (স্বামী কালিকানন্দ) ১৩১০ সালে স্থাপনা করেন।]

পোষাক:—সন্দীপে এবং জেলার অন্যত্রও হিন্দু এবং মুসলমান মহিলারা বউলাযুক্ত খড়ম ও চামড়ার চটিজুতা পরেন, ইহা পুরানো প্রথা, নূতন আমদানী নয়।

ইতিহাস:—জেলার পূর্ব নাম ভুলুয়া। ১৮২১এ নোয়াখালি নাম হয় (= নূতন খাল)। ভুলুয়াতে এখনও প্রাচীন কামান, পাষাণ নির্মিত জগন্নাথ, কালী প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি এবং কর্তাদের বাড়ি ও নামধাম খোদাই করা পাওয়া যায়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকেও এখনও 'সহরকসবা' বলে। বাংলার দ্বাদশ ভূঞার মধ্যে লক্ষণ মাণিক্যের ইহাই রাজধানী ছিল। সহরের ২ মাইল দূরে তাঁহার ছড় দেওয়ালের ভগ্নাবশেষ এখন বর্তমান। (লক্ষণ মাণিক্যের বংশ—শ্রীরামপুরে শ্রীরাম খাঁ, বাবুপুরে বাবু খাঁ ইত্যাদি।)

জেলার সদরের নিকটে পর্তুগীজগণের বংশধরেরা এখনও বাস করে। ডিক্রুজ, ডিসুজা প্রভৃতি নাম প্রচলিত আছে। (ইহারা রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান।)

'৭৬-এর মন্বন্তরের পরে পীর অম্বর চৌমুহানির নিকট বসিয়া মুসলমান ধর্ম-প্রচার করেন। তাঁরই প্রচারের ফলে ও মন্বন্তরের ফলে মুসলমান ধর্মে দরিদ্র-শ্রেণীর অনেকে দীক্ষিত হ'ন। প্রথমে গোমাংস খাওয়ার উপর জোর দেওয়া হয় না। তখন হিন্দুরা কূর্মবৃত্তি (রিজিডলি অর্থডক্স) অবলম্বন করিতেন, এখন তাহা ঢিলা হইয়াছে।
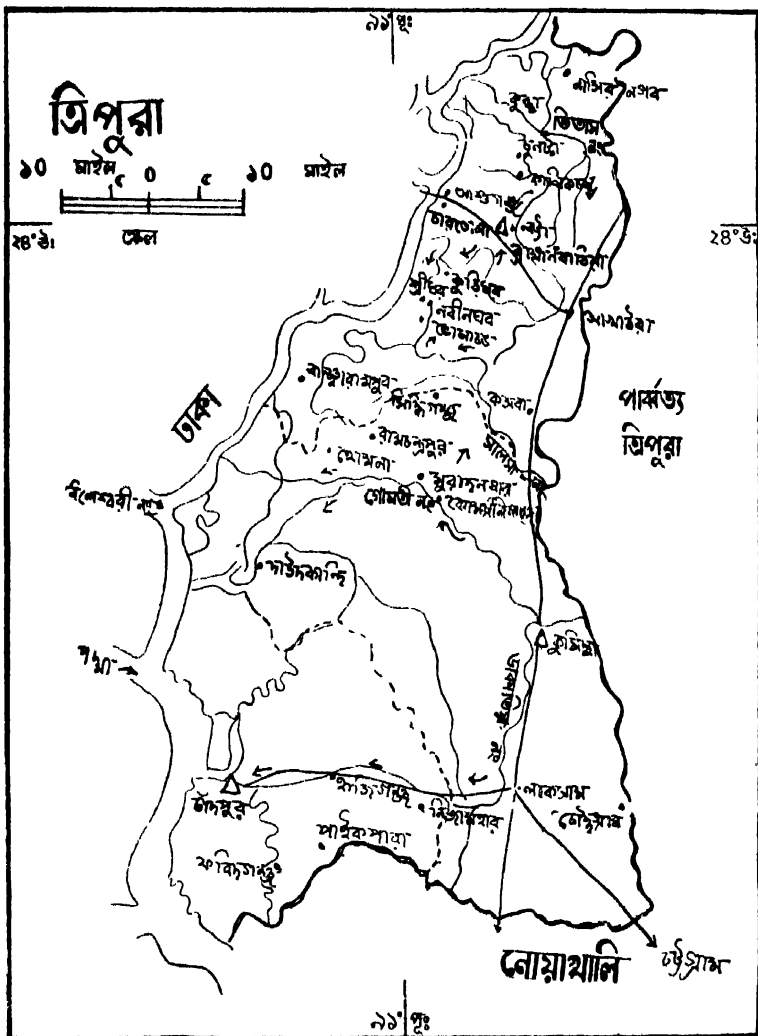
ত্রিপুরা চট্টগ্রাম বিভাগের একটি জেলা। ইহার তিনটি মহকুমা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার থানা: সরাইল, নাসিরনগর, কসবা, নবীনগর, বাঞ্ছারামপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

সদর মহকুমার থানা: মুরাদনগর, দেবীদ্বার, দাউদকান্দি, হোমনা, কুমিল্লা, বুড়িচঙ্, চান্দিনা, চৌদ্দগ্রাম ও লাকসাম।

চাঁদপুর মহকুমার থানা: কচুয়া, চাঁদপুর, ফরিদগঞ্জ, মৎলব বাজার।

ত্রিপুরা

মাটি :—সদরের পশ্চিমাঞ্চল, হোমনা ও দাউদকান্দি থানার অংশবিশেষে বর্ষায় বন্যা হইয়া যায়। মাটি নদীর ধারে বালি, অবশিষ্ট দোআঁশ। সদরের পূর্বাংশে, যেখানে ত্রিপুরার পর্বত সংলগ্ন, সেখানে সামান্য পাহাড়িয়া মাটি, অবশিষ্ট দোআঁশ। চৌদ্দগ্রামের পূর্বসীমানা হইতে পাহাড় কিন্তু দূরে, তাই সে স্থানে দোআঁশ, এখানেও সামান্য পাহাড়িয়া ভূমি আছে। ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমায় বিল বেশী (মাছের জন্য ইজারা দেওয়া হয়), এঁটেল মাটি প্রধান। তাহা ছাড়া যথেষ্ট দোআঁশও আছে। মেঘনার ধারে ধারে সদর, ব্রাহ্মণবেড়িয়া (নবীনগর থানা, সরাইল থানাতেও বালিয়া) ও চাঁদপুর মহকুমায় বেলে মাটি যথেষ্ট দেখা যায়। চাঁদপুরের অপরাংশে দোআঁশ। চাঁদপুরে ফরিদগঞ্জ আঠাল ও দোআঁশ। চাঁদপুরের আশেপাশে চরভূমিই বেশি (পাট বেশি হয়)।

চাষ—(ক) ধান ও পাট—(শ্রীহট্ট এবং ত্রিপুরার সীমানায় ২৫।৩০ মাইল এক একটি হাওড় আছে, সেখানে বিলের মত জল একেবারে শুকায় না। এখানে প্রধান চাষ বোরো ধান। অগ্রহায়ণ-পৌষে জলের ধারে বোনে. বৈশাখ নাগাদ কাটিয়া লয়।) এঁটেল মাটিতে ধানই প্রধান। বিলে বোরো হয়. (পৌষ-মাঘ থেকে চৈত্র-বৈশাখ তোলে) আমনই হয়, আউস নয়। সদর ও ব্রাহ্মণবেড়িয়ার বিল অঞ্চলে অতএব ধানই প্রধান শস্য, দাউদকান্দি, হোমনা, বাঞ্ছারামপুর নদীর পাশে পাট। বিল অঞ্চলে আমন (=বর্ষাল) ধানও হয়। ইহা জলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকে। দোআঁশ জমিতে পাটই বেশী। আজকাল পাট সঙ্কোচের ফলে ঐখানে ধান অপেক্ষাকৃত বেশী হইতেছে। বিল অঞ্চলের এঁটেল ও দোআঁশের মাঝের জমিতেও পাট ভাল হয়। এদেশে দোআঁশ অঞ্চলে যথেষ্ট পলি পড়ে, বান হয়।

চরের জমিতে ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমার দক্ষিণে মেঘনার ধারে তিতাসের পাড়ে ও গোমতীর পাড়ে অপর্যাপ্ত রাঙা আলু হয়, গোল আলুও হয়। চাঁদ পুরের চর ভূমিতে পাট ও যথেষ্ট মরিচ হয়। চালক মড়া. শশা, তরমুজ হয়।

(খ) তৈল—চাঁদপুরে তিল, ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় সরিষা যথেষ্ট উৎপন্ন হয়।

(গ) ডাল—মাষকলাই, মুগ, খেসারি, ব্যবসায়ের জন্য না হইলেও ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট হইয়া থাকে। মাষ ও খেসারি চালানও যায়।

(ঘ) ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমায় রেল লাইনের পূর্বভাগে সংকীর্ণ স্থানে কাঁঠালের খুব চাষ আছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে যথেষ্ট খায় ও চালান দেয়।

(ঙ) সদরে যথেষ্ট আখ ও গুড় (পাৎলা, জালায় রাখে) হয়, সদরে ও চাঁদপুরে খেজুর গুড়ও হয়।

(চ) চাঁদপুরে সামান্য নারিকেল ও সুপারি গাছ আছে। সদরেও কিছু সুপারি আছে।

(ছ) বাঞ্ছারামপুর থানায় মরিচ, আলু, পাট, মূলা প্রধান। সম্প্রতি চীনাবাদামের চাষ আরম্ভ হইয়াছে, ইহা অতি সামান্য।

(জ) নবীনগর থানায় সলিমগঞ্জ ও বাঞ্ছারামপুরে শনের চাষ (মেঘনার চরে) আছে।

জল—নদীর জল ছাড়া পুষ্করিণী অনেক আছে। সম্প্রতি নলকূপের প্রসারের ফলে পুষ্করিণীর অযত্ন ঘটিতেছে। কূয়া ও ইঁদারা এ জেলায় নাই বলিলেও হয়, কেবল ব্রাহ্মণবেড়িয়ার পূর্বভাগে যেখানে কাঁঠাল হয় সেখানকার মাটি কিছু শক্ত হওয়ায় কূপের চলন আছে। অন্যত্র কূপের দেওয়াল টিঁকে না। জল, ব্রাহ্মণবেড়িয়া অঞ্চলে ৬।৭ হাত নীচে চাঁদপুরে ৮।১০ হাত নীচে পাওয়া যায়। নলকূপগুলিও গভীর করা হয় না। নবীনগর থানায় গড়ে ১৫৫ ফুট (১৯০-২০৬।৭ ও যথেষ্ট, ২৫০ও আছে) সব নলকূপ হয়। ৪০।৫০ ফুটের পর হইতে বালি পাওয়া যায়, আরও নীচে ২৫০ ফুটে লাল বালিতে জল ভাল, ইব্রাহিমপুরের (নবীনগর) নলকূপটি এত গভীর।

সকল পুষ্করিণীই উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, উত্তর পাড়ে বাড়ি বা পশ্চিম পাড়েও বাড়ি।

দুধ—মহিষের দুধের প্রচলন নাই। (পার্বত্য ত্রিপুরা থেকে মহিষের দুধ কসবা, আখাউড়া কুমিল্লায় নামে।) গাই দুধ সর্বত্র পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় প্রচুর ও বিখ্যাত। নবীনগর হোমনার অংশ ও বাঞ্ছারামপুর থানাতে দুধ বেশী। মুসলমান চাষীরা দুধ বেচে, গোয়ালারা শুধু দই, ঘি, মাখনের ব্যবসায় করে। সকালে সর্বত্র গ্রামের বাজারে দুধ বিক্রয় হয়। দুধের বা ছানার খাবার বিশেষ নাই।

খাবার জিনিস—এদিকে চিঁড়ার চলন মুড়ির চেয়ে বেশি। চিঁড়া শ্রীহট্টের মাধবপুর হইতে চালান আসে। ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় খুব মিষ্টির দোকান আছে, বাঙালী দেশী কারিগরই সব। ব্রাহ্মণবেড়িয়ার চাঁদুরা বাজারে খুব চিঁড়া বিক্রয় হয় (নমঃশূদ্ররা তৈরী করে।)

মাছ—ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমায় প্রচুর, তবে ইলিশ (সরাইল ও নবী নগরে মেঘনাতেই পাওয়া যায়) [কৈবর্ত এবং ঝানো] কিছু কম। চাঁদপুরে ইলিশ যথেষ্ট। ব্রাহ্মণবেড়িয়াতে রুই, কাতলা, জিয়ল মাছ খুব। সেখানকার কৈ, পাবদা প্রসিদ্ধ। সদর মহকুমায় মাছ কিছু কম। দাউদকান্দি হইতে মোটরে ও ব্রাহ্মণবেড়িয়া হইতে রেলে মাছ আসিয়া কুমিল্লায় যোগান দেওয়া হয়। নোয়াখালি ও চাটগাঁতেও যোগান হয়। আশুগঞ্জ ও কান্দাউক (নাসিরনগর থানায়) মাছের বড় কেন্দ্র।

শুঁটকি ('হুটকি') মাছের ব্যবহার জেলার সর্বত্র আছে। নোনা ইলিশও গোয়ালন্দ থেকে আসে—(নুন হলুদে জড়ানো, টিনে বিক্রয় হয়) খুব চলে। শুঁটকি জেলায় যথেষ্ট তৈরী করা হয়, অন্য জায়গায় চালান যায়। ভদ্রলোকে পাবদা ও আড়ের শুঁটকি এবং নোনা ইলিশ পছন্দ করে। (ছোট পুঁটির) শুঁটকি একটু রসাল হয়, তাহাকে 'শীজল' বলে। ইহা জেলা হইতে যথেষ্ট চালান দেওয়া হয়। নদীপথে শুঁটকি শ্রীহট্ট হইতে আসে, সস্তা হয় (আড় প্রভৃতি আসে)। ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমার নাসিরনগর থানায় কান্দাউক বাজারের শুঁটকি খুব প্রসিদ্ধ (সোরা মাছ বলে)।

শীজল শুঁটকি পার্বত্য ত্রিপুরায় খুব প্রিয়। ত্রিপুরা জেলার কৈবর্তরা করে। ব্রাহ্মণবেড়িয়া অঞ্চলে সর্বত্র হয়। অগ্রহায়ণ মাস নাগাদ অসম্ভব পুঁটি বিল অঞ্চলে ধরে। বিলের জল বাহির হবার মুখে (অগ্রহায়ণ—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) বাঁশের বাধা দেয় এবং জাবের সাহায্যে নৌকায় বোঝাই করে। মাছগুলির পেট কেটে তেল গালিয়ে মাটিতে পোঁতা জালায় অগ্রহায়ণে শীজল তৈরী করে (নেত্রকোণার সঙ্গে তুলনীয়), পায়ে খড়ম পরে মাড়ায়। শেষে তেল দিয়ে ঢেকে মাটি চাপা দিয়ে রাখে, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে তোলে। মাছগুলি প্রথমে জালার মধ্যে বেশ সাজিয়ে রাখে।

ঘরদুয়ার—মাটির দেওয়াল জেলায় হয় না। শুধু ব্রাহ্মণবেড়িয়ার পূর্বভাগে শক্ত মাটির জায়গায় (যেখানে কূয়া ও কাঁঠাল হয়) কয়েকটি গ্রামে মাটির ঘর আছে। মুলিবাঁশের বোনা বেড়া বেশি সামান্য কাঁচা বেড়ার (= ছেঁচা)

উপরে মাটির লেপ দেওয়া ঘরও দেখা যায়। সাধারণতঃ ছনের ছাউনি। গরীবে পাটকাঠির (পাটখড়ির) বেড়াও দেয়। অবস্থাপন্ন লোক টিনের বেড়াও দিয়া থাকে, কাঠের বেড়া নাই বলিলেই চলে। চাঁদপুরে অবস্থা কিছু ভাল হওয়ায় টিনের চাল ও বেড়া অপেক্ষাকৃত বেশি। বর্ধিষ্ণুরা ক্বচিৎ ইটের দালান দেয়।

পাতি টিনের (কেরোসিন টিন কাটিয়া) বেড়া ও চাল অনেকেই করে। আলকাতরা দেয়। সিলিংকে 'কার' বা 'মাচা' বলে। তাহা ছাড়া নীচু 'উবি' থাকে (ময়মনসিংহের উবইর, কিন্তু সেখানকার মত বেড়া বা দুয়ার থাকে না)।

জ্বালানি—কাঠই বেশী, কয়লা খুবই কম, ধান ক্ষেতের নাড়াও জ্বালান হয়। ঘুঁটের চলন এদেশে কম।

শিল্প—গুড় সামান্য হয়, আগে বলা হইয়াছে। পার্বত্য ত্রিপুরা থেকে চাউল, চিঁড়া ধান যথেষ্ট আসে। ব্রাহ্মণবেড়িয়া থেকে অনেক জায়গায় চালান হয়। পাটির চালান সদরে যথেষ্ট। হিন্দু কারিগর তৈয়ারি করে। কিন্তু মিহিপাটি শ্রীহট্ট আসাম হইতে আমদানী হয়। ব্রাহ্মণবেড়িয়ার উত্তরভাগে (শ্রীহট্টের প্রভাববশতঃ) ভাল বাঁশ ও বেতের কাজ হয়। কুণ্ডা গ্রামে শ্রী-সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পিতা ৺শশীভূষণ দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'কুণ্ডা শিল্পাশ্রম' ভাল ঝুড়ি, ট্রে, টিফিন বাক্স, চেয়ার প্রভৃতি যথেষ্ট করিয়া কলকাতাতেও চালান দিতেছে! শ্রীমহেন্দ্র নন্দী (কালিকচ্ছ) ইহার প্রসারের খুব চেষ্টা করেন।

তেলের কাজ কলুরা করে। তাহারা সকলে মুসলমান। কুমিল্লা থানায় (সহরে হিন্দু তেলিরা তেল পাড়ে। তৈলকারকে অপর মুসলমান নীচু ভাবে না। সাধারণ গৃহস্থেও লাভের জন্য কলুর কাজ করিয়া থাকে। কলুর ঘানি এক বলদের (মুসলমান কলুদের মধ্যে কিছু ঘোড়ার চলন আছে। হিন্দু করে না) চোখে ঠুলি ফুটা আছে।

সদরের ময়নামতীর (কুমিল্লা সহরের ৫।৬ মাইল পশ্চিম) ছিট নাম করা। জামার জন্য ব্যবহৃত হয়। তাঁতি কম, হিন্দু যুগীরাই তাঁতের কাজ বেশী করে। জোলা নাই। যুগীরা সাধারণ মেয়েদের শাড়ী, লুঙ্গী, গামছা করে; নাম করা কিছু নয়।

কুমোর—সাধারণ গ্রাম্য।

কুমিল্লার (কোতোয়ালি থানা) হুঁকার খোল খুব বিখ্যাত। মুসলমান কারিগর করে।

ব্রাহ্মণবেড়িয়ার পল্লী কালিকচ্ছ ও মেড্ডার কামারেরা ভাল সর্তা (জাঁতি) দা, হুড়গ তৈয়ারি করে। কালিকচ্ছের কামারেরা ৺মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নমুনায় দেশী ঢালাই-এর কল তৈয়ার করিয়া দিয়াছিল।

বিদেশী শিল্প—চাঁদপুরে ১টি তেল ও ২টি বরফের কল আছে। আশুগঞ্জে তেলের কল ছিল, এখন চলে কিনা জানা নাই। বরফ কল আছে।

মেলা—নিজ মেহার-কালীবাড়ি মেলা বিজয়া দশমী হইতে কালীপূজা পর্যন্ত চলে, পৌষ সংক্রান্তিতে বসে। এখানে মনোহারী, কাপড়চোপড়, কাঠের কাজ ও নানারকম তৈয়ারী মাল বিক্রয় হয়। কসবার মেলাও বড়।

বন্দর—মুরাদনগর থানার পূর্ব-উত্তর প্রান্তে রামচন্দ্রপুর ও সিদ্ধিগঞ্জে (মুরাদনগরের উত্তরে) সুতা ও কাপড়ের বহু বাজার বসে। (হিন্দু যুগী ও মুসলমান তাঁতি বহু)।

আশুগঞ্জ—পাট খুব। চামড়াও যথেষ্ট চালান যায়। শ্রীহট্ট হইতে ধানও বেশ আমদানী হয়, কিছু রপ্তানীও হয়।

চাঁদপুর—পাট-প্রধান বন্দর। তামাকও চালান আসে। নোয়াখালি জেলার প্রয়োজনীয় জিনিস চাঁদপুর বন্দরে নামে।

আখাউড়া—ত্রিপুরা রাজ্যের প্রয়োজনীয় আমদানী এই স্থান হইতে হয়। ইহা পাটের ভাল বাজার। ভোলাচঙ—পাটের বাজার।

কারতোলা—প্রতি সপ্তাহে গরু বাছুরের বড় হাট বসে।

রামচন্দ্রপুর—সবচেয়ে বড় বাজার। ইলিয়টগঞ্জ, কোম্পানীগঞ্জ, কালিগঞ্জ, শ্রীঘর, দাউদকান্দি গরুর সাপ্তাহিক হাট।

ত্রিপুরার চাঁদুরা, কান্দাউক বাজারের পাট উৎকৃষ্ট হয়।

সামাজিক ব্যবস্থা—ঋষিরা চামড়ার কাজকর্ম করে, ঢাকার মুসলমান চালান দেয়। মেড্ডা, ভাদুঘর, কান্দাউক, রাউতাই, ভোলাচঙ ও নাটঘর ঋষিদের প্রধান গ্রাম। গ্রামে ঋষিদের ভাগাড়গুলির সম্পর্কে এলাকা ভাগ করা আছে। ঋষিদের খুব বড় দুটি বসতি। নিজেদের সর্দার পঞ্চায়েতে বিচার চালায়। আজকাল স্বদেশী কর্মীদের চেষ্টায় মুনিষ, মাঝি, তাঁতের কাজ, লেখাপড়া শেখা, চামড়া পাকান ও জুতা তৈয়ারির কাজ শিখিতেছে। সঙ্ঘবদ্ধভাব খুব বেশী। ভৈরবের নিকট নরসিংদিতে লুটতরাজের পর এ অঞ্চলে ঋষিদের সহায়তা লাভের জন্য

হিন্দুরা তৎপর হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। নাটঘরে শ্রীবলাই ধর ও ভোলাচণ্ডের স্বরেন রায় মহাশয়ের চেষ্টা প্রশংসনীয়।

পূর্বে ধোপা, নাপিত ও মালিদের (বাজনা বাজায় ও ঘরদোর ঝাঁট দেয়) চাকরাণ জমি দেওয়া থাকিত, অপরকে নহে। এখনও কিছু বজায় আছে, তবে নগদ কারবার বাড়ায় পুরাতন ব্যবস্থার বাঁধন শিথিল হইয়া যাইতেছে। নাপিতের এখনও কোথাও কোথাও বাৎসরিক টাকার ব্যবস্থা আছে। পূজাপার্বনে বাজনা মুসলমানে বাজায়। মাছের কারবার হিন্দু কৈবর্তদের হাতে, আজকাল মুসলমানরাও করে।

[ঋষি ও কৈবর্তদের সামাজিক শাসন, কমনফাণ্ড ইত্যাদি আছে।]

হিন্দুদের হাতে মহাজনী, তালুকদারী হওয়ায় তাহাদের প্রতিপত্তি বেশী। জেলায় ৭৭% মুসলমান। মহাজনী ও তালুকদারীতে মুসলমানের সংখ্যা কম। প্রায় সব মুসলমান চাষী। ব্রাহ্মণবেড়িয়াতে নৌকার মাঝি হিন্দুই বেশী (৭৪%)। সদর ও চাঁদপুরে হিন্দু মাঝি খুব কম।

মোটের উপর হিন্দু মুসলমানের সামাজিক সম্পর্ক ভাল, নারী হরণ অতি কম বলা চলে।

বিলে মাছ ধরার রীতি—(১) চাঁচি (মুলি বাঁশ দিয়া) বাঁধে। জলের উপরে ২ হাত, জলের নীচে ৬।৭ হাত। (২) নদীতে খ্যাও কাট—বর্ষার সময়ে তিতাস নদীতে খ্যাও কাটে। তেঁতুল, স্যাওড়া প্রভৃতি ডাল কাটিয়া জলে ফেলে ও উপরে কমলিলতার দাম ফেলে। শীতের সময়ে পৌষ থেকে চৈত্র পর্যন্ত জল কমিয়া গেলে জাল দিয়া জায়গাটি বেড়িয়া মাছ ধরে। এক এক খ্যাও কাটায় ২।২৫০০৲ টাকার মাছও ওঠে। মাছ—চিংড়ি, রুই, শোল, বোয়াল, পুঠা (সর পুঁটি)। কৈবর্তরাই প্রধানতঃ করে, আজকাল মুসলমানেরাও করিতেছে। এক তিতাস নদীতেই ২।২৫০০ খ্যাও আছে। কচুরীপানা দিয়াও বাঁধে, বলাইবাবু উহা নিবারণের চেষ্টায় তিতাস খ্যাও গণিবার ভার পাইয়াছিলেন।

পার্বত্য ত্রিপুরা
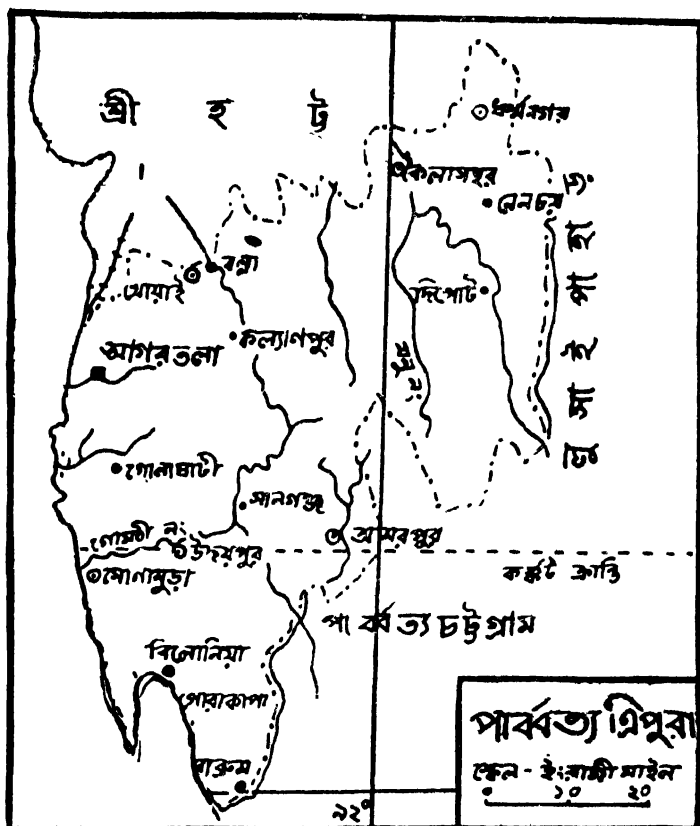
পার্বত্য ত্রিপুরা দেশীয় রাজ্য ঃ—আগরতলা, সোনামুড়া, খোয়াই, কমলপুর, কৈলাসহর, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, সাব্রুম, অমরপুর, উদয়পুর—এই কয়েকটি শাসন বিভাগে ভাগ করা।

মাটি ঃ—পাহাড়িয়া অঞ্চল। পশ্চিম দিক হইতে পূর্বদিকে উঁচু। জম্পাই, আঠারমুড়া, ল্যাঙ্‌তরাই প্রভৃতি ৫।৬টি পাহাড় পূর্বদিকে সমান্তরাল ভাবে আছে। পাহাড়গুলি বাঁশবন ও জঙ্গলে পূর্ণ। অন্যান্য নীচু জায়গা জলা, বেতবন ও লম্বা ঘাসে পূর্ণ। পশ্চিমদিকে অনেক টিলা আছে। আগরতলার কাছে ও অন্য সমতলে লাল মাটি দেখা যায়। পাহাড় অঞ্চলের মাটি নানা প্রকার হয়। জাম্পুই পাহাড়ে একস্থানে লবণ পাওয়া যায়। পাহাড়গুলি সাধারণতঃ বেলে পাথরের।

নদী :—গোমতী, মুহুরী, খোয়াই, দোলাই, মনু, জুরি ও ফেণী নদীগুলি দিয়া পানসী, ডিঙ্গী, শালতি প্রভৃতি চলাচল করে। ৩০ মণের বোঝাই নৌকা পর্য্যন্ত চলিতে পারে। জঙ্গলের বড় বড় কাঠ নদী দিয়া ভাসাইয়া আনা হয়। এই কাঠে ভাল নৌকা হয়।

বন জঙ্গল :—পাহাড় অঞ্চলে ঘন বাঁশের বন আছে। নানা প্রকার শিল্পকাজে ইহার ব্যবহার হয়। প্রচুর পরিমাণে বাঁশ টিটাগড় পেপার মিলে চালান যায়। ত্রিপুরার বাঁশের বাঁশীর আদর আছে। শাল, গর্জন, নাগেশ্বর, জারুল, গাম্ভারী বৃক্ষ পাওয়া যায়। কুচিলা ও ডলুবাড়ীর নিকট মূল্যবান আগর গাছ পাওয়া যায়। নীচু জায়গায় লম্বা ঘাস ও বেতবন আছে। বাঁশ, বেত, ছন ও জ্বালানী কাঠ রাজ্যের বাহিরে চালান যায়।

চাষ :—পাহাড়িয়াগণ জুম প্রথায় চাষ করে। ধান, পাট, তিল, কাপাস, ইক্ষু, সরিষা প্রধান। নীচু জলা জায়গায় ধান চাষ হয়। ইহা ছাড়া অন্য জায়গাতেও হয়। নানাপ্রকার সব্জী আলু, পটল, লঙ্কার চাষ আছে। লঙ্কা পাহাড়িয়াগণের খুব প্রিয়। আনারস, কমলালেবু প্রভৃতি নানা জাতীয় ফল সমতলে প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া চায়ের প্রচুর চাষ হয়। কৈলাসহরে হীরাছড়ায় প্রথম চায়ের বাগান হয়। বিভিন্ন ধরণের তৈলবীজও হয়। জুমচাষে অরণ্য সম্পদ নষ্ট হইতেছে।

দুধ :—উদয়পুর হইতে মহিষের দুধ চালান যায়। নেপালীরা গিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছে—দুধ কুমিল্লায় চালান দেয়। (মহারাজার মা নেপালী।) পাহাড়ীয়ারা মহিষের দুধ বিক্রী করে।

মাছ :—আগরতলায় শুঁটকী চালান আসে। শুঁটকী টিপ্‌রারা খুব খায়। শীজল শুঁটকী ('বৈর মাছ') একটু পোড়াইয়া মশলা দিয়া খায়। বাঁশের ডাণ্ডায় নাপ্পির মত করে।

শিল্প :—গুড় হয়। ত্রিপুরা ও অন্যান্য অঞ্চলে চাউল, চিঁড়া ধান যথেষ্ট চালান যায়। তেল—মুসলমান কলুরা করে। ইহারা পূর্ব্ববঙ্গের বাসিন্দা। কাঠের দুইখণ্ড ভারী পাটার মধ্যে ভাপানো ছেঁচা তৈলবাহী বীজকে চাপিয়া তেল বাহির করে। তাঁতের কাজ—আদিবাসী মেয়েরা করে, পুরুষেরা করে না। তাঁত বোনা মনিপুরীদের মতই। বিলাতী রং ব্যবহার করে। ত্রিপুরী মেয়েদের হাতে তৈয়ারী 'রিয়া' খুবই সুন্দর। রঙিন রেশম ও কার্পাসের কোন কোন ত্রিপুরী

কাপড়ে সোনা ও রূপা কাজ করা থাকে। বেতের কাজের চলন নাই। নৌকা—কুন্দা ও বড় (Dugout) নৌকা তৈয়ারী করে। নোয়াখালি হইতে আগরতলায় বড় নৌকা করিয়া মাল আমদানী করা হয়। অন্যত্রও চালান যায়। ছাতার বাঁট তৈয়ারী হয়।

আগরতলার কাছে মহারাজা ম্যাচ ফ্যাক্টরি নামে একটি দিয়াশলাই কারখানা আছে।

ঘর ছাউনি ইত্যাদি কাজে মেয়ে পুরুষ উভয়েই মজুর খাটে।

ঘর :—টিপারাগণ মাচার উপর 'টঙ্গে' বাস করে। টিলার উপর সাধারণতঃ লোকেরা ঘর বাঁধে। ঘরগুলির চাল ছনের, বাঁশের (বোনা) ঘর।

উৎসব :—চৈত্রমাসের শেষ দিন ইহারা বর্ষ বিদায় উৎসব করে। ইহাতে খাওয়া দাওয়া ও আমোদ আহ্লাদই বেশি। আশ্বিন মাসে ফসল কাটিবার সময় মিকাটোল বা নবান্ন উৎসব হয়। অগ্রহায়ণ মাসে হৈমন্তিক ধান কাটা হইলে নূতন শস্যের উৎসব হয়। এই উৎসবে 'মনুই' নামক ধানে কাঁজি তৈয়ারি করে। ইহা পাহাড়িয়াগণের অতি প্রিয়। প্রধান উৎসবের নাম কের পূজা। সকলের শান্তির জন্য এই পূজা হয়। গোপনে প্রত্যেকে নিজের নিজের বাড়ীতে এই পূজা করে। দুই দিন ধরিয়া চলে। প্রত্যেকে প্রথম দিন রাত্রি দশটা হইতে তৃতীয় দিন সকাল ছয়টা পর্য্যন্ত দরজা বন্ধ করিয়া রাখে—বাড়ীর বাহিরে যায় না। এ সময় অনেক প্রকার বিধি নিষেধ মানা হয়। গোমতী নদীকে সকল আদিবাসী পূজা করে। গোমতী নদী উৎস স্থানের তীর্থমুখ ইহাদের তীর্থস্থান। প্রতি বৎসর বহু লোক স্নানের জন্য একত্রিত হয়।

ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান ভাষা বাঙলা। বাঙলার পর টিপ্‌রা ভাষা। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার বাহিরে এই ভাষার ব্যবহার দেখা যায় না। অনেক ত্রিপুরী নিজেদের মধ্যে বাঙলা ব্যবহার করেন। ইহা ছাড়া হিন্দী, মনিপুরী, হালাম ভাষাও চলে।

ধর্ম :—তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রাবল্য ছিল। এখন বেশী হিন্দু। লুসাই, কুকি প্রভৃতি পাহাড়িয়াগণ অনেকে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে।

নোট : আগরতলা রাজধানী। আখাউড়া হইতে ৬ মাইল দূরে।

কৈলাসহরের বাজারে তুলার বিনিময়ে কেনা বেচা হয়। তামাক, সুপারি

ও শুঁটকি মাছের বিনিময়ে ব্যবসাও চলে। উদয়পুরে পাহাড়িয়াগণ বাহাদুরী কাঠ, বাঁশ ও তুলার বিনিময়ে তামাক, লবণ ও শুঁটকী মাছ লইয়া যায়।

জীব-জন্তু :—ত্রিপুরার হাতী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর বহু হাতী বাহিরে চালান যায়। হাতী ধরিবার জন্য রাজ দরবারের অনুমতির প্রয়োজন। মনু ও দেও নদীর কাছে বন্য হাতী দেখা যায়।

অম্পি ও ব্রহ্মছড়া অঞ্চলে গণ্ডার পাওয়া যাইত।

অনেক প্রকার পাখী এখানে দেখা যায়। তাহার মধ্যে ধনেশ, ময়না, তোতা, ভৃঙ্গরাজ প্রভৃতি পাখী বিখ্যাত। টিয়া, ময়না, চন্দনা প্রভৃতি পাখী নোয়াখালি, সিলেট অঞ্চলে বিক্রীর জন্য পাঠান হয়।

দ্রষ্টব্য স্থান :—উনকোটি ও কৈলাসহর বিভাগের অনেক জায়গায় পাহাড়ের গায়ে অনেক দেবমূর্তি খোদাই করা আছে। আশে পাশে অনেক পাথরের মূর্তি আছে। ইহাদের মধ্যে উনকোটিশ্বর কালভৈরবের মূর্তি দেখিবার মত। উদয়পুর ও অমরপুর বিভাগের বড়মুড়া পাহাড়ের গায়ে সার দিয়া কয়েকটি দেবতার মূর্তি খোদাই করা আছে। এই জায়গাকে 'দেবমুড়া' বলা হয়। রাইমা ও শর্মা পাহাড় হইতে ছোট ছোট জলধারা মিলিয়া আঠার-মুড়া পার হইয়া তীর্থ মুখের কাছে গোমতী নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এইখানে সাতটি জল প্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাকে ডম্বরু বলা হয়।

যাতায়াতের ব্যবস্থা :—ত্রিপুরায় যাতায়াতে ভাল রাস্তা নাই; জলপথই ব্যবহার হয় বেশি। কোন রেলপথ নাই।

বিয়াল্লিশের বাংলা

(ঢাকা বিভাগ)
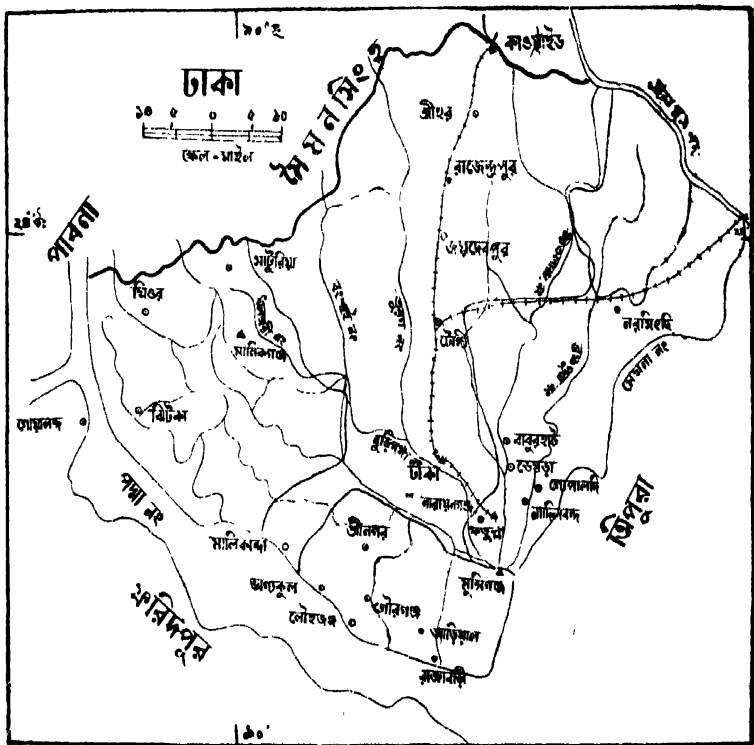
ঢাকা জেলার ৪টি মহকুমা।

সদর মহকুমার থানা—ঢাকা শহর, তেজগাঁও, কেরানিগঞ্জ, জয়দেবপুর, কাপাশিয়া, শ্রীপুর, কালিগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, দোহার, সাভার, কালিয়াকোইর, ধামরাই, লালবাগ, সূত্রধর।

নারায়ণগঞ্জ মহকুমার থানা—নরসিংদি, বৈদ্যবাজার, নারায়ণগঞ্জ, রূপগঞ্জ, আড়াই হাজার, ফতুল্লা, রায়পুর, শিবপুর, মনোহরদি।

মুন্সীগঞ্জ মহকুমার থানা শ্রীনগর, শিরাজদিয়া, লৌহজঙ্গ, টঙ্গিবাড়ী মুন্সীগঞ্জ।

মানিকগঞ্জ মহকুমার থানা—সাটুরিয়া, ঘিওর, দৌলতপুর, হরিরামপুর, শিঙ্গাইর।

ঢাকা

মাটী :—ঢাকার উত্তরে মোটামুটি তুরগ নদী ও শীতলাক্ষার মধ্যে ভাওয়াল পরগণার উঁচু ও লাল রঙের মাটি, ময়মনসিংহ জেলার মধুপুর জঙ্গলের মত। তাছাড়া মাণিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ও নারায়ণগঞ্জ মহকুমার সর্বত্র নদ-নদীতে ভরা। বর্ষায় জলে একাকার হইয়া যায়, নদীর পলিমাটি পড়ে। (শ্রীনগর থানার আড়ইল বিল প্রভৃতি অঞ্চল পলিতে উঁচু হইতেছে। আজকাল জ্যৈষ্ঠ হইতে আশ্বিন পর্যন্ত নৌকায় চলাচল করিতে হয়।) ধলেশ্বরীর বালি খুব ভাল।

জল—ভাওয়াল পরগণায় কুয়া আছে, তবে পুকুরের চলন বেশী। জেলার অন্যত্র বহু পুকুর দেখা যায়। শীতলাক্ষার জল খুব পরিষ্কার ও ভাল বলিয়া প্রসিদ্ধ।

চাষ—ভাওয়াল পরগণার মাটিও খুব উর্বরা; পাট ও ধান সমান সমান হয়। অন্য অঞ্চলে ধান অপেক্ষা পাট বেশী। জেলায় ধানের চাষ পর্য্যাপ্ত পরিমাণ হয় না বলিয়া বরিশাল হইতে ধান আমদানী করিতে হয়। নারায়ণগঞ্জে চিনির কল স্থাপিত হওয়ার ফলে আশেপাশে আখের চাষ বাড়িয়াছে। ঢাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গণ্ডেরি আখ বিখ্যাত। ইহাকে বোম্বাই আখও বলে। ব্যবহারের উপযোগী সরিষা, কলাই, ডাল, চীনার চাষ আছে। চর অঞ্চল হইতে তরমুজ, ফুটি চালান যায়।

চীনার জাউ ও পায়স হয়, কেহবা ভাতের সঙ্গে কিছু চীনা মিশাইয়াও রন্ধন করে।

[পাটের ব্যবসায়—আষাঢ়ে পাট উঠিতে আরম্ভ করে, ভাদ্রে এবং আশ্বিনে সব চেয়ে বেশী আসে, অগ্রহায়ণ পর্যন্ত চলে। ভাওয়ালের উঁচু জমির পাটও ভাল, কিন্তু দেরীতে বাজারে আসে।]

লৌহজঙ্গ অঞ্চলে তামাকের চাষ আছে। বংশাই নদীর ধারে কাঁঠাল ও আনারস খুব ভাল।

দুধ—লৌহজঙ্গ অঞ্চল বা বিক্রমপুর পরগণায় খুব ভাল দুধ হয়। প্রচুর পাওয়া যায় এবং দরও সস্তা। লৌহজঙ্গের পাতক্ষীর বিদেশে চালান যায়। ঢাকার নিকট টাইটক্যার ক্ষীরও বিখ্যাত।

মাছ—কার্তিক হইতে চৈত্র পর্যন্ত গোয়ালন্দগামী মেল ষ্টীমারকেও ঘাটনল ষ্টেশনে (ত্রিপুরা জেলা) মাছের জন্য দাঁড়াইতে হয়। ঢাকার মাছ (মুন্সিগঞ্জের পূর্বাঞ্চলের) ঘাটনল দিয়া চালান হয়। লৌহজঙ্গ, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি ষ্টেশন হইতেও যথেষ্ট মাছ ওঠে; গোয়ালন্দ হইয়া কলকাতা যায়। রুই, কাৎলা, ভেটকি, চিতল, আড়, কৈ, পাঙাস প্রভৃতি যায়।

খাবার—বিক্রমপুরে সাহা, তিলিদের বাড়ির মেয়েরা মুড়ির মোয়া (মিশ্রীতে জমান) চমৎকার তৈয়ারী করেন।

ঘর, দুয়ার—ব্যবসায়ের কারণে ঢাকা ধনী জায়গা। সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতেও টিনের বেড়া ও টিনের চাল আছে। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বেড়া কাঠের। এজন্য সেগুন প্রভৃতি চালানি কাঠ ব্যবহৃত হয়। ইহাকে 'কাঠোরা' বলে (যথা, 'কাঠোরা করা' বাড়ি)। গরীবের মুলিবাঁশের বেড়া।

ঢাকার কাছে বুড়ীগঙ্গার অপর পারে পাটজোয়ার পরগণায় ইটের (টালি, খোয়াই) বৃহৎ কারবার ইদানীং চলিতেছে। (সিলিংকে 'কার' বলে, উগইর তাহা অপেক্ষা নীচু মাচার মত বস্তু।)

জ্বালানি—সদর, ভাওয়াল ও উত্তর নারায়ণগঞ্জের ভাওয়াল পরগণা হইতে আমদানী চেলাকাঠ (লাকড়ি) বেশী। নারায়ণগঞ্জের দক্ষিণাংশে, মানিকগঞ্জ প্রভৃতিতে কয়লার চলন বেশী। গোয়ালন্দের পথে চালান আসে।

দেশী শিল্প—পূর্বে গ্রামাঞ্চলে 'পঞ্চবিত্তা (পঞ্চবিত্তায়ং ছিল:—কামার, কুমোর, ছুতার, ধোপা, নাপিত। গৃহস্থ ইহাদের বৃত্তি দিয়া রাখিত। আজকাল এ ব্যবস্থা আর নাই বলিলেও চলে।

(ক) কামার—গ্রামে বা হাটে ছড়ান ভাবে কাজ করে, শুধু কামার পাড়া নাই। সোনার কাজ যাহারা করে তাহাদের 'কর্মকার' বলে, 'স্যাকরা' বা 'স্বর্ণকার' শব্দের চলন নাই।

(খ) কুমোর—বড় ব্যবসায়। তবে ইহারা সচরাচর নিজে ঘোরাঘুরি করিয়া বিক্রয় করে না। কুমোর প্রধান গ্রামও আছে। ঢাকা জেলায় ভূমিহীন মজুরের সংখ্যা কম নয়, বহু। তাহারা আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত অর্থাৎ পাটের মরশুমে, কুলির কাজে রোজগার করে। তারপর নৌকা বাহিয়া খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার ধান কাটিতে যায়। মজুরী হিসাবে ধান পায়। সেই ধান নৌকায় আনে। যাইবার সময়

নৌকার বাহির দিকে মাচা বাঁধিয়া ও ছইএর উপরে বাঁশের বেড়া দিয়া বহু হাঁড়ি সাজাইয়া ঐ ঐ জেলায় হাঁড়ি, পাতিল লইয়া বিক্রয় করিতে আসে। এমনি বিক্রয়ের জন্যও নৌকা যায়।

(গ) তিলি (কুণ্ড, পালরা)—ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া থাকে। তাহাদের জল কিন্তু চল নহে। (অন্যত্র বাস করিয়া তাহারা সামাজিক পূর্ব্ব মর্যাদা পরিত্যাগ করিয়া উন্নত হইবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু পরিচিত গ্রামে তাহাদের জল অচল থাকিয়া গিয়াছে।

মীরকাদিম ও কমলাঘাটের মধ্যে অনেক কলুর বাস (২ মাইল ব্যাপিয়া), তেল তৈয়ারীর একটা কেন্দ্র।

(ঘ) ছুতার—ঢাকা জেলায় ছুতারের কাজের খুব আদর আছে। ঘর, দুয়ার নির্ম্মাণ করা ছাড়া নৌকার কাজও ইহারা করে। কোনো কোনো হাটে এবং মেলায় তৈয়ারি নৌকা বিক্রয় হয়, গৃহস্থেরা কিনিয়া রাখে। ঘরদোরে কাঠের উপর লতাপাতার নক্সা খোদাই করাও হয় ('কাঠোরা করা বাড়ি')। চৌকি, খাট, সিন্দুক, কাঠের পিঁড়ি প্রভৃতি গৃহস্থের প্রয়োজনীয় জিনিষে ঢাকার হিন্দু কারিগরদের বেশ নাম আছে। ইহারা অন্য জেলায় (যথা, বরিশাল) কাজ করিতেও যায়।

(ঙ) তাঁতি—ঢাকা সহরের সাড়ীর খুব নাম আছে। পূর্বে মসলিন বিখ্যাত ছিল। ডেমড়ার কাপড় বিখ্যাত। বাবুরহাটের মোটা সুতার লুঙ্গি, ধুতি ইত্যাদি জেলার সর্বত্র লোকে কিনিয়া লইয়া যায়।

মানিকগঞ্জের নিকট শিবরামপুর গ্রামে সূতা রং করার কাজ হয়। তবে সূতা চালান আসে, বংগে বিদেশী।

(চ) কাঁসারি—লৌহজঙ্গের নিকট গৌরগঞ্জের কাঁসার কাজ কলকাতাতেও চালান যায়।

(ছ) শাঁখারি—ঢাকা সহরে (বসাক) শাঁখারিবাজারের শাঁখার খুব আদর আছে।

(জ) বোতাম—নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে পুকুরের ঝিনুক হইতে বোতাম তৈয়ারি হয়। ইহার বেশ চলন আছে, (ঝ) আড়িয়ালের কাগজ শিল্প সামান্য হইলেও নাম করা। (ঞ) ভাগ্যকুলের নিকট ভাল বেতের কাজ হয়। (ট) ফতুল্লার চিঁড়া, (ঠ) ঢাকার শোলার সাজ খুব ভাল ও হাতীর দাঁতের কাজও খুব বিখ্যাত।

বিদেশী শিল্প—(ক) কাপড়—নারায়ণগঞ্জে—৪টি, ঢাকায় ১টি কাপড়ের কল আছে। (খ) মোজা-গেঞ্জি—নারায়ণগঞ্জে ৩টি, তাহার কাছে গোপালদিতে—২৫।৩০টি মোজা গেঞ্জির কল আছে। এ ব্যবসায় মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের হাতে। (গ) বরফের কল—মুন্সিগঞ্জে ১টি, লৌহজঙ্গে ১টি, নারায়ণগঞ্জে ২টি মাছের জন্য। (ঘ) চিনির কল—নারায়ণগঞ্জে ১টি।

কলে যাহারা মজুরি করে তাহারা সবই বাঙালী। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পরিশ্রম করার ক্ষমতার তারতম্য দেখা যায় না। কলকারখানাগুলির মালিক সবই বাঙালী ধরা যাইতে পারে।

বন্দর—নারায়ণগঞ্জ পৃথিবীর মধ্যে কাঁচা পাট বিক্রয়ের সবচেয়ে বড় বন্দর। মাড়োয়ারী, ইংরাজ, বাঙালী (অল্প) খরিদ্দারদের বড় বড় আড়ত আছে। লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ হয়। এই ব্যবসায়কে কেন্দ্র করিয়া নৌকা, মাঝি ঢুলি, কেরানী, দালাল আড়তদার—নানাবিধ কাজ কারবার গড়িয়া উঠিয়াছে। অনুমান ৭০।৮০ বৎসর হইতে চলিতেছে। এদিককার নগদ পয়সা পাট। সেই পয়সাকে কেন্দ্র করিয়া আবার সৌখীন জিনিষ পত্রের আমদানী, নির্মাণ ও ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়াছে। সেবাজদিঘা, (ফরিদপুরে চর মুগুরিয়া), (ত্রিপুরার চাঁদপুর), মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদি প্রভৃতিও পাটের বড় বিক্রয়কেন্দ্র।

পদ্মার ধারে মীরকাদিম, তালতলা, কমলাঘাট, প্রভৃতি বন্দরে সবরকম কেনাবেচা চলে;

মাধবদিতে কাপড়ের বড় ব্যবসায় আছে। ইহা নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত। (মেঘনার ধারে ধারে ধনীদের ঘরবাড়ি, মঠ দেখা যায়। চুরি ডাকাতিও বেশ হয়।)

মেলা, হাট—মাণিকগঞ্জে ঘিওর (বুধবার) এবং সিটকার (শনিবার) হাটে নদীয়া জেলা হইতে গরু-বাছুর চালান আসে। সাটুবিয়ার হাট খুব বড়, দালান নির্মাণের জন্য কাঠ-কাঠরাও বিক্রয় হয়।

যানবাহন—ভাওয়াল পরগণায় কিছু গরুর গাড়ী চলে। তবে নৌকাই এদিককার প্রধান বাহন। গহনার নৌকায় নিয়মিত সময়ে রেলগাড়ীর মত সস্তায় যাতায়াত চলে। মোটরলঞ্চ, ষ্টীমারত আছেই।

লোকের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল বলিয়াই বোধ হয়। 'সওয়ারি' (ডুলি) ও ঘোড়ার চলন বিক্রমপুর পরগণায় দেখা যায়। পাল্কীও বেশ চলে। তবে বর্ষায় নৌকা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

মানুষ—মুসলমানদের মধ্যে বর্ধিষ্ণু গৃহস্থের সংখ্যা খুবই কম, অধিকাংশই গরীব চাষী। হিন্দুর মধ্যে তেজারতি মহাজনী, গোলদারী, খরিদ বিক্রয় প্রভৃতি সর্ববিধ ব্যবসায় যথেষ্ট। সুতার ব্যবসায় সাহাদের। তিলি (পাল, কুণ্ডু, রায়) দের হাতে ও বসাকদের হাতেও ব্যবসায় যথেষ্ট। মাড়োয়ারিরা ছোট ব্যবসায়ে বাঙালীদের হটাইতে পারে নাই। চাকুরিয়ার সংখ্যাও যথেষ্ট।

বছর পনের হইতে মুসলমানেরা ক্রমে বর্ষায় ইলিশ মাছ ধরার কাজ এবং ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। পূর্বে জাত হারাইবার ভয়ে জেলের কাজ করিত না, আজকাল বেশ করে।
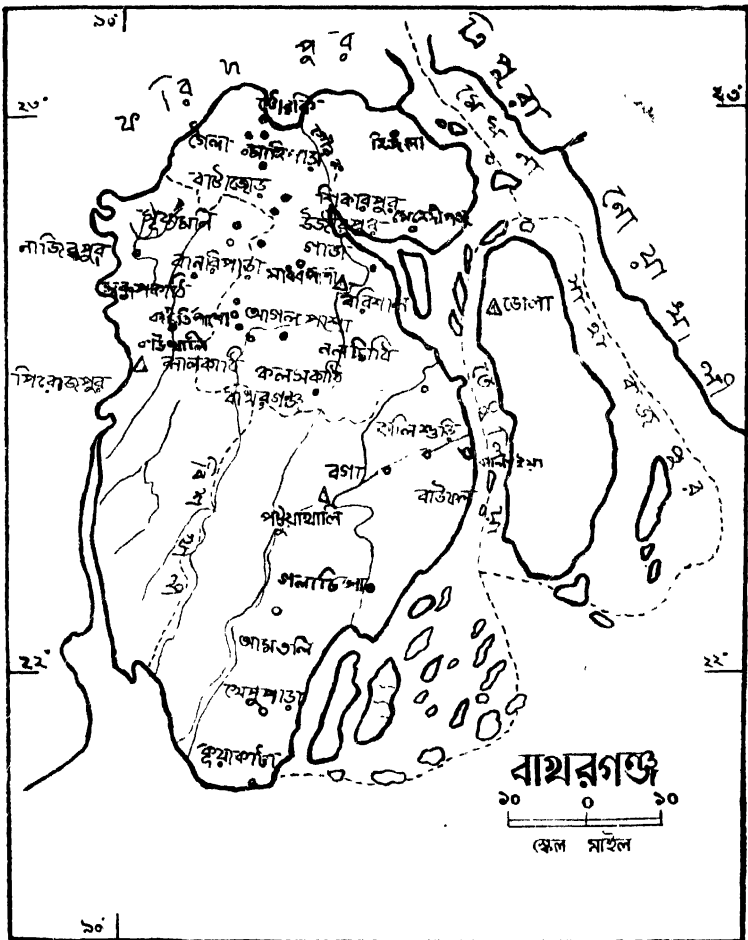
বাখরগঞ্জ জেলায় ৪টি মহকুমা।

সদর মহকুমার থানা—বাখরগঞ্জ, মেহেন্দিগঞ্জ, হিজলা, মুলদী, গৌরনদী, উজিরপুর, বাবুগঞ্জ, ঝালকাঠি, রাজাপুর, নলচিঠি, বরিশাল।

পিরোজপুর মহকুমার থানা—মঠবেড়িয়া, পাথরঘাটা, বামনা, স্বরূপকাঠি, নাজিরপুর, বানরিপাড়া, পিরোজপুর, কাউখালি, ভাণ্ডারিয়া, কাঠালিয়া।

পটুয়াখালি মহকুমার থানা—পটুয়াখালী, বেবাগি, মির্জাগঞ্জ, বাউফল, আমতলি, কল্যানপাড়া, বরগুনা, গলাচিপা।

দক্ষিণ সাহাবাজপুর (ভোলা) মহকুমার থানা—ভোলা, দৌলতখাঁ, তজুমদ্দিন, লালমোহন, বড়নদী।

বাখরগঞ্জ

মাটি :—জেলার দক্ষিণে সর্বত্র বালি। উত্তরে মাটি—আঠাল নয়, ঢিলা কিন্তু বালি নয় (দোআঁশ) মধ্যস্থলে নলচিঠি ও বাখরগঞ্জ—সন্নিকটে এঁটেল। পটুয়াখালিতে পুকুর খুড়িতে গিয়া—(সুপুরি বাগানে মন্দার গাছ লাগালে তাহার দ্বারা ভাল সারের কাজ হয়।) নীচে বড় বড় গাছের গুড়ি (পাথরের মত ?) পাওয়া গিয়াছে।

জল ঃ - পিরোজপুর পটুয়াখালি, ও ভোলায় অনেক পুকুরে জোয়ার ভাটায় জল কমে বাড়ে। জলও লোনা। সেই জন্য পানীয় জলের জন্য খাস পুকুর করিতে হয়। নিকটে স্রোতযুক্ত খাল বা নদী থাকিলে চলেনা। সেক্ষেত্রে দুরে উঁচু বাঁধ দিয়া পানীয় জলের পুকুর করিতে হয়। সহরের মাইল দশ দক্ষিণ হইতে এই অবস্থা। তবে উত্তর ভাগে জল লোনা নয়, পুকুর হইতেই পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। সেখানেও পুকুরে জোয়ার ভাটা খেলে। কুয়া নাই। জল খুব নিকটে. ৩।৪ হাত নীচেই জল উঠে।

চাষ :—জেলার সর্বত্র ধান, নারিকেল, সুপারি, পান হয়। পাট গৃহস্থের প্রয়োজন মত। কিন্তু গৌরনদী ও উজিরপুর থানায় চালানের জন্য পাটের চাষ আছে, সেখানে ধান ও পাট সমান সমান জন্মায়।

জেলায় সর্বত্র খেসারির ডাল হয়। ইহা গরীবদের প্রধান খাদ্য। ভাদ্র আশ্বিনে কাদা থাকিতে ধান ক্ষেতে ছড়াইয়া ফাল্গুনে তোলা হয়। বাউফল থানায় কালাইরায় মুগের ডাল ও বরিশালের মুসুরডাল প্রসিদ্ধ। পটুয়াখালিতে ধান ও নারিকেল প্রধান. পিরোজপুরেও নারিকেল প্রচুর, ভোলায় পান বেশী, জেলায় অবশ্য সর্বত্রই হয়। সুপারিরও বড় ব্যবসা আছে। তিল ও সরিষা সদর ও উত্তর পিরোজপুরে প্রয়োজন মত চাষ হয়, বিক্রীর জন্য নয়। মাখিবার জন্য তিল, খাওয়ায় সরিষা প্রধান। অল্প তিলের তেল খাওয়াও হয়। খেজুর গুড় সর্বত্র হয়, কিন্তু উত্তরাঞ্চলে ব্যবসায়ের জন্য বেশী, অর্থাৎ মাদারীপুরের সংলগ্ন অংশে। আখের চাষও আছে, গুড় হয়। হিজলা, মেহেদিগঞ্জে সুপারি ও মরিচ প্রধান।

দুধ ও মাছ : - গৌরনদী থানায় গাই দুধের বড় ব্যবসায় আছে, সেখানে রসগোল্লা, ভাল ঘি, সন্দেশ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভোলা অঞ্চলে প্রচুর মহিষ দুধ। কিন্তু খাবার তৈয়ারি হয় না। মুসলমান চাষীরা মহিষ পালে। গৌরনদীতে হিন্দু গোয়ালাদের হাতে ব্যবসায়। মাছ সর্বত্র। গরীবে ধরিয়া খায়, ধনী কেনে অথবা সখ করিয়া ধরে। সমুদ্রের ধারে ভোলা এবং পটুয়াখালি মহকুমায় শুঁটকি চিংড়ি করে, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির মহাজনে কিনিয়া লইয়া যায়। শুঁটকির কাজ স্থানীয় জেলেরা করে, কিন্তু জেলায় ইহার ব্যবহার নাই। বাঁশ বা সুপারি গাছ ফাড়িয়া তৈয়ারী চোঙ্গায় বাইন প্রভৃতি মাছ ধরার এক রীতি বরিশাল ও ফরিদপুরে প্রচলিত আছে। বরিশালের পার্শ্ববর্তী অংশ অর্থাৎ যতদূর হইতে মোটর বা ষ্টীমারে মাছ আনা সম্ভব সেখান হইতে মাছ আনিয়া কিছুকাল যাবৎ কলিকাতা চালান দেওয়া হইতেছে, ফলে সেই সেই অঞ্চলে মাছের দর তিন চার গুণ হইয়াছে। দুটি বরফ কল বসিয়াছে। গৌরনদী ও উজিরপুর থানায় বিলে মাছ এখনও আগের মত সস্তা, কেননা চালান দেওয়া শক্ত। কাঠুয়া ও কাছিমের মাংস উত্তরাংশে খুব প্রিয়। গৈলা অঞ্চলে কাঠা, কাছিম ও দুর ইত্যাদি প্রিয়।

জ্বালানি :—১৯২৪।২৫ এও সুন্দরবন হইতে যথেষ্ট কাঠ আসিত। সহরে কয়লা বেশী, কাঠ কম। জ্বালানি হিসাবে গোবর বেশী ব্যবহৃত হয়, শহরের জন্য কম।

ঘর দোরের জন্য—বাঁশ, গোলপাতা স্থানীয়। কাঠ, টিন, বাহিরের। হোগল দিয়া হোগলা করে। (মাদুরের মত)। তাহাতে মুড়িয়া পান, শুঁটকি মাছ প্রভৃতি চালান যায়। 'টিকনি' মোটা শীতল পাটির নাম, গাছটা জলায় হয়, তাহার নাম পাইত্যা বা নোত্রা। সতরঞ্চির বদলে খুব ব্যবহৃত হয়। শীতল পাটিও হয়, নমঃশুদ্রেরা বোনে। মাটির ঘর এদিকে নাই। ঘরের সিলিংকে কার্ বলে, উঘর (উজিরপুর থানা) স্বতন্ত্র একটি জিনিষকে বলে।

শিল্প :—সদরে কুমোর আছে, (বিশেষ মাটির দরকার হয়, সচরাচর মাটি খারাপ) ভোলা ও পটুয়াখালি মহকুমায় নাই, সেখানে হাঁড়ি কুড়ি চালান যায়। আগলপাশায় চন্দন ও দোয়ারি নামে দুইজন কারিগর খুব ভাল প্রতিমার কাজ করে, কৃষ্ণনগরের মত। উজিরপুরে-র হিন্দু কামারের কাজ

বিখ্যাত। রামদা, কাঁচি, সাড়া (জাঁতি) বঁটি এমন কি ভাল নিব পর্য্যন্ত গড়িতে পারিত। মোটা কাজ বিভিন্ন বন্দরে কোটালিপাড়ার কামারেরা করিয়া থাকে, কোটালিপাড়া ফরিদপুর জেলায়। যুগী ও তাঁতী সর্ব্বত্র আছে মুসলমান জোলা কম। মিলের সুতায় গামছা, ধুতি বোনে। মাধবপাশার "চারখানা" বা মশারির কাপড় ভাল। ঝালকাঠি ও বরিশালে তালপাতার পাখা তৈয়ারি হয়।

বন্দর ঃ—কলিকাতার সঙ্গে ঝালকাঠি, নলচিঠি স্বরূপকাঠির যোগ বেশী।

(ক) ঝালকাঠি ঃ—স্টেশনারি, মোজা, গেঞ্জি, কাপড়, লটকন, ঘর তৈয়ারির মাল, এখানে প্রধান।

(খ) নলচিঠি ঃ—পান ও সুপারির ব্যবসায় প্রধান। সুপারির প্রধান ব্যবসাদার চীনা।

(গ) স্বরূপকাঠি :—নারিকেলের 'শলা' (ঝাটার কাঠি) মাড়োয়ারি ব্যবসাদার চা বাগানে রেল কোম্পানীর নিকট এবং কলিকাতার বাজারে পাঠায়।

(ঘ) কাউখালি :—এখান হইতে নারিকেলের খুব চালান হয়।

(ঙ) বগা ঃ—বন্দরে চাউলের খুব বড় ব্যবসায় আছে।

সহর —সদর ছাড়া, খেপুপাড়ায় গবর্ণমেন্ট একটি গোছান শহর বসাইতেছেন।

বিলাতী শিল্প ঃ—ঝালকাঠিতে একটি চীনামাটির কারখানা হইয়াছে। একটি কাঠ চেরাই কল আছে এবং দেশালাই এর কারখানা আছে।

ধান কল জেলায় সর্ব্বত্র আছে তবে এক জায়গায় বেশী নয়। কেবল গলাচিপা ও খেপুপাড়ায় কো-অপারেটিভের বড় ধানের কল আছে। নলচিঠিতে চালানি সরিষা লইয়া একটি তেলের কল চলে। ভোলায় গান্ধী আরউইন চুক্তির পর নূন হয়। বরফের দুটি কল বরিশালে মাছের ব্যবসায়ের জন্য হইয়াছে।

মানুষ ঃ—সদর ও উত্তর পিরোজপুরে হিন্দু মধ্যবিত্তদের প্রাধান্য দেখা যায়। লোক সংখ্যা হিন্দু মুসলমান সমাম সমান হইবে। অন্যত্র মুসলমান ১৫ আনা হইতে পারে, জমিদার, তালুকদারের মধ্যে এদিকে হিন্দুই সংখ্যায় বেশী। মহাজনী কাজে ঢাকা-ফরিদপুরের সাহা-রা জেলার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া

আছেন। স্থানীয় মধ্যবিত্ত বা পূর্ব্বতন ভূম্যধিকারীগণ চাকরি, লগ্নী, ওকালতী প্রভৃতি কারবার করেন উত্তরাংশে সায়েস্তাবাদ ও অন্য দুই জায়গায় বড় মুসলমান জমিদার আছেন। অন্যত্র মুসলমানদের মধ্যে চাষী বা নৌকার মাঝি বেশী। হিন্দু মাঝি বাহির হইতে নৌকা লইয়া আসে, জেলায় নাই বলিলেই চলে।

পুরাতন কীর্তির মধ্যে কীর্তিপাশায় একটি পুরানো মন্দির আছে। পুরানো মসজিদ নাই।

মাহিলাড়া, বাটাজোড়, গৈলা, কীর্ত্তিপাশা, গাভা, কলসকাঠি, বানারিপাড়া, প্রভৃতি মধ্যবিত্তদের। বৈদ্যপ্রধান, কায়স্থপ্রধান, ব্রাহ্মণপ্রধান। বড় গ্রাম। মাধব পাশা (চন্দ্রদ্বীপের মধ্যে) দ্বাদশ ভূঁইয়ার রাজধানী ছিল। চীনা ব্যবসাদার নলচিঠিতে আছে। মাড়োয়ারি কিছু কিছু সব্বত্র। আমতলী থানায় অর্থাৎ দক্ষিণ পটুয়াখালিতে কয়েক সহস্র মগ আছে। তাহাদের ঘর টোঙের উপর করিতে হয়। (পাইল ডোয়েলিং)

অন্যান্য:—দক্ষিণে মগেরা ২৫।৩০ হাত হইতে ৪০।৫০ হাত পর্যন্ত সমুদ্রে পাড়ি দিবার জন্য কোশা। (একগাছিয়া বা ডাগ-আউট) ব্যবহার করে। ইহা বাহিরের চালানি কাঠে (কেওয়া কাঠ) তৈয়ারি হয়। মুসলমানেরা ভোলা অঞ্চলে ছুতার ও তাঁতির কাজ প্রভৃতি নূতন নূতন বৃত্তি ধরিতেছে। এবিষয়ে তাহারা আগেকার জাতীয় বৃত্তির গণ্ডী ভাঙ্গিয়া আগাইয়া চলিয়াছে।

মেলা:—পোনাবালিয়াতে শিবরাত্রির সময়ে শিব বাড়ীতে খুব বড় মেলা হয়। ঐদিনে উজিরপুর থানায় শিকারপুর গ্রামেও (তারাবাড়ীতে) মেলা হয়। সূর্যমণির মেলায় গ্রাম্য শিল্পের খুব বড় আমদানী ও কেনাবেচা হইয়া থাকে। সূর্যমণির মেলা চৈত্রসংক্রান্তি ও নববর্ষের দিন। ইহা বানারি-পাড়ার সন্নিকটে কিছুদূর উত্তরে বসে। কালিগুড়ির মেলায় (বাউফল থানায়) ১০,০০০ এর উপর নানাবিধ নৌকা বিক্রয় হয়। খুলনা ও যশোহর প্রভৃতি নানান জেলায় খরিদ্দার আসে। ঢাকার ছুতারের কাজই বেশী। তাহারা জলায় জলায় ২০০ নৌকাও একসঙ্গে বাঁধিয়া আনে।

নোট:—(১) বরিশালের নাজিরপুরে নির্মিত ধান রাখিবার বড় জালার (মটকি) সর্ব্বত্র আদর আছে। ফরিদপুরে চালান যায়। তবে হাঁড়ি, পাতিল

ফরিদপুরেই ভাল।

(২) বরিশাল জেলার দক্ষিণে ও ভোলা মহকুমায় নোয়াখালির মজুর আসিয়া ধান কাটিয়া দিয়া যায়, স্থানীয় লোকে কাটে না। ধান কাটার মজুরি দশ ভাগের এক অংশ পাইয়া থাকে।

(৩) নাগাশি জাতি হিন্দুর পূজা ও অন্যান্য উৎসবে বাজনা বাজায়। ইহারা ধর্মে মুসলমান হইলেও অপর মুসলমান ইহাদের ছোঁয়া খায় না, একত্র নামাজ পড়ে না, নীচু বলিয়া ভাবে। নাগাসিরাও অপর মুসলমানদের সঙ্গে সমান হইবার চেষ্টা করে না, কেননা তাহাদের যজমান হিন্দু। জোলারা মুসলমান হইলেও অপর মুসলমানদের সঙ্গে মর্যাদায় ঠিক সমান নয়, তবে নাগাসিদের মত নীচুও নয়। হিন্দু জেলেরা মাছ ধরে, কিন্তু মুসলমান নিকারিগণ (নাইয়া) নৌকা বায় বলিয়া খুচরা বিক্রয় করে, তাহারা মাছ ধরেনা। কলু বরিশাল জেলায় হিন্দু। কিন্তু মুসলমান অল্প অল্প একাজ করিতেছে। ঘানির এক বলদ চোখে ঠুলি, ফুটা আছে। কলুর জল চলেনা।

ধোপা নাপিতকে অনেকে বৃত্তি (জমি) দিয়া পালিতেন, এ ব্যবস্থা এখনও টিকিয়া আছে, যথা গাভা নির্মল ঘোষের বাড়ীতে। মুসলমান বা অন্য চাষীরা ধান দিয়া (বাৎসরিক) মজুরি দেয়। খেয়াঘাটের মাঝিকে কোন কোন পরিবার বাৎসরিক ধান দিয়া থাকেন। পিরোজ পুরের দক্ষিণাংশে মুসলমান নিকারিগণ অনায়াসে প্রচুর মাছ ধরে, চাষীরা প্রয়োজনমত মাছ লইয়া যায় পয়সা দেয় না। ধানের সময় নিকারিরা প্রয়োজনমত ধান লইয়া যায়, চাষীর বাড়ী হইতে তেমনই নারিকেলও লয়। প্রাচুর্যের জন্যেই বোধ হয় সূক্ষ্ম হিসাব অথবা পয়সা কড়ির ব্যাপারে যায় না।

সারা জেলায় জমিদারগণ কোনো কোনো জায়গায় জগন্নাথের আখড়ী স্থাপনা করিয়াছেন, তাহার বৃত্তি-ভোগী সেবায়েৎ উড়িয়া। শহরে, পটুয়াখালি প্রভৃতি স্থানেও পাচক ব্রাহ্মণ উড়িয়া, বরিশালবাসী আজ কাল কিছু হইতেছে।

(৪) ধানকল হওয়ার ফলে বহু স্ত্রীলোকের ধান ভানার কাজ গিয়াছে। পাচ মন ভানাই এর মজুরি ১ টাকা চাল ২॥/ হয়, খুদ ভানুনী পায়। ধান সিঝাইবার জন্য তুষ জ্বালায়। শীতকালে গরীব লোকে মাটির মালসায় তুষের

আগুন হাতে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। বিশেষতঃ স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধেরা এইরূপ করিয়া থাকে।

৫) সুপারি পাতা যেখানে লাগিয়া থাকে, পাতার সেই অংশে পাৎলা চামড়ার পর্দার মত তোলা যায় তাহাকে ফাঁপরা বলে। ছেলেরা মালসার মুখে ইহা বাঁধিয়া ঢাকের মত বাজায়। ব্রহ্মদেশের ব্যবসায়ী জোলায় এই জিনিষ কিনিয়া—বৎসরে ৩০।৪০,০০০ টাকার মত চালানি দিত। ব্রহ্মে চুরুটের পাতা মুড়িবার জন্য ব্যবহৃত হইত।]

সুপারি গাছের বালতো বেডপ্যান হিসাবে গ্রামে ব্যবহৃত হয়। মগাই শুপারি কাঁচা ভিজাইয়া কস বাহির করিয়া শুখায়। সেই জলে জাল দিলে খয়েরের মত কস বাহির হয়। টাটিসুপারী গাছপাকা, কষ বাহির করা হয় নাই, তাহা শুখাইয়া চালান দেওয়া হয়।

৬) ফরিদপুরে গোপালগঞ্জ মহকুমায় যাহাকে ধাপ বলে, বরিশালে তাহা চুপ (দাম))।

সংস্কৃতি মণ্ডল:—

ক) সাহাবাজপুর [ভোলা মহকুমা], উত্তর [সদরে হিজলা মেহেন্দিগঞ্জ থানায়]—নোয়াখালির সঙ্গে উচ্চারণে মিল আছে, মুসলমানের বিবাহ হয় ঐ দিকে।

খ) সদর উত্তর পিরোজপুর—বরিশালের বিশিষ্ট হইলেও ভদ্র সংস্করণ—মাদারিপুরের দক্ষিণাংশ [ইদিলপুর পরগণা বাদ] ও কোটালিপাড়া পরগণার সঙ্গে মিল আছে।

গ) পটুয়াখালি ও দক্ষিণ পিরোজপুর—বরিশালের খাটি ভাষা। প এর উচ্চারণ 'হ' ও 'ফ' এর মাঝামাঝি।

ক] হইসা ফাইত নয়—পয়সা পাইবেন না।

খ] পয়সা পাইবেন না। [করিয়া, হইয়া, যাইয়া]

গ) প (ফ,)য়সা পাবা না। ঘ) ভালবাসা=বাস কেমন কেমন বাস?—কেমন আছ?

টোরকি—পানের খুব বড় চালানি কারবার আছে। মিষ্টিও বিক্রয় হয়।

পাতার হাট—মেহেন্দিগঞ্জের সংলগ্ন স্থান। সুপারির বড় কেন্দ্র।

তারাবুলিয়া—বগার মত চাউল বিক্রীর কেন্দ্র।

ভোলাতে বৎসরের এক সময়ে মহিষের লড়াই হয়, ইহা চাষীদের খুব প্রিয় খেলা। যথেষ্ট দাম দিয়াও (২০০৲—৩০০৲) লড়াইএর মহিষ কেনে।

বড় খাল হইতে যে সকল সরু খাল গ্রামের ভিতর আসিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, এবং শেষে কোন ও পুকুর বা মাঠের মধ্যে শেষ হইয়াছে তাহাকে 'সোতা খাল' বলে।

বরিশালে ও ফরিদপুরের গোপালগঞ্জের জমি নীচু অথচ বসতি খব ঘন। জমি উঁচু করিবার মাটি পাওয়া যায়। তাই গৃহস্থেরা বাড়ীর পুকুরের সহিত নদী ও খালের যোগ করিয়া দেন। ফলে বর্ষার সময়ে পুকুরের নূতন পলি পড়ে। বর্ষা শেষ হইলে গৃহস্থেরা প্রতি বৎসর পুকুর কাটিয়া সেই মাটির সাহায্যে আশ পাশের জমি উঁচু করেন।]

ফরিদপুর

ফরিদপুর জেলায় ৪টি মহকুমা।

সদর মহকুমার থানা ফরিদপুর, চরভদ্রাসন ভূষণা, নগরকান্দা, ভাঙ্গা, সদরপুর।

গোয়ালন্দ মহকুমার থানা গোয়ালন্দ, কলিয়াকান্দি, পাংসা, গোয়ালন্দ ঘাট।

গোপালগঞ্জ মহকুমার থানা গোপালগঞ্জ, মকসুদপুর, কাশিয়ানি, কোটালিপাড়া।

মাদারিপুর মহকুমার থানা রাজৈর, কালকিনি, পালঙ্গ, গোসাইয়ের হাট, ভেদরগঞ্জ, নড়িয়া, জাঁজিরা, শিবচর, মাদারিপুর।

মাটি: রাজবাড়ী ও সদর মহকুমার উত্তরাংশে জমি দক্ষিণাংশের মত নয়। (পাট হয়, জমিতে জল ওঠে না বলিয়া পান এবং আখও বেশ হয়।) ভাঙ্গার নিকট হইতে দক্ষিণে জমি উর্বরা। পদ্মার চরে মাটি খুব ভাল। মাদারিপুর মহকুমায় দোআঁশ, ভাল পলিমাটি। গোপালগঞ্জ মহকুমা অপেক্ষাকৃত নীচু

বিল জমি আছে। এখানে বিলে ঘাস পচিয়া কাল কাল রঙের চাপড়া বাঁধিয়া যায়, তাকে ধাপ বলে (ইদিলপুরে দাম)। মোচনা গ্রামে মনোরঞ্জন বাবুর বাড়ীতে ১২৫ ফুট গভীর নলকুপে প্রথমে মাটি, তারপর প্রায় ৭০ ফুট পর্যন্ত মাটি ও ধাপ, এবং ৮০ ফুটের পর শুধু মিহিবালি বাহির হয়। (আজকাল বিলে খুব কচুরিপানা হইয়াছে) পালঙ ডিস্পেন্সারির নলকূপ খুঁড়িবার সময় খুব গরম কাদা, (দুর্গন্ধযুক্ত। ২৫।৩০ হাত উপরে ছুটিয়া ওঠে। এক বছরের উপর এই প্রবাহ বজায় থাকে, কিন্তু ফোয়ারার উচ্চতা ক্রমশঃ কমিয়া আসে। আজকালও পরিষ্কার, কিন্তু দুর্গন্ধ জল বাহির হয়। এই জল পান করা চলে না। নিকটে এক খালে পড়ে। জলের সোতায় মরিচার মত লাল দাগ পড়িয়াছে।

চাষ :—রাজবাড়ী ও সদরে ধান ভাল নয়, পাটও খুব ভাল নয়, কিন্তু দুয়েরই চাষ আছে। মাদারিপুরে পাট বেশী ধান কম, গোপালগঞ্জের ধান বেশী পাট কম। আমন ধানই বেশী। আউশও হয়, শ্রাবনে ১৪ হাত পর্যন্ত গাছ হয়, হাঁড়ি-কলসীর উপর বসিয়া ডগা কাটিতে হয়। চার পাট ও অন্যান্য শস্য খুব ভাল জন্মে। ব্যবসায়ের জন্য ভাল জমিতে তিল, তিসি, সরিষা, কুসুম ফুল, শন এবং রবিশস্যের মধ্যে, যেখানে সম্ভব কলাই, খেঁসারি মসুরির চাষ হয়। মুসুর ডালের খুব প্রচলন আছে। সুপারি, নারিকেল বরিশালের মত নয়, তবে ভালই। উত্তরে পান, আম এবং গোয়ালন্দের চরে খুব বড় বড় তরমুজ জন্মে। বরিশালের গৌরনদী থানার সংলগ্ন অংশে আখের চাষ হয় ও গৌরনদী অঞ্চলে চালান যায়। খেজুর গাছ সর্বত্র, মাদারিপুরের মুচি গুড় বিখ্যাত। রাজবাড়ী অঞ্চলের হাজারি গুড় আসলে ঢাকার দিক হইতে আসে। গোপালগঞ্জের কাছে সম্প্রতি বাঁধাকপির চাষ হইতেছে।

মাছ :-চালানি কারবার গোপালগঞ্জের নিকট হইতে কুমার নদী পর্যন্ত বিল রুট ১৯০৭ সালে কাটা হয়, খুলনা হইতে ষ্টীমার ঐ পথে মাদারিপুর যায়। আবার বিলের মাছ ঐ পথে কলিকাতায় খুব চালান যায়। বরফ কলিকাতা হইতে ষ্টীমারে আনা হয়। কই, মাগুর, প্রভৃতি মাছ সরাসরি নৌকা মারফৎ কলিকাতায় চালান যায়। আগের চেয়ে মাছের চালান কিছু কমিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বর্ষার সস্তা ইলিশ নুন দিয়াও চালান যায়। পাটগাতি ষ্টীমার ষ্টেশনে (বরিশাল খুলনা হইতে প্রচুর মাছ কলিকাতা অঞ্চলে চালান যায়। পিনজুরি পাটগাতির মধ্যে ভাদ্র থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত বর্ধমানের মুসলমানেরা

পুঁটি শোল প্রভৃতি শুঁটকি করিয়া কলিকাতায় চালান দেয়। কাছিমের মাংস গোপালপুর অঞ্চলে (কোটালিপাড়া) ইত্যাদি স্থানে খুব প্রিয়। চোঙায় করিয়া বাইন প্রভৃতি মাছ ধরে।

দুধ :—মাদারিপুর হইতে উত্তরপূর্ব দিকে নড়িয়া পর্যন্ত ষ্টীমার পথের আশপাশে গাই দুধ খুব সস্তা ও ভাল। প্রচুর পরিমাণে ক্ষীর (চিকন্দির ক্ষীর বিখ্যাত), সন্দেশ ও রসগোল্লা বিক্রয় হয়। রাজবাড়ী অঞ্চলের দুধও খুব গাঢ়। চরের ঘাস খাইলে গরুর দুধ ভাল হয়। নড়িয়া অঞ্চলে খোয়াক্ষীর ভাল। সিন্দিয়াঘাটের নিকট এবং মহারাজপুরেও দুধ, দই প্রচুর এবং সস্তায় পাওয়া যায়। ইদিলপুর পরগণায় ডাম্‌ড়িয়া বাজারে রসগোল্লার সের মাত্র চার আনা, দুধও প্রচুর ও সস্তা।

ঘরদুয়ার :--ছনের ছাউনি, হোগলা দিয়া নির্মিত হোগলার বেড়া। অবস্থাপন্ন লোকে টিনের চাল ও মুলিবাঁশের বেড়া দেয়। ব্যবসাদার মাত্রের ঘরে টিনের চাল উপরন্তু তাহারা টিনের বা কাঠের বেড়া দেয়। মাটির ঘর এদেশে নাই। গোপালগঞ্জের বিল অঞ্চলে মাচার উপর ঘর করে, শুকনা ডাঙ্গায়ও লোকে ঐরূপ ঘর করিয়া থাকে (পাইল ডুয়েলিং)। ঘরের মধ্যে পুরু বা আংশিক কার (টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়) লাগান থাকে। তাহাতে জিনিষপত্র রাখা হয়, মেঝের উপর মই থাকে।

জ্বালানি :—জেলার উত্তরে কিছু কয়লার ব্যবহার আছে, কাঠও চালান আসে। তবে ইদিলপুর, কোটালিপাড়া প্রভৃতি স্থানে কাঠের চলন অনেক বেশী।

শিল্প : কুমার :—যে সব গ্রামে শুধু কুমার থাকে, তাহারা সারা বৎসর কাজ করিয়া বর্ষায় পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলায় হাঁড়ি পাতিল বিক্রয় করিয়া আসে। বরিশালের তুলনায় এখানকার মাটির জিনিষ মজবুত ও ভাল, তাই সর্ব্বত্র আদর আছে। কোটালিপাড়ায় ভাল প্রতিমার কুমার আছে।

কামার :—যেখানে আছে তাহারা বাহিরের (যথা বরিশালের উজিরপুরের) তুলনায় খারাপ কারিগর হইলেও টিঁকিয়া আছে। কারণ, তাহাদিগকে কিস্তিবন্দীতে জিনিষের দাম দেওয়া চলে, বাহিরের কারিগরকে নগদ মিটাইয়া দিতে হয়।

কাঁসারি :—পালঙের কাঁসার কাজ বিখ্যাত।

শাঁখারি :—কিছু কিছু শাঁখারিও ঐ অঞ্চলে আছে।

সুতার কাজ :—দিগনগরের নিকট ভ্যাওরার হাটে খুব বিক্রয় হয়। মাদারিপুর অঞ্চলে কোন কোন ভদ্রলোক ২০০।৩০০ তাঁত বসাইয়া ঐ হাটে মাল বেচেন। মনোহরার বাজারে জনৈক ভদ্রলোক আসামী মুগা কাটার নূতন চরকা করিয়া, সেই সুতা বুনিয়া সংসার চালাইতেছেন।

বিড়ি :—উত্তরে সর্ব্বত্র। রঙপুরের তামাক, কলিকাতা হইতে বিড়ির পাতা চালান আসে।

বিলাতী শিল্প :—গোয়ালন্দের জন্য রাজবাড়ীতে একটি বরফ কল আছে। ঐ জেলায় ধানের কল খুব কম। বরিশালের মত নয়।

বন্দর :—চর মুগুরিয়া, মাদারিপুরের সংলগ্ন,—সব রকম তৈয়ারি মাল বা "রাখি মাল" পাওয়া যায়। যথা—ধান, চাল, কাঠ, কয়লা, তেল, টিন ইত্যাদি। ধানের আমদানি বরিশাল হইতে হয়।

পালঙ :—কাঁসার কাজ বেশী।

মাদারিপুর :—এখানকার পাট কেনা-বেচা, প্রধানতঃ মাড়োয়ারিদের হাতে। আর, এন, শাহার ফার্ম্মও আছে।

সিন্দিয়াঘাট :—খাবার, মাছ, আসামের কাঠের খুব বড় কারবার আছে।

গোপালগঞ্জ :—ধান আমদানি।

ভ্যাওরার হাটে :—সপ্তাহে দুইবার ৩০।৪০ টাকার শাড়ী, লুঙ্গি ও অন্যান্য সুতি মাল বিক্রয় হয়। এগুলি এখানে তৈয়ারি, খরিদদার কলিকাতা হইতেও আসে।

পালঙ, ইদিলপুর ইত্যাদির সহিত চাঁদপুরের যোগ। গোয়ালন্দ পথে কলিকাতায় মাল চালান যায়। মাদারিপুর হইতে পশ্চিমে গোপালগঞ্জ হইতে খুলনা হইয়া কলিকাতার যোগ। উত্তরে রেলপথে কলিকাতা যাওয়া আসা।

যানবাহন :—নৌকার খুব চলন। রেল আছে। বাঁক খুব চলে। গো গাড়ী খুব কম। মাটির চারিতে (বড় গামলা) বর্ষায় এবাড়ী ওবাড়ী যায় আসে।

মেলা —দশমী একাদশীতে মাদারিপুরের বড় মেলা হয়। সারা বছরের মশলা, হাঁড়ি পাতিল মানুষে কেনে। চৈত্র সংক্রান্তিতে ও বৈশাখের মেলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়।

মানুষ :—রাজবাড়ী এবং গোপালগঞ্জ অঞ্চলে হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী। গোপালগঞ্জের চাঁদার বিল ইত্যাদি উদ্ধার করিয়া চাষ করা বা মাছ ধরার কাজ প্রধানতঃ জিয়ানি (=জেলে) ও নমঃশূদ্রদের। চাষী মুসলমানের সংখ্যাও এদিকে যথেষ্ট। মাদারিপুর, পালঙ প্রভৃতি অঞ্চলে বিশেষতঃ চরে মুসলমান বেশী।

পূর্বে ধনী ছিলেন, এমন হিন্দুর বর্তমান বংশধরেরা চাকুরির দিকে বেশী গিয়াছেন। ঐরূপ মুসলমানগণের মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারাস টাইপের লোক আছেন, যাঁহারা গুণ্ডাদের সাহায্যে লুটতরাজের বা স্বীয় প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

ইতিহাস :—নড়িয়ার নিকটেই বিখ্যাত ২১ মঠ ছিল, পদ্মাগর্ভে লুপ্ত হইয়াছে। পালঙের মধ্যে কুড়াশি গ্রামে শিবমন্দির আছে। ধানুকায় (পালঙ) পুরাতন মঠ, ছোট ইটের তিনতলা বাড়ী (উপরে একতলা মাটির নীচে দুইতলা) পাওয়া যায়। ভূষণায় সীতারামের রাজধানী ছিল। মুসলমানদের খুব পুরান বা নাম করা মসজিদ চোখে পড়ে না।

নোট :—(১) কোটালিপাড়া থানায় বহু জোলার বাস। তাহাদের তৈয়ারি প্রচুর শাড়ী, গামছা, মশারি, কিছু ধুতি ঘাঘর এবং পারকোনা হাটে বিক্রয় হয়। পারকোনায় স্থানীয় ক্রেতা, ঘাঘরে বাহিরের ক্রেতাও আসেন।

(২) কুমার—ইদিলপুর পরগণায় কাইলাড়া গ্রামে বহু কুমারের বাস। তাহারা মটকি গড়িয়া অন্যত্র বরিশাল, ঢাকায় চালান দেয়। মটকি আখের গুড়ের জালাকে বলে।

(৩) মাছধরা—বাঁশের চোঙা শীতের সময়ে পুকুরে বা খালে ডুবাইয়া রাখিলে তাহার মধ্যে বাইন প্রভৃতি মাছ আশ্রয় লয়। হঠাৎ তাহার এক পাশ বন্ধ করিয়া খাড়া তুলিয়া ধরিলে মাছ পালাইতে পারে না।

গোপালগঞ্জের উলপুর অঞ্চলে বাঁশের গর্ত দিয়া কৈমাছ ধরিতে শ্রীনির্মল

ঘোষ দেখিয়াছেন। কি গাঁথে মনে নাই। একটি লম্বা দড়ির সহিত সংলগ্ন সূতায় অনেকগুলি গর্জ পর পর ঝুলাইয়া রাখে, মাছ মরিয়া যায়, হাঁ করিয়া থাকে।

ইদিলপুর পরগণা :—বর্ষার শেষে অঘ্রাণ, পৌষ মাসে খালে যখন স্রোত থাকে না, তখন খালের মধ্যে দুইটা বাঁধ দিয়া মাঝের জল ছেঁচিয়া ফেলা হয়, তাহাতে এক রাত্রের মধ্যে আগে ৭-১০ মণ মাছ পড়িত (কৈ, মাগুর, সিঙ্গি, শোল, খলসে প্রভৃতি)। ইহাকে "গোদা" দেওয়া বলে। তাহার কিছু আগে পূজার সময়ে অর্থাৎ আশ্বিন কার্তিকে বিল হইতে যখন নদীতে জল নামিতে আরম্ভ করে, তখন বিল হইতে রুই, কাতলার পোনা খালের মুখে ধর্মজাল বা ঝাঁকিজাল দিয়া অসম্ভব ধরা হয়। আজকাল কচুরি পানার ফলে খাল বিল নষ্ট হইয়া যাইতেছে, মাছও কমিয়া গিয়াছে।

নোট :–(৪) ইদিলপুরের কাছে, ধুরি নামে এক রকম নৌকা ব্যবহৃত হয়, আজকাল স্থানীয় মিস্ত্রীরা নৌকা তৈয়ারি করে বলিয়া নৌকা সস্তা হইয়াছে ও ধুরির চলন কমিয়া গিয়াছে। ধুরি কাঠের খণ্ড জোড়া দিয়া তৈয়ারি, খড়ের গোছা ও বেতের বাঁধন দিয়া কাঠগুলি জোড়া হয়, লোহা ব্যবহৃত হয় না। গৃহস্থ ধুরি বর্ষার শেষে খুলিয়া তুলিয়া রাখে। লোহার পেরেক দিয়া জোড়া থাকিলে খোলা বা প্রতি বৎসর পুনরায় বাঁধা কঠিন হইত।

(৫) ঘরে একখানি কাঠের পাটা আলনার মত টাঙ্গান থাকে, তাহার উপর বালিশ প্রভৃতি নানা জিনিষ রাখে, ইহাকে গোপালগঞ্জ অঞ্চলে "যোত" বলে। দেওয়ালে কাঠের গোঁজ থাকে তাহা হইতে পাটের দড়ি দিয়া কোমর বন্ধের মত চওড়া বোনা জিনিষে যোত ঝোলান থাকে।

(৬) মাদারিপুর প্রভৃতি স্থানে কার্তিক, মাঘ, ফাল্গুন পর্যন্ত বেড়া তৈয়ারির কারবার চলে। বর্ষাকালে আসাম হইতে এই জেলার হিন্দু ব্যবসায়ীরা বাঁশ ভাসাইয়া লইয়া আসে, সেই বাঁশ উপরোক্ত কয় মাস ধরিয়া চরের উপর ফাড়িয়া বোনা হয়। গৃহস্থের যত হাত লম্বা, যত চওড়া চালি চাই তাহার জন্য ফরমাস দিয়া আসে, কারিগর তাহার ঘরে পৌছাইয়া দেয়। ঐ কয়মাস ঘর দুয়ার তৈয়ারির সময়।

[জল—ইদিলপুর থেকে নদী যখন ৩।৪ মাইল দূরে ছিল, তখন পুকুরে বার মাস জল থাকিত। কিন্তু এখন আধ মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে পুকুরের জল নদীর জলের সঙ্গে নামিয়া যায়।]

পালং অঞ্চলে ষাঁড়ের লড়াই হয়। যাহার ষাঁড় জেতে সেই মাতব্বরের সম্মান বৃদ্ধি পায়। অনেক দাম দিয়াও লোক লড়াইএর জন্য ভাল ষাঁড় কেনে।
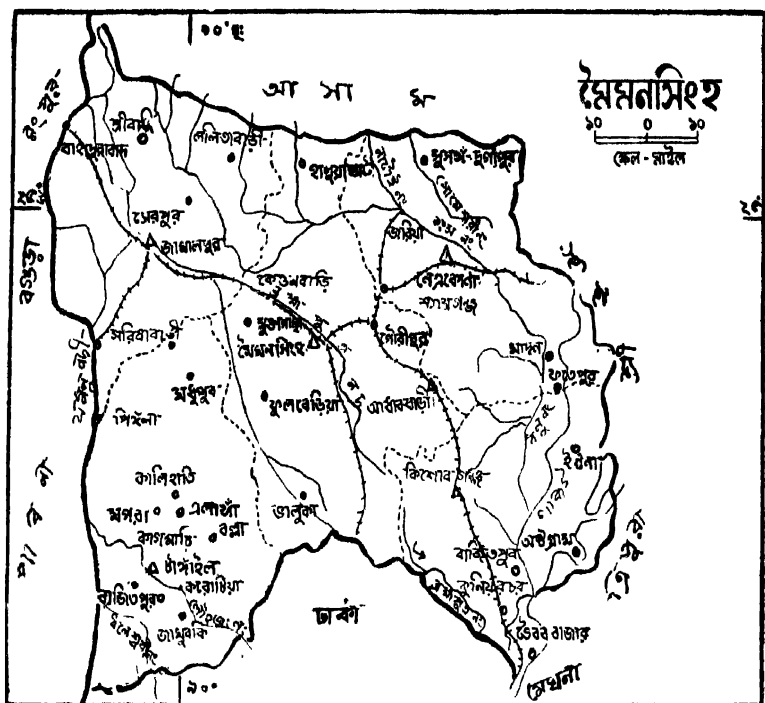
মৈমনসিংহ জেলায় ৫টি মহকুমা।

সদর মহকুমার থানা ফুলপুর, হালুয়াঘাট, নান্দাইল, ঈশ্বরগঞ্জ (গৌরীপুর), কোতোয়ালি, ত্রিশাল, মুক্তাগাছা, ফুলবেড়িয়া, গাফরগাঁও, ভালুকা।

জামালপুর মহকুমার থানা শ্রীবর্দ্দী, শেরপুর, নালিতাবাড়ী, নোকলা, মাদারগঞ্জ, সরিষাবাড়ী, দেওয়ালগঞ্জ, ইসলামপুর, মেলনদহ, জামালপুর।

টাঙ্গাইল মহকুমার থানা—গোপালপুর, মধুপুর, কালিহাতি, টাঙ্গাইল, মির্জাপুর, বসাইল, নগরপুর, ঘাটাইল।

কিশোরগঞ্জ মহকুমার থানা—তাড়াইল, করিমগঞ্জ, হোসেনপুর, ইটনা, কাটিয়াদি, পাকুন্দিয়া, বাজিতপুর, অষ্টগ্রাম, নিকলি, কিশোরগঞ্জ, ভৈরব-বাজার, কুলিয়ারচর।

নেত্রকোনা মহকুমার থানা—দুর্গাপুর, কলমাকান্দা, পূর্বধলা, নেত্রকোণা, বারহাট্টা, আঠপাড়া, মোহনগঞ্জ, মদন, কেন্দুয়া, খালিয়াজুড়ি।

মৈমনসিংহ

মাটি :—টাঙ্গাইল মহকুমা অধিকাংশ পলি, দোআঁশ, পূবের দিকে এঁটেল মাটি পলি এবং মধুপুর অঞ্চলের লাল মাটির মধ্যভাগে বর্তমান। পূর্বভাগে ভালুকা থানায় মধুপুরের মত লালমাটি।

সদর মহকুমায় পশ্চিমাংশে মধুপুরের মত লাল। হালুয়াঘাট থানার গারো পাহাড়ের নীচে পাহাড়িয়া মাটি, অবশিষ্ট এঁটেল ও নদীর নিকট বালিমিশ্রিত পলি। জামালপুর মহকুমায় নালিতাবাড়ি, শ্রীবর্দ্দী, শেরপুরের উত্তরাংশ পাহাড়ের ধারে শক্ত মাটি, যথেষ্ট উর্বরা। নদীর কাছে বালুমিশ্রিত মাটি, অবশিষ্ট বালুমিশ্রিত এঁটেল। সরিষা বাড়ি, মাদারগঞ্জ ও জামালপুর থানায় কিছু অংশে যমুনায় বহু চর আছে। কিশোরগঞ্জে ভাল পলি মাটি, কিন্তু বন্যায় সব ডুবিয়া যায় না।

নেত্রকোনা মহকুমায় উত্তরে সুসঙ্গ—দুর্গাপুরে পাহাড়িয়া মাটি। আটপাড়া, মদন, ফতেপুর, ইটনা প্রভৃতি থানায়—ভাল এঁটেল মাটি।

[টাঙ্গাইল এলাসীন গ্রামে গভীর নলকূপ (২৫০০৲ খরচ) আছে; তাহার এবং সাধারণ ইঁদারার জলে কাপড় ৩।৪ দিনেই লাল হইয়া যায়। লোহার গন্ধ, সময়ে সময়ে খারাপ গন্ধও পাওয়া যায়। বড় নলকূপটিতে নীচের দিকে লাল রং ধরা বালি বাহির হইয়াছিল।]

নদ, নদী, বিল :—ব্রহ্মপুত্র, ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পের পর প্রধানতঃ যমুনা দিয়া বহিতেছে, ফলে মৈমনসিংহ জেলায় ইহার প্রসার ও প্রভাব কমিয়া গিয়াছে। ধনু প্রভৃতি নদীতে বৈশাখের শেষ হইতে জল নামিয়া খালাপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলকে বিলে পরিণত করিয়া দেয়। জল কার্তিক পর্যন্ত থাকে, বর্ষায় জায়গায় জায়গায় এমন স্রোত বহে যে পার হওয়া দুষ্কর। (হাওড় — সাগর ?) আটপাড়া, মোহনগঞ্জ, খালিয়াজুড়ি থানা হাওড় প্রধান

[মগরা = adj. meandering, unruly, যথা মগরা ঘোড়া, ছেলে। হাওড় – পূর্বে নদীর গর্ভ ছিল, নদী দুইদিক বন্ধ হওয়ায় যে অবস্থা হয় তাহাকে হাওড় বলে। বর্ষায় আবার স্রোতে বহিতে থাকে।]

কুয়া, পুকুর, নলকূপ :—নেত্রকোনায় অনেক বড় বড় দীঘি আছে, সুসঙ্গ অঞ্চলেও তাই। সারা জেলায় পুকুরের চলন থাকিলেও অনেকগুলি যত্নের অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কিন্তু নেত্রকোনার যে অঞ্চলে হাওড় বেশী, সেখানে পুকুর কাটা বা রক্ষা করা অসম্ভব, তাই জল নামিয়া গেলে খালিয়াজুড়ি থানায় দূর হইতে পানীয় জল আনাইতে হয়।

সারা জেলায় কিছু কিছু কুয়া আছে, কিশোরগঞ্জ অঞ্চলেই বেশী বেশী বলিয়া মনে হয়। নলকূপ সর্ব্বত্র হইতেছে, ১০০।১২৫ ফুট গভীর—তাহার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জেলায় রোগ কিছু কমিয়াছে। টাঙ্গাইলে ইঁদারার বেশ চলন আছে।

চাষ : জেলায় সর্বত্র ধরিলে ধান ও পাট প্রায় সমান সমান হয়। কিন্তু হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ী, সুসঙ্গ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা অঞ্চলে ধানই প্রধান। হাওড় অঞ্চলে ধানই প্রধান হইলেও নেত্রকোনা মহকুমায় বোধ হয় মোটের উপর পাট বেশী। নেত্রকোনার ফতেপুরে এবং মোহনগঞ্জ থানাতে পাটই বেশী। সদর মহকুমায় সচরাচর তিনটি ফসল হয় পাট + আউস (ভাদ্র আশ্বিনে ওঠে) + খেসারি। অথবা পাট + আমন + খেসারি।

টাঙ্গাইল এবং জামালপুরে ধান অপেক্ষা পাটের চাষ বেশী। লাল মাটিতে পাট কম, ধান বেশী। চরে কলাই, তরমুজ, মটর, পাট ইত্যাদি যথেষ্ট হয়।

(ক) ডাল—জামালপুর ও কিশোরগঞ্জের নামগঞ্জ এলাকায় মুগডাল প্রসিদ্ধ। নদীর ধারে ধারে ঐ দুই মহকুমায় ও সদরে যথেষ্ট ডাল উৎপন্ন হয়।

মাসকলাই, ঠাকুরী কলাই (বিউলি) ও যথেষ্ট খেসারি হয়। সকল মহকুমায় খেসারির ডালের খুব ব্যবহার আছে। সদর মহকুমায় হালুয়াঘাটে মুগডালও প্রসিদ্ধ।

(খ) আখ—সদরের পশ্চিমাংশে আলোপসিং পরগণায় আখের চাষ আছে। সদরে মুক্তাগাছা ও ফুলবেড়িয়াতে, সমগ্র কিশোরগঞ্জে এবং জামালপুরের কিছু অংশে আখ বেশী হয়।

(গ) তুলা—মধুপুর জঙ্গলে এবং উত্তরে গারো পাহাড়ে যথেষ্ট ছোট আঁশের তুলা হয়, ইহাকে গারো কটন বলে। বেলি ব্রাদার্স ইহার একচেটিয়া খরিদ্দার, বৎসরে নাকি এক কোটি টাকার তুলা এদিক হইতে কেনে। গারো পাহাড়ের তুলা যমুনার ধারে রংপুর জেলার অন্তর্গত "মাণিকের চর" নামক বন্দরে বেশী চালান যায়।

(ঘ) ফল বিল অঞ্চল ছাড়া আম, কাঁঠাল, সর্বত্র। গারো পাহাড়ের কমলালেবু সুসঙ্গের তিন মাইল উত্তরে ভড়ের বাজার হইতে আসে। শ্রীহট্টের কমলা ষ্টীমার যোগে কলিকাতার পথে খলাপাড়ার নিকটে চার পাঁচ আনায় শ' বিক্রয় হয়।

বর্ষার দেড় দুই মাস নেত্রকোনা অঞ্চলে প্রচুর আনারস বিক্রয় হয়। তাহার মধ্যে জলচুবি আনারস বিখ্যাত। ইহার চোখ পাৎলা, রস অত্যন্ত বেশী ও সুমিষ্ট। পাহাড়ে ফুটির মত একটি ফল হয়, তাহাও বেশ চলে।

(ঙ) খালিয়াজুড়ির নিকটবর্তী অঞ্চলে বর্ষায় গরুর খাবার পাওয়া মুস্কিল। তখন লোকে বিলের মধ্যে ডুব দিয়া এক প্রকার ডাঁটা তুলিয়া আনে ও নৌকায় করিয়া তাহা বিক্রয় করে।

[কোমরে দড়ি বাঁধিয়া ডুবুরিরা কাস্তে হাতে জলে নামে।]

দুধ :—টাঙ্গাইল, জামালপুর, সদর ও কিশোরগঞ্জে দুধ প্রচুর এবং সস্তা। গাই দুধ প্রথম দুটি মহকুমায় প্রধান, কিশোরগঞ্জে মহিষ যথেষ্ট; সদরে দুই সমান সমান। নেত্রকোনায় হাওড যুক্ত অঞ্চলে বর্ষাকালে গরুর খাদ্যাভাব ঘটে। কিন্তু জল নামিয়া গেলেই দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে ঘাস হয়, দুধও সস্তা হয়। এ অঞ্চলে গোয়ালা ছাড়া সাধারণ চাষী দুধ বিক্রয় করে না, রীতি নাই। পাহাড় অঞ্চল হইতে মহিষের দুধ এবং ঘি আসে। কিশোরগঞ্জে দুধ ১২০ তোলায় সের। টাঙ্গাইলে ঘটি [২০ ঘটি (= /২৮, পাকি ৮০ তোলায় ওজন) সস্তার সময়ে /১০, ৶১০ দাম] করিয়া বিক্রয় হয়। কালিহাতি থানায় দুধের সের ১২০ তোলা, এলাঙ্গায় ১৪০ তোলায়। নেত্রকোনায় ৯০ তোলা বা ১০৫ তোলায় দুধের সের। মাঘ মাসে ৻৭।।, ৻১০ সের হয়। তৈয়ারী খাবার জিনিষ (ক) সদরে মুক্তাগাছার মণ্ডা (ছানা + ক্ষীর) বিখ্যাত। টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ীর চমচম, ও অন্যান্য ছানার খাবার প্রসিদ্ধ ও সস্তা। টাঙ্গাইলের দই নামকরা।

কালিহাতির নিকট ঘি ও দই খুব সস্তা। খাদি প্রতিষ্ঠান এই স্থান এবং পাবনা হইতে যথেষ্ট ঘি কেনেন। বাজিতপুর ও অষ্টগ্রামের পনির (হিন্দু খায় না) কলিকাতায় চালান যায়।

(খ) চিনি, গুড় মুক্তাগাছা ও ফুলবেড়িয়ার আখের গুড়ের মুচি ও চিনি বাজারে বেশ বিক্রয় হয়। হিন্দু পূজাপার্ব্বনে, মেলায় চিনির নানাবিধ "সাজ"—হাতী, ঘোড়া, মঠ ছেলেরা খুব খরিদ করে।

খেজুর গুড়ের টাঙ্গাইল ছাড়া চলন নাই। খেজুর বা নারিকেল গাছ খুব কম। টাঙ্গাইল সংস্কৃতিতে মানিকগঞ্জের মত। সেখানে যথেষ্ট খেজুর গুড় হয়।

(গ) চিড়া, মুড়ি, ইত্যাদি:—মুক্তাগাছার পাশে বেগুনবাড়ির চিঁড়া, প্রসিদ্ধ। কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনার চিঁড়াও ভাল। সমগ্র জেলায় চিঁড়ার খুব চলন আছে। দুধের সঙ্গে চিঁড়া খুব বেশী ব্যবহৃত হয়।

টাঙ্গাইলের বিন্নি ধানের খই (ছোট ছোট সুগন্ধযুক্ত)-এর খুব আদর আছে। মেলায় বেশ বিক্রয় হয়। ভেটের খই এরও চলন আছে, তাহার মণ্ডা খুব চলে। বিন্নির খই দুধে দিয়া খাইতে ভাল।

মাছ:—ইলিশ মাছ এ জেলায় নাই। যমুনা এবং মেঘনা নদীর ধারে মাছের বড় কারবার চলে। কিশোরগঞ্জ মহকুমায় কুলিয়ার চর এ জেলায় সব চেয়ে বড় মাছের বাজার। নীলগঞ্জ তাহারই মত। মোহনগঞ্জে শ্রীহট্ট অঞ্চল হইতেও খুব মাছ চালান আসে। সাধারণ রুই কাৎলা ইত্যাদি প্রধান। ছোট মাছও খুব ওঠে। কুলিয়ার চরের কাছে শুঁটকি করিয়া কুমিল্লা, চট্টগ্রামে পাঠান হয়।

খালিয়াজুড়ি হইতে ভাটি অঞ্চলে খুব বেশী মাছ। ঐ অঞ্চলে বর্ষার সময়ে বাজার বসে না, সাধারণ লোকে শুঁটকি মাছ খায়। মাছের তেল আগে বাহির করিয়া শুঁটকি করে। সেই তেলে জেলেরা প্রদীপও জ্বালায়।

শুঁটকি মাছ করার রীতি:—খলাপাড়া অঞ্চলে বড় মাছ পেট কাটিয়া প্রথমে মাচায় রৌদ্রে শুকায়। ছোট মাছ মাথা বাদ দিয়া বড় জালার মধ্যে ফেলে, তাহার মধ্যে একজন লোক নামিয়া পায়ে চটকাইতে থাকে। গরম করিয়া মাছের তেল বাহির করার পর সেই তেল খানিক ঢালিয়া দেয়, আবার

চটকাইয়া শেষে বাতাস ঢুকিতে না পারে এমন ভাবে মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। (ত্রিপুরা জেলায় "শীদল শুঁটকি" তৈয়ারির রীতি দ্রষ্টব্য।)

কংস নদীতে চিতল ও মহাশোল (মাশোল) মাছ পাওয়া যায়। মাশোল অনেকদামে বিক্রয় হয়।

ঘর, দুয়ার :—জেলায় মাটির ঘর কোথাও নাই। বাঁশের চাটাই এর বেড়া বেশী (মাঝে মাঝে মাটি লেপা), চাল টিনের। আগে ছনই ছিল এখন পাহাড়েও আবাদ বেশী হওয়ায় ছনের অভাব ঘটিয়াছে। বর্ধিষ্ণু গৃহস্থে টিনের বেড়াও দেয়, কাঠের বেড়া নাই বলিলেই হয়। নলিবাঁশ উত্তর হইতে চালান আসে। তল্লাবাঁশ গারো পাহাড় হইতে ভেলার মত নদী পথে ভাসাইয়া নিয়া আসে।

খলাপড়া অঞ্চলে একতলার সমান ঢিপির উপর বাড়ী করিতে হয়। বর্ষার আগে খুঁটি দিয়া ঘর দোর শক্ত করিয়া বাঁধা দরকার। গারোবা পাহাড়ে বা জঙ্গলে টোংএর উপর বাড়ী করে (পাইল এবং ফ্রি ডোয়েলিং) ইহাকে 'টুই ঘর' বলে। জলা জায়গায় বা পুকুরের মধ্যে খুঁটি গাড়িয়া সখ করিয়া বড় লোকে এরকম বাংলা ঘর করিলে তাহাকে টুইটুঙ্ঘর বলে (টুংগি ")। টাঙ্গাইলে বন্যা হয় (মধুপুরের নিকট ছাড়া), সেখানে ঢিপির উপর বাড়ী করে। [ভাদ্রে জল নামিয়া যায়।] ঘরের মধ্যে সিলিং এর মত যে জিনিস থাকে তাহার নাম নেত্রকোনায় পাটাতন, টাঙ্গাইলে কার, মৈমনসিংহে ও কার। উঘার-ঘরের মধ্যে মানুষ সমান খুঁটি গাড়িয়া তাহার উপর বাঁশ ও চাটাইয়ের মেঝে ও ধারে বেড়া, দরজা প্রভৃতি দিয়া একটি অনুচ্চ ঘর করিয়া তাহাতে জিনিষপত্র রাখে, তাহাকে উঘইর বা উঘার বলে। সদরে সিলিংকে টুই ও বলে কেননা উহা উঁচা।

জ্বালানি :—কাঠই প্রধান, সহর অঞ্চলে রেল মারফৎ কিছু কয়লা আসে। শহরে কাঠও বেশ চলে। হাওড় যুক্ত অঞ্চলে আম, কাঠাল গাছ বাঁচে না। হিজল, মান্দার প্রভৃতি অসার গাছ জন্মে, তাহার কাঠ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কুটীর শিল্প :—(ক) এ জেলায় পাটির খুব চলন আছে। কালিহাতিতে পাইটতা পাড়া আছে, হিন্দু পাইটতা জাতি ঐ গাছের চাস করে, ও চটা তুলিয়া বোনে। খলাপাড়া অঞ্চলের বেতের ডালা, মোড়া ইত্যাদি ভাল।

বর্ষায় ঘরে আবদ্ধ থাকিতে হয় বলিয়া সেই সময়ের উপযোগী কুটির শিল্প এই ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। শীতলপাটিও এ অঞ্চলে খুব ভাল হয়। (খ) ছুতার—কিশোরগঞ্জের ছুতার, করাতি প্রভৃতিরা নামকরা মিস্ত্রী। তাহারা জেলার সর্বত্র কাঠের কাজ করে, নৌকাও গড়ে। (গ) কুমার—জেলার সর্বত্র। মুক্তাগাছা ও ছত্রপুরের কুমার নামকরা। (ঘ) কপালি জাতি চটের ছালা, চট বুনিত, আজকাল তাহাদের কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। (ঙ) পুতুল - বেশ হয়। (চ) কাঁসারি—জামালপুর মহকুমায় ইসলামপুরের হিন্দু কাঁসারিরা প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাহারা অত্যন্ত অলস, তাগাদা দিয়া কাজ করাইতে হয়। লৌহজঙ্গ নদীর অপর পাড়ে টাঙ্গাইলের সন্নিকট, কাগমারির পিতল কাঁসার বাসন বিখ্যাত। কালিহাতি থানায় মগরার কাঁসারিদেরও নাম আছে। মগরার পাতলা চাদরের কলস নাম করা। (ছ) কলু—জেলার সর্বত্র মুসলমান কলু আছে। অন্য মুসলমানেরা ইহাদের অপেক্ষাকৃত নীচু বলিয়া গণ্য করে। [এক গরুর ঘানি, চোখে ঠুলি, নীচে ফুটা] (জ) তাঁতি :—টাঙ্গাইলের শাড়ী বাংলার সর্বত্র প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে। বাজিতপুরে হিন্দু তাঁতিরা (মাটির ভিতরে গর্ত করা) তাঁতে বোনে, ফ্লাইশাটলে নয়। বাজিতপুর টাঙ্গাইলের ১॥০ মাইল দূরে।

কালিহাতি থানায় বল্লাতে ৩০০ মুসলমান জোলার বাস। ইহারা এবং যুগীরা গামছা, ডুরে শাড়ী, লুংগি বেশী বোনে। স্থানীয় খরিদ্দারের নিকট বিক্রয় করে। [নারায়ণগঞ্জে (ঢাকা) ও টাঙ্গাইল হইতে ব্যাপারীরা সুতা সরবরাহ করে। দালালেরা বেশী রোজকার করে, তাঁতি বানি যথাযোগ্য পায় না।]

বিলাতী শিল্প :—কিশোরগঞ্জে দেশী চিনির কারখানা আছে। তাহার নাম "দয়াময়ী সুগার মিল"। মুক্তাগাছার রাজা ফুলপুরে চিনির কল করিয়াছিলেন, এখন বোধ হয় বন্ধ। মৈমনসিংহ শহরে ও ভৈরববাজারে প্রধানতঃ মাছের কারবারের জন্য বরফ কল আছে।

মেলা :—জেলার মধ্যে ব্যবসায়ের দিক দিয়া সব চেয়ে নাম করা মেলা জামালপুরের কাছে হয়। শীতকালে বিহারের—হরিহর ছত্রের পর বসে। বহু গরু বাছুর বিক্রয় হয়।

তাছাড়া হিন্দু পূজা পার্বনে, বারুণীর স্নানে শম্ভুগঞ্জে (মৈমনসিংহ শহরের অপর পারে), গুপ্তবৃন্দাবনে (মধুপুর জঙ্গলের মধ্যে) মেলাও হয়।

বন্দর ঃ—পাটের প্রধান—এলাসিন—ধলেশ্বরী নদীর ধারে পাটের বড় কেন্দ্র। সরিষাবাড়ী পাটের বড় বাজার।

অন্যবিধ—জামরকি হাট খুব বড় ও সব রকম কেনা বেচা হয়। করো-টিয়ায় সাপ্তাহিক হাটে গরু বাছুর খুব বিক্রয় হয়।

মাছের প্রধান—কুলিয়ার চর, নীলগঞ্জ, মোহনগঞ্জ।

ফল—ভণ্ডের বাজার।

যাতায়াত—সদরে ভালুকা ও ফুলবাড়ীর অংশবিশেষ জঙ্গল ও উঁচু নীচু হওয়ায় যাতায়াতের কিছু কষ্ট আছে। অন্যত্র ভাল। ফুলপুর ও হালুয়া-ঘাটেও ভাল নয়। নদী, রেল ও জেলা বোর্ডের রাস্তা প্রধান। মোটর, ঘোড়ার গাড়ী, কিছু ঘোড়ার চলনও আছে। গরুর গাড়ীতে শুধু মাল লয়, মানুষ চড়ে না। বিহারীদের দ্বারা বাহিত সওয়ারি (ডুলি) এবং পালকিও চলে। পুরুষেরা হাঁটে বা ঘোড়ায় চড়িয়া যায়! মাল ভারে বা বাঁকেও লয়।

টাঙ্গাইল হইতে মৈমনসিংহ পর্যন্ত মোটর সার্ভিস আছে। পথে মধুপুরে রাণী হেমন্তকুমারীর কাছারি পড়ে।

মানুষ ঃ—গ্রামে আগে নাপিত, ধোপা, ছুতার, মিস্ত্রী, কামারদের চাকরান জমি দেওয়া থাকিত। তাহা ছাড়া পূজায়, বিবাহে অতিরিক্ত বাঁধা বরাদ্দ ছিল। গরীব গৃহস্থ হয়ত শুধু এক জোড়া নারিকেল দিত। অতিরিক্ত কাজের জন্য কিছু টাকাও পাইত। আজকাল চাকরান জমিতে কুলায় না বলিয়া কেহ কেহ কিছু নগদ টাকাও দেন।

[নানকার প্রজা জমি পাইত, যখনই প্রয়োজন তখন খাটিতে হইত। তাহাদের যখন তখন তুলিয়া দেওয়া যাইত।]

ধোপা, নাপিত ছাড়া পূজায় যাহারা কাজ করে তাহাদের চাকরান জমি দেওয়ার প্রথা ছিল, যথা—মুচি (ঢাক বাজাইবার জন্য), কামার (বলি দিবার জন্য।)

[গারোরা মধুপুরের জঙ্গলে জুম করে, তবে আজকাল চাষ করিতেছে। গারো ও হাজংরা পাহাড়ে যথেষ্ট মহিষের বাথান করে। মান্ধাই জাতি মাটিতে চাষ করে অপরের মত, তবে জঙ্গলে থাকে।]

জেলে সব হিন্দু। নিকারিরা (মুসলমান) মাছের কারবার করে। আজকাল মুসলমানরা মাছ ধরিয়া ব্যবসা করিতেছে। কলুরা যেমন মুসলমান, বাদ্যকরেরাও তাই।

অন্যান্য :—টাঙ্গাইল এবং নেত্রকোনা—(১৯৩৮ এর পর এপিডেমিক) ম্যালেরিয়া বেশী। সদরে ফুলপুর পূর্বধবল অঞ্চলে আছে। ছোট ছোট নদী মজিয়া যাওয়ার ফলেই নদীমুখ বন্ধ হয়, কচুরিপানার উৎপাতের সঙ্গে ম্যালেরিয়ায় বাড়ে।

টাঙ্গাইলের সঙ্গে সংস্কৃতিগত ভাবে মানিকগঞ্জের যোগ। খালিয়াজুড়ির সহিত শ্রীহট্টের। (পাবনার সঙ্গে কম সম্বন্ধ) টাঙ্গাইলের লোক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য মৈমনসিংহের সঙ্গে যোগ স্বীকার করিতে চায় না। টাঙ্গাইলের ব্রাহ্মণদের বিবাহ পাবনা অঞ্চলে ও কায়স্থদের মানিকগঞ্জ অঞ্চলে হয়।

বিয়াল্লিশের বাংলা

(রাজসাহী বিভাগ ও কুচবিহার রাজ্য)

রাজসাহী
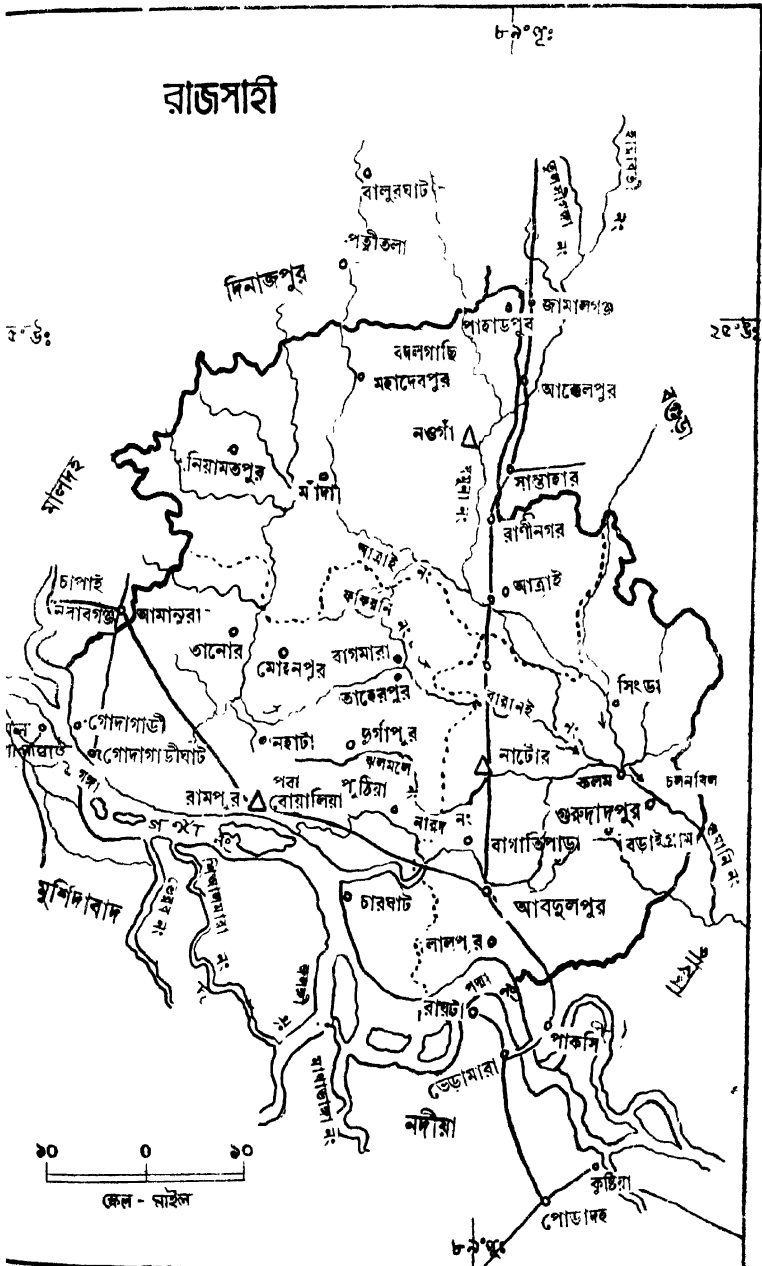
রাজসাহী, রাজসাহী বিভাগের একটি জেলা। জেলায় মহকুমা ৩টী।

সদর মহকুমার থানা :—বাগমারা, ভানোর, মোহনপুর, গোদাগাড়ী, বোয়ালিয়া (রাজসাহী) পবা, দুর্গাপুর, পুঠিয়া, চারঘাট।

নাটোর মহকুমার থানা :- গুরুদাসপুর, বড়াইগ্রাম, লালপুর, বাগতি পাড়া, নাটোর, সিংড়া।

নওগা মহকুমার থানা :—বদলগাছি, নওগা, (নেওগা), আত্রাই, রাণী নগর, মাঁদা, নিয়ামতপুর, মহাদেবপুর।

মাটি :—মহাদেবপুর, মাঁদা, নিয়ামতপুর, তানোর, গোদাগাড়ী থানার মাটি লালচে, কিন্তু বগুড়ার মত তত লাল নয়। ইহাকে বরীন বলে, (খুব আঠাল ও লালচে)। বগুড়ায় বা পাবনায় লাল মাটির নাম খিয়ার। মোহনপুরের দক্ষিণ হইতে জেলার সমগ্র পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত পদ্মা ও অন্যান্য নদীর পলি পড়ে। নাটোর মহকুমায় পলি দোআঁশ হইলেও খুঁড়িলে নীচে এটেল মাটি পাওয়া যায়।

নওগাঁর উত্তর পশ্চিমে আনুমানিক ৫ × ২ মাইল অঞ্চলে গাঁজার চাষ হয়। সেখানেও পলি। নওগাঁর অবশিষ্ট অংশ কঠিন।

নীচু জমিকে কাঁদর বলে। কাঁদরে চাষ ভাল হয়। তাই জেলার প্রবাদ আছে "বৌ কববি বাঁদর, জমি করবি কাঁদর", অর্থাৎ কুরূপা স্ত্রী গৃহিণী ভাল হয়, নীচু জমি চাষের পক্ষে ভাল হয়।

তাহেরপুরে কুয়া খুঁড়িলে ক্রমশঃ মোটা বালি পাওয়া যায়।

নদনদী :—গত বিশ বছরের মধ্যে (বালুরঘাট দিনাজপুর জেলায়) আত্রাই নদীর প্রবাহ এত কমিয়া গিয়াছে যে শীতের সময়ে নদীর জলে বালুর ঘাটে বাঁশের সেতু রচিত হইয়াছে, আগে সারা বৎসর খেয়ায় লোকে পারাপার হইত। ১৯২২ সালে উত্তর বঙ্গ বন্যায় ফকিরনির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জল আত্রাই এ পড়িয়া রেল লাইনে প্রতিহত হওয়ার ফলে বন্যা হয়।

জলাশয় :—পূর্বে পুষ্করিণীর চলন অধিক ছিল, এখন কমিয়া গিয়াছে। কুয়ার চলন জেলায় সর্বত্র আছে। বরীন অর্থাৎ খিরার মাটিতে কুয়ার মাথার মাথার কাছে বাঁধান আছে এবং নীচে, জল যেখানে বাহির হয়, সেখানে কয়েকখানি মাটির চাক লাগান হয়। কিন্তু পলি মাটির দেশে আগাগোড়া

মাটির চাক দিয়া বাঁধাইতে হয়। জল ১৫।২০ হাতের মধ্যে পাওয়া যায়। তাহেরপুর অঞ্চলে জল ১০।১৫ হাত, বরীন অঞ্চলে ২০ হাত উর্দ্ধে।

জায়গায় জায়গার নলকূপ আছে। গোদাগাড়ী থানায় নলকূপের চলন হইয়াছে। অন্যত্রও বৎসর ২০র মধ্যে বাড়িয়াছে।

চাষ :—নাটোর মহকুমায় পাটই প্রধান। রাজসাহী সদরেও তদ্রুপ। বরীন দেশে ধানই প্রধান শস্য।

নওগাঁতে আম (="উম্বর" ও উসাল) ও প্রচুর হয়। গাঁজা মহলে যমুনার পলিতে গাঁজার চাষ আছে। আখ নাটোর ও সদরেও বেশ হয়।

নাটোরে রবিশস্য ভাল হয়, সাদা তিলের চাষও আছে। তিল তৈল তৈয়ারি হইয়া অন্যত্র চালান যায়। সরিষার চাষ উত্তরাংশেও আছে। ভিটেতে (অর্থাৎ উঁচু পরিত্যক্ত বসত বাড়ীর জমিতে) পাট ও সরিষা বোনে, পুকুরের ধারে উঁচু জায়গাতেও বোনে। (পলিতে), কলা, আম, কাঠালের চাষ (ফজলি) আছে। নাটোরের কাছে একটি গ্রামে আম ও আমের কলম বিক্রী প্রধান ব্যবসায়। নহাটা হইতে বাগমারার মধ্যে নদীর দুই পাশে পানের বড় চাষ আছে (বারুই)। ইহা মাধনগর স্টেশন হইয়া চালান যায়। খেজুর গুড়ের ভাল চলন আছে।

তাহেরপুরকে কেন্দ্র করিয়া প্রচুর পেঁয়াজের চাষ হয়। চট্টগ্রামেও চালান যায়। রাজসাহীর চর অঞ্চলে ও নওগাঁর কাছে পটলের চাষ আছে। সময়ে বেশ সস্তা হয়। বগুড়া প্রভৃতি জায়গায় চালান যায়।

দুধ :—নাটোর মহকুমায় ম্যালেরিয়ার কারণে অনেক পরিত্যক্ত জমি আছে। সেখানে চরাইতে পায় বলিয়া দুধও সস্তা। নাটোরের কাছাকাছি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে সস্তা হয়, পুজা বা শীতের সময়ে নহে। রাজসাহীর উত্তরভাগে বাড়ীতে অতিথি আসিলে দুধের সর ও মধু খাইতে দেওয়ার রেওয়াজ আছে।

খাবার :—আখ ও খেজুরের গুড়ের চলন আছে, চিঁড়ে, মুড়ি, মুড়কি খাগড়াই গ্রামের প্রধান খাদ্য। নটোর অঞ্চলের দই, ক্ষীর ও নাটোর সহরের কাঁচাগোল্লা ও রাঘবসাই বিশেষ বিখ্যাত। নাটোর হইতে রংপুর দিনাজপুর প্রভৃতি জেলাতেও কাজেকর্মে রসগোল্লা চালান যায়। জেলার দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলে গ্রামেও মিষ্টির চালান বেশী।

মাছ ঃ—পাবনা বা পূর্ববঙ্গের তুলনায় অল্প। নাটোর অঞ্চলে বিলের জিয়ানো মাছ অর্থাৎ কৈ, মাগুর, সিঙ্গি বেশ পাওয়া যায়। বারানই এবং আত্রাই নদীতে ধরা কাছিম আত্রাই স্টেশনে খুব বিক্রয় হয়, এখান হইতে চালানও যায়।

ঘর ঃ—পলি অঞ্চলে মাটির দেওয়াল খুব কম। সখ করিয়া কেহ করিলেও ইঁদুরের গর্তে নষ্ট হইতে দেখা যায়। (মুলি বাঁশের বোনা বেড়া নাই; চ্যাগাড়) বাঁশ ছেঁচিয়া (ছেঁচা বেড়া) তাহার উপর মাটির প্রলেপ দেওয়া বেড়া পলি অঞ্চলে বেশী চলে। টিনের বেড়া দোকানঘর বা গুদামে দিয়া থাকে, বসত বাড়ীতে নয়। আজকাল ইহার চলন বসতবাড়ীতেও বৃদ্ধি পাইতেছে। দক্ষিণ দেশে কেহ কেহ চাকার মত "কাঠোরা" করা বাড়ীও করে, তবে তাহার চলন খুব কম। বরীন অঞ্চলে মাটির দেওয়াল দেয়, সেখানে ধানের খড় এবং ছন দুইই চালে ব্যবহৃত হয়, কেশে (ঘাসও) ব্যবহার করে। দক্ষিণে ধানের খড় আদৌ চালে ব্যবহৃত হয় না। অবস্থা ভাল হইলে টিনের চালও দেয়। টিনের ঘরের মধ্যে সিলিং জাতীয় কিছু থাকে, ইহাকে ছাত বলে। যেখানে বন্যা হয় সেখানে উঁচু ভিটার উপর বাড়ী করাই রীতি। জেলায় দালানের প্রচলন খুব কম। প্রত্যেকের বাড়ী বেড়া দিয়া ঘেরা থাকে, ইহা কঞ্চি বা পাটখড়ি দিয়া সাধারণত করা হয়। উত্তরে সাধারণতঃ পাটির ব্যবহার হয়, [পাটি গাছের চাষ আছে, ইহাতে ছেঁচ দিতে হয়।] দক্ষিণ দিকে সপের ব্যবহার বেশী, ইহা জেলায় বাহির হইতে চালান আসে।

জ্বালানি ঃ—অসার নানাবিধ কাঠ জ্বালান হয়। সহরে কয়লা চলে, গ্রামে কিছু কিছু প্রবেশ করিতেছে। মিঠাই এর দোকান ছাড়া কয়লা ব্যবহৃত হয় না।

শিল্প ঃ—কামার, কুমারদের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। গ্রামের প্রয়োজনমত কামার, কুমোর, ধোপা. (শ্রীদ্বিজেন তলাপাত্রের বাড়ীতে বিবাহের সময় মুসলমান ধোপাকে যে সব কথা বলিতে হয় বলিতে শুনিয়াছেন। রাজসাহীতে হিন্দু ধোপা, কিন্তু তাহাদের ওখানে ধোপা মুসলমান।) নাপিত আছে। হাট বাজার হইতেও কামার ও কুমারের তৈয়ারি জিনিষ কিনিয়া আনে। তাঁতের কাজ মুসলমান জোলায় করে, হিন্দু তাঁতি অল্প।

বেশীর ভাগ কাপড় চালান আসে। তেলের কাজ মুসলমান কলুতে করে ("খুলু" বলে। অপর মুসলমানে ইহাদিগকে নীচু জাতি বলিয়া গণ্য করে। তেলের ঘানিতে এক বলদ, ফুটা আছে, বলদের চোখে ঠুলি। কলসের পিতল—কাঁসার কাজ বিখ্যাত। কাঁসারিরা হিন্দু, কিছু নমঃশূদ্রও এই কাজ করে। (গ্রাম দেখত ফলম, বিল দেখত চলন"), রাণী নগরে হিন্দু মুসলমান গৃহস্থে সরু কাঠির মাদুর বোনে। ভোজের জন্য অন্ন ও সারের যথেষ্ট লম্বা এক প্রকার মাদুর এখানে বোনা হয়, তাহাকে 'সড়ক' বলে। নমাজ পড়িবার জন্যও স্বতন্ত্র মাদুর কিনিতে পাওয়া যায়।

জেলায় পূর্বে নানাস্থানে রেশমকুঠি ছিল, কিন্তু সে শিল্প এখন লুপ্ত হইয়াছে।

বিদেশী শিল্প :—গোপালপুরে মাড়োয়ারি কোম্পানীর চিনির কল আছে, তাহার চাহিদায় নিকটবর্তী অঞ্চলে আখের চাষ বাড়িয়াছে।

যাতায়াত :—বর্ষায় নৌকা প্রধান বাহন। অন্য সময়ে গরুর গাড়ী ও অল্প ডুলি চলে। ডুলি পশ্চিমারা বয়। (পাল্কি চোখে পড়ে নাই) বর্ষায় এবাড়ী হইতে ওবাড়ী যাইতে নাটোরের উত্তরে ও কিছুদূর দক্ষিণে বিল অঞ্চলে মাটির চাড়ির (গামলা) কোরাকল চলন আছে। সাধারণ চাড়িও ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র চাড়ি কুমোর গড়িয়া থাকে। চাড়ি বইঠে এবং জোড় লগি) দুই উপায়েই চালান হয়। চাড়ি ফর্মায় ফেলিয়া পিটিয়া পিটিয়া হাতে গড়া হয়, চাকে নয়। তালগাছের ডোঙ্গার চলনও আছে, ঘোড়া, গরু, মোষ চলে। মহিষ গাড়ীর চেয়ে গরুর গাড়ীর চলন বেশী। টমটমের বেশ চলন আছে, ইহাতে চারজন করিয়া বসে। বাঙ্গালী মুসলমান গাড়োয়ানের কাজ করে।

মেলা, হাট, বাজার :—তাহেরপুরে—চাষের জিনিষ বেশী। পেঁয়াজ, ধান, পাট প্রধানতঃ বিক্রয় হয় (সোম ও শুক্রবার) আত্রাই—ঐ ধরণের।

[গঞ্জ—নদীর ধারে যতগুলি স্থায়ী দোকান থাকে, সেখানে হাটের দিনে কেনা বেচা বেশী হয়। শব্দটি রাজসাহী এবং তদুত্তর ভাগের জেলাগুলিতে বেশী ব্যবহৃত হয়।]

সংস্কৃতি মণ্ডল :—উত্তরে (ফকিরনি নদীর নওগাঁকে কেন্দ্র করিয়া রংপুরের

বাহেদের মত ভাষার ধরণ ও টান আছে ("তুমি যাবেন") পশ্চিমে রাজসাহীর স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষা। নাটোর ও পূর্বভাগে পাবনা ও বগুড়ার সঙ্গে খানিক মিল আছে।

[খেতুরে বৈষ্ণবদের একটা মেলা হয়, (খেতুর রাজসাহীর ১০ মাইল পশ্চিমে, পদ্মার ধারে) সেখানে ঘরের ভিতর হইতে (আঙ্গুল নাড়াইয়া) রং দেখিয়া বৈষ্ণবী পছন্দ করিতে হয়। মোহান্ত ১।০ দিলে কণ্ঠি বদল করে, ইহা তিনি শুনিয়াছেন।]

দিনাজপুর
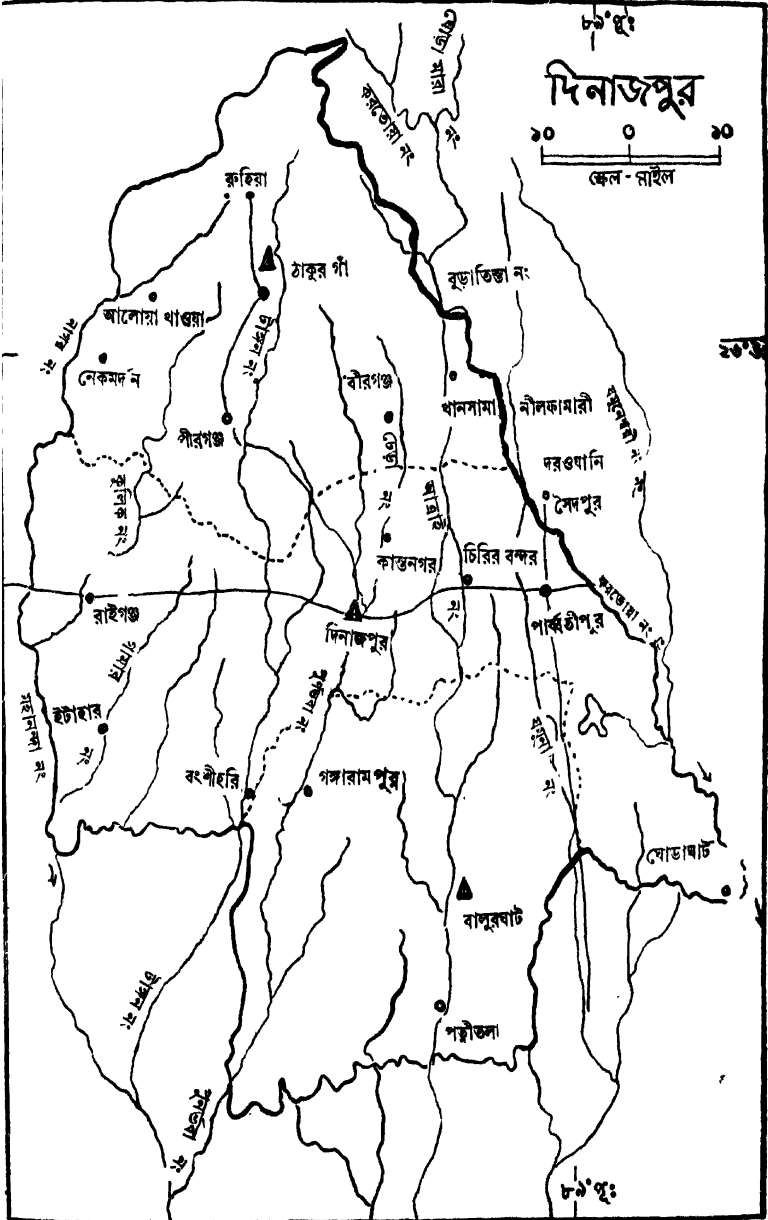
দিনাজপুর, রাজশাহী বিভাগের একটি জেলা। জেলায় তিনটি মহকুমা আছে।

সদর মহকুমার থানা :—দিনাজপুর, পার্ব্বতীপুব, নবাবগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, চিরির বন্দর, বিরল, রাইগঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিগঞ্জ, ইটাহার, বংশীহরি, কুশমণ্ডী।

ঠাকুরগাঁ মহকুমার থানা ঠাকুরগাঁ, বালিয়াডঙ্গী, আটবাড়ী, রাণী শক্রাইল, হরিপুর, পীরগঞ্জ, বোচাগঞ্জ, বীরগঞ্জ, খানসামা, কাহারুল।

বালুবঘাট মহকুমার থানা :- বালুরঘাট, পত্নীতলা, ধামোইবহাট, পোবসা, কুমারগঞ্জ, ফুলবাড়ী, গঙ্গারামপুর, তপন।

মাটি : - জেলার পূর্বভাগে যমুনা নদীর ধারে ধারে পলি, দো আঁশ, তাহার মধ্যে বালির ভাগ কিছু বেশী। দিনাজপুব সহরে কুয়া হইতে খব বালি ওঠে (জলও খুব ঠাণ্ডা)। ঠাকুবগাঁ মহকুমায় পূর্ণিযার দিকে আঠাল, দো-আঁশও আছে। এগুলি বাদ দিলে জেলার অবশিষ্ট আঠাল খিয়াড় মাটি।

নদ নদী :—(১৮৯৭ ?) ভূমিকম্পের পর হইতে কবতোয়া প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। সৈদপুরের (রংপুর) কিছু কিছু পশ্চিমে নীলফামাবিব (বংপুর) পশ্চিমে উহার গভ প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে।

জলাশয় প্রভৃতি—জেলায় পুকুব ও দীঘি অনেক আছে। দিনাজপুর হইতে মালদহের পথের ধাবে ধারে নিয়মিত ব্যবধানে দীঘি আছে। ১৬।১৭ মাইল দূরে মহীপাল দীঘি, ২ মাইল দূরে মাতাসাগর, ৩ মাইল দূরে রামপাল বিখ্যাত। দিবোর দীঘি (রাজা দিবোকেব দীঘি, ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তাছাড়া চলদীঘি, তপনদীঘিরও নাম আছে।

কুয়ার চলন যথেষ্ট। ১৪।১৫ হাত নীচেই বালুরঘাট অঞ্চলে জল পাওয়া যায়। দিনাজপুর, রায়গঞ্জ প্রভৃতি জায়গায় লোকে কুয়াব জলই পান করে। বালির স্তর নীচে আছে বলিয়া জল খুব ঠাণ্ডা। কুয়াব উপব হইতে নীচে জল পর্যন্ত মাটির চাক দেওয়া থাকে। ঠাকুরগাঁ মহকুমায় কিন্তু কুয়া বেশী, পুকুরের চলন খুব কম বলা যায়।

চাষ :—বালুরঘাট, সদর ও ঠাকুরগাঁ মহকুমায় ধানই প্রধান শস্য। আলু, আখও বেশ হয়। ধান বেশ চালান যায়। পাট, সরিষা, সর্বত্র কিছু কিছু হয়, রায়গঞ্জ হইতে পাট চালান যায়। উহা পাট খরিদের বড়বাজার, বেলি প্রভৃতি বড় কোম্পানীর খরিদকেন্দ্র আছে। পার্শ্ববর্তী নীলফামারী (রংপুর)

তামাকের খুব বড় বিক্রয়কেন্দ্র। দিনাজপুরে আম বেশ ভাল ও সস্তা পাওয়া যায়, চালান কম হয়।

দুধ—ঠাকুরগাঁ মহকুমায় গরু দুধ কম দেয়। মহিষের বেশ চলন আছে, গাই ও মহিষের মেশান দুধ, দৈ, ঘি পাওয়া যায়। (পাবনা ও ঢাকা জেলার গোয়ালারা এখানে দুধ দৈ এর কারবার করে।) দিনাজপুর সহর, রায়গঞ্জে দুধ ভালই পাওয়া যায়, রায়গঞ্জে অপেক্ষাকৃত সস্তা। বালুরঘাট অঞ্চলে দুধ খুব সুবিধার নয়। জেলার গোচারণ জমির অভাবের জন্য মোটের উপর দুধের অবস্থা ভাল নয় বলা চলে। জেলাতে দৈ এর খুব চলন আছে। দিনাজপুর সহরের দৈ বেশ ভাল।

খাবার :—দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁর চিড়া খুব পাতলা ও ভাল হয়। ঠাকুরগাঁ অঞ্চলে গুড়ের মুড়কি ও খৈ সাধারণতঃ লোকে খায়। ছোলার ছাতুর বেশ চলন আছে।

জেলায় আখের দানাদার ঝোলা গুড় বেশ ভাল হয়, খেজুর গুড় চালান আসে, জেলায় হয় না। হাটে পাঁউরুটি, বিস্কুট খুব বিক্রয় হয়। চাটগাঁর হিন্দু কারিগর বেশী, মুসলমান কারিগর কিছু কিছু এই কারবার করিতেছে, কিছু হিন্দুস্থানী কারিগরও আছে।

শান্তনগরের লুচি খুব বিখ্যাত (ঠাকুরের ভোগের লুচি)।

মাছ মাংস :- মাছ মোটের ওপর কম। ঠাকুরগাঁ ও তৎসংলগ্ন নীলফামারীতে হাটে খুব কাছিম চালান আসে। হিন্দুরা (রাজবংশী ক্ষত্রিয় এবং মাহিষ্য) ইহা যথেষ্ট খায়। মুসলমান আদৌ খায় না। মুসলমানদের বড় বড় উৎসবে উট কোরবানি করিয়া তাহর মাংস খাওয়ার রীতি আছে। দুম্বাও মেলাতে খুব বিক্রয় হয়।

রায়গঞ্জ প্রভৃতি জায়গায় চালানি মাছ সাঁড়া ধুবড়ি, প্রভৃতি জায়গা হইতে আসে।

ঘরবাড়ি :—বালুরঘাটে বাঁশের বেড়া নাই, মাটির দেওয়াল দেয়. দিনাজপুর সহরে বাজে ঘরের বেড়া ছেঁচা বাঁশের হয়ত করে, থাকিবার ঘরের বেড়া মাটি দিয়া তৈয়ারি হয়। উত্তরে ঠাকুরগাঁ মহকুমার ঘর দুয়ার ছোট ছোট, বাঁশের বেড়ার (ছেঁচা বা ধাড়া) চলন আছে। রায়গঞ্জে তত্রাপ (?) তদ্রূপ, রংপুরে বেড়ার ঘরই বেশী)।

রাজসাহী জেলার মত চাল ধানের খড় দিয়া ছাওয়া হয়, ছন দিয়া নয়। টিনের চাল আজকাল লোকে পয়সা হইলেই করে। দিনাজপুর সহরে কিছু খোলার ঘর আছে, উহা ঠাকুরগাঁ মহকুমার পশ্চিম দিকে অর্থাৎ পূর্ণিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বেশী দেখা যায়। সহরে ইটের দালান সম্প্রতি বেশ বৃদ্ধি পাইতেছে।

আসবাব :—সরু শলার পাটি (স্থানীয় ?) এবং সপর চলন খুব আছে। কোনও বাড়িতে মাইপোষ (প্রকাণ্ড সিন্দুক) থাকে, তাহার উপর ২৩জন বিছানা করিয়া শুইয়া থাকে।

জ্বালানি :—রায়গঞ্জে কয়লার চলন আছে। কিন্তু জেলায় সর্বত্র কাঠের চলনই বেশী।

শিল্প :—(১) তৈল—দিনাজপুর, বায়গঞ্জ প্রভৃতি সহরেও ঘানির সরিষার তেল বেশ পাওয়া যায়। কলুরা হিন্দু ও মুসলমান দুইই হয়। (২) তাঁতি—শমঝিয়া গ্রামে বহু হিন্দু তাঁতির বাস। জেলায় তাঁতিদের মধ্যে কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠান আছে। তাঁতিরা গামছা ও ছোট ছোট কাপড় বেশী বোনে। (এ জেলার উত্তর ভাগে ও রংপুরেও হিন্দু অধিবাসীদের (রাজবংশী) মধ্যে পুরুষেরা আগে লেংটি ও মেয়েরা স্তন পর্যন্ত ঢাকিয়া লুঙ্গির মত একখণ্ড কাপড় পরিত ('ফোতা' বলে ?) এখন সহর বাজারের কাছে তাহা পরিবর্তিত হইয়াছে। কুচবিহারেও তদ্রূপ। মুসলমান মেয়েরা দুখণ্ড ছোট ছোট কাপড় পরে। (৩) সাঁওতালেরা খেজুর পাতার চেটাই বুনিয়া কিছু কিছু বিক্রয় করে। (৪) রায়গঞ্জ অঞ্চলে স্থানীয় কারিগরে বেশ মজবুত চট তৈয়ারী করে, সারা জেলায় বেশ আদর করিয়া লোকে তাহা খরিদ করিয়া থাকে।

বিদেশী শিল্প—হিলি ও ফুলবাড়ীতে ধানের অনেক কল হইয়াছে। রায়গঞ্জের কাছেও আছে।

হাটবাজার :—দিনাজপুর, বোচাগঞ্জ, খানসামা, কাহারুল, ইটাহার প্রভৃতি স্থানের হাট খুব বড় ও বিখ্যাত। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে গরু বাছুরও যথেষ্ট বিক্রয় হয়।

মেলা : দিনাজপুর জেলায় শীতকালে বহু প্রসিদ্ধ মেলা বসে, সেখানে খরিদ বিক্রয়ও খুব হয়।

(১) ঠাকুরগাঁর ওপারে জয়গঞ্জ কালীর মেলা খুব বড়। সেখানে বহু ঘোড়া, কুকুর, হাতী, দুম্বা, গরু বাছুর এবং উট বিক্রয় হয়। ঢাকা, মৈমনসিংহ, ধুবড়ী হইতেও লোকে গরু কিনিতে এখানে আসে। (২) জেলার উত্তর প্রান্তে নেকমর্দ্দনের মেলাতেও খুব গরু, উট আসে; (৩) নিকটে আলোয়াখাওয়ার মেলা হয়; (৪) হরিপুরে বড় মেলা বসে তাহার নিকটে ঝিন্দোলেও বসে (রায়গঞ্জের কাছে), (৫) চলদিঘী, তপন দিঘী, দিবোর দিঘীর মেলাও বেশ বড় রকম হয়।

বন্দর, গঞ্জ—রায়গঞ্জ পাটের কেন্দ্র, বালুরঘাট ও হিলি ধান চালের, দিনাজপুরও তদ্রূপ। (জেলায় পাবনা ও ঢাকার সাহা, তিলি প্রভৃতির হাতে বেশী ব্যবসা। আজকাল কিছু কিছু মাড়োয়ারী ঢুকিতেছে।)

যাতায়াত:—জেলায় নৌকার চলন খুব কম। ঘোড়া কিছু আছে। গরু এবং মহিষের গাড়ী খুব চলে। মোটর, সাইকেল, রেল যথেষ্ট।) গ্রামে লোকের পয়সা হইলে ভাল বলদ কিনিয়া, চমৎকার টপ্পর দিয়া সাজাইয়া গরুর গাড়ী চালায়, এ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, গরুর গাড়ী যাহার ভাল দৌড়ায় তাহা লইয়া গৌরব বোধ করে। ভাল গরুর গাড়ী সৌখীন জিনিষ বলিয়া মনে করা হয়। জেলায় মুসলমান ধনী জোতদার বহু আছেন, তাঁহাদের মধ্যে হাতী, উট প্রভৃতি রাখিবার রেওয়াজ ছিল, এখন কমিয়া যাইতেছে। তাহার পরিবর্তে মোটরের চলন বৃদ্ধি পাইতেছে। হিন্দুস্থানী বেহারার দ্বারা বাহিত ডুলির চলন খুব ছিল এখন কমিয়া গিয়াছে।

সামাজিক সংবাদ—(আর্থিক ও সামাজিক) দিনাজপুর ও রংপুর উভয় জেলাতে খুব ধনী ও বড় মুসলমান জোতদার আছেন। বগুড়া জেলাতেও শিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা (উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি) খুব বেশী। কিছু কিছু ধনী হিন্দু জমিদার, জোতদার আছেন। সহর বাজারে উকিল, ডাক্তার ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে পাবনা ও তৎপরে ঢাকা জেলার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সাহা, কুণ্ডু, মাহিষ্যই বেশী। স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে এইসব কাজে লোক কম। উচ্চ বর্ণের হিন্দু অধিবাসীদের দ্বারাই অধ্যুষিত বড় প্রাচীন গ্রাম রংপুর বা দিনাজপুরে বিশেষ চোখে পড়ে না। তবে সাহাদের সেরূপ গ্রাম দিনাজপুরে আছে। [এখানে তিলি, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতীয় জমিদারগোষ্ঠির গ্রাম বাদ দেওয়া হইল।]

[হিন্দুস্থানী—ঠাকুর, চাকর-বাকর, চাষের মজুর ও অন্যবিধ মজুরের কাজ হিন্দুস্থানীরা খুব করে। তাহারা উত্তর বিহার হইতে দলে দলে আসে। ধানকাটার পর আবার চলিয়া যায়। কারীগরের মধ্যেও হিন্দুস্থানী আছে।

[সাঁওতাল—জেলায় অনেক বসবাস করিতেছে। (রাজবংশীরা সোনার, কামারের কাজও করে থাকে।)]

স্বাস্থ্য: জেলায় ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, টাইফয়েড যথেষ্ট আছে।

মালদহ
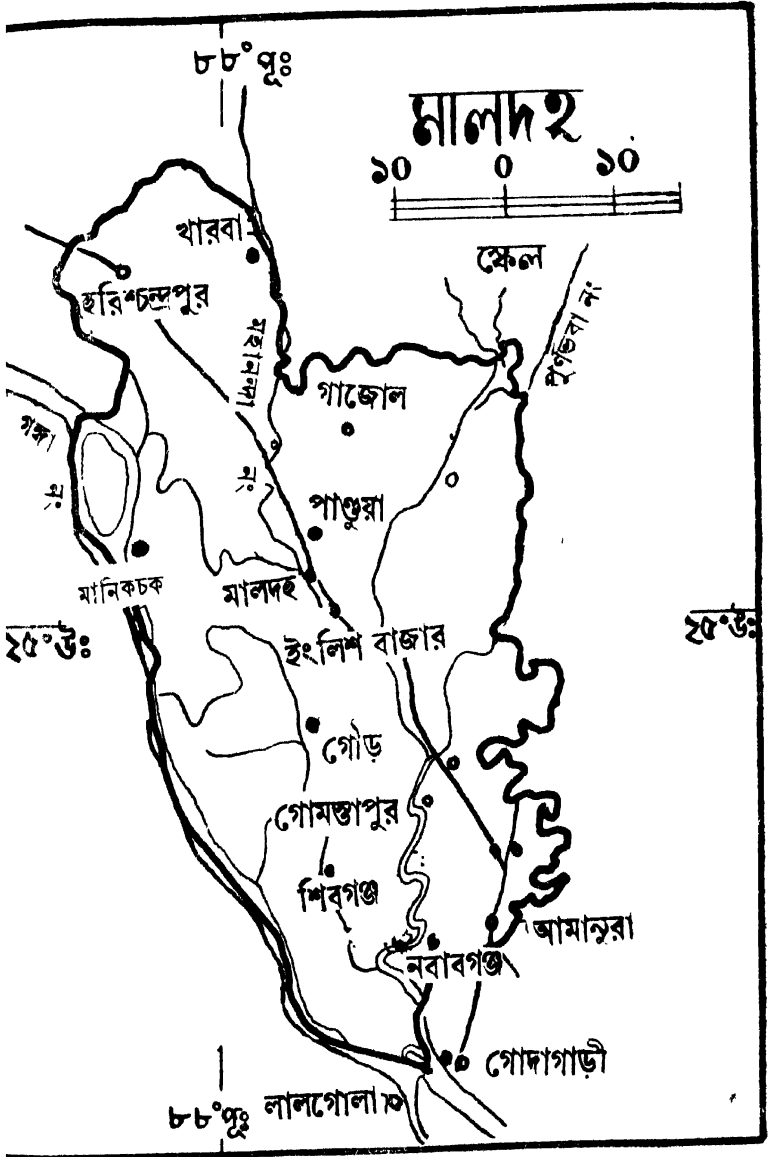
মালদহ রাজসাহী বিভাগের একটি জেলা। জেলায় কোন মহকুমা নাই।

এই জেলার থানা :—মালদহ, ইংলিশবাজার, কালিয়াচক, শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, নাচোল, নবাবগঞ্জ, মানিকচক, রাতুয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর, খারবা, গাজোল, বামনগোলা ও হবিবপুর।

মাটী :—দক্ষিণ দিক গঙ্গার পলির জন্য সবচেয়ে উর্বরা, জেলার উত্তর দিকের জমিও সরস। উত্তর ও দক্ষিণের এই দোআঁশ জমিতে দো-ফসলী শস্য হয়। বারিন্দের উঁচু জায়গা সবচেয়ে কম উর্বর, হরিপুর ও বামনগোলার মাটী নিকৃষ্ট। জেলার যেখান দিয়া টাঙ্গন ও পূর্ণভবা বহিয়া যাইতেছে তাহা কঠিন ও রক্তবর্ণ। সাধারণ জমি দো-আঁশ। ইহা দো-ফসলীর পক্ষে উত্তম।

নদনদী-জলাশয় :—বর্ষাকালে টাঙ্গন, পূর্ণভবা নদী দিয়া দিনাজপুর প্রভৃতি জায়গা হইতে নৌকা করিয়া মাল মালদহ আসে। মহনন্দার দক্ষিণ পাড় হইতে গৌড়ের পূর্ব পর্য্যন্ত সমস্ত অঞ্চল বিশাল জলাভূমি। গৌড়ের পূর্বদিকে ভাটিয়া বিলটি খুব বড়। কুতুবপুর (যাত্রাডাঙ্গা) হবিবপুর (পাথর শিশুডাঙ্গা) মালদা (সাহারোল ও রাজারামচক) থানায় বড় বড় বিল আছে। বড়দীঘির মধ্যে রূপসাগর ও সনাতন দীঘি প্রসিদ্ধ।

নদী ও পুকুরে বিশেষ করিয়া গৌড়ের কাছে বড় বড় দীঘিতে প্রচুর কুমীর ছিল। বিলের জলে ভোদড় আছে।

গাছপালা :—ভাসা জমিতে নল খাগড়া ও কম জলা জায়গায় হিজল গাছ জন্মায়। বারিন্দের জমি কটাল নামে একপ্রকার কাঁটা গাছে পূর্ণ। এখানে পিপুল, শিমুল, পাকুর, বাঁশ বেশী। পাকুরহাটের কাছে শাল, তাল, খেজুর দেখা যায়। বাবুলের কাঠ দিয়া গাড়ীর চাকা তৈয়ারী হয়।

চাষ :—জেলায় ভাদুই, অঘানী ও হৈমন্তিক এই তিন প্রকার শস্য হয়। ভাদুইএর মধ্যে ধান, পাট ও ভুট্টা, অঘানী ও হৈমন্তিক শীতের শস্য। অঘানী ধান ছড়াইয়া দেওয়া হয়। হৈমন্তিক চারা বপন করে। শীতকালে রবিশস্যের মধ্যে কলাই, খেঁসারী, যব, সরিষা, তিসি ও ছোলা করে। খেঁসারী অঘানী ধানের সহিত আশ্বিন ও কার্তিকে একত্রে বোনা হয়। গঙ্গার পলিযুক্ত অঞ্চলে ২টি রবিশস্য একত্রে বোনার চল আছে। চালের মধ্যে সুগন্ধি বাঁশমতী ও কালজিরা অতি উৎকৃষ্ট। ৪৷৷০, ৫৲ টাকা মণ।

গাজল থানায় ভাল পাট হয়। এই জেলায় তুঁত ও আম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। তুঁত গাছের চাষ যেখানে হয় তাহাকে জুয়ার বলে। জোত, ধানতলা, কাগাইছেড়া, চণ্ডীপুর, গয়েশবাড়ী, জালালপুর প্রভৃতি জায়গায়

বেশী চাষ হয়। তুঁত গাছের চাষ অনেকটা চা গাছের চাষের মতন। একবার গাছ হইলে বহুদিন থাকে। পচাকচু এই গাছ এর প্রধান সার। বারিন্দের লাল মাটীর অঞ্চল ও দক্ষিণের গঙ্গাতীরের বালিযুক্ত অঞ্চল ছাড়া সমস্ত জায়গায় প্রচুর আম হয়। গরমের সময় সমস্ত প্লাটফরমে আমের বস্তায় পূর্ণ থাকে। বাহিরে চালান যায়। মালিকেরা প্রচুর লাভবান হয়। গরীবও লাভ করে। মালদহে নিয়ম এই যে মাটীতে পড়া আম যে পায় তার কোন দাম লাগেনা। ঝড়ের সময়, মধ্য রাত্রেও যে কোন লোক আম কুড়াইবার জন্য বাগানে ঢুকিতে পারে। আমচুর, আমসত্ত্ব, আচার প্রভৃতি বিক্রয় করে। প্রায় সব বাড়ীতেই আম প্রচুর হয়।

হিমসাগর (ক্ষীরপাতিয়া) টাকায় ১৮।২০টা, গোপালভোগ আটআনায় ৫০।৬০টা খুব মিষ্টি। গোপালভোগ ও বৃন্দাবন আমের অতি সুমিষ্ট গন্ধ আছে। লেংড়া, কিসানভোগ প্রচুর পাওয়া যায়। ফজলী এক একটি ৵১, ৵২সের পর্য্যন্ত হয়। আম গাছ উঁচু জায়গায় ভাল হয়। ভাল দামী গাছে মাছের সার দেওয়া হয়। ৪ বৎসর অন্তর আমের একবার খুব ভাল ফলন হয়।

তামাক ও আখও খুব উৎপন্ন হয়।

তরিতরকারীর মধ্যে মিষ্টি আলু, বাইগন (বেগুন), লাউ, লঙ্কা, মূলা। গৌড়ের বেগুনের খুব নাম। ইহাকে গৌড়ের তাল বলে। দুই আনা সের। হরিশ্চন্দ্রপুরের কাছে গোল আলু খুব হয়, গৌরের কাছে কলাও খুব হয়।

দুধ ঃ—দুধ ও দুধের খাবার প্রচুর পাওয়া যায়। দৈ ভাল নয়। দুধ টাকায় ১৩ সের, শীতের সময় টাকায় ১৬ সেরও পাওয়া যায়। কানসাটের চমচমের খুব নাম আছে। ক্ষীর দেওয়া চমচম পাঁচ আনা ও রসগোল্লা চার আনা সের। গোয়ালারা বাড়ীতে মাখন দিয়া যায়, অনেকে উহা হইতে ঘি তৈয়ারী করেন। বাজারে ভাল ঘিও সস্তায় পাওয়া যায়।

মাছ ঃ—এখানে মাছ প্রচুর ও সস্তা। এই গঙ্গায় ইলিশ মাছ পাওয়া যায় না। ছোট মাছ—পাবদা, বাচা, পুঁটি, প্রচুর পাওয়া যায়। বড় মাছ চিতল ইত্যাদি আট আনায় ১ সের পরিমান পাওয়া যায়। লালবাগ

হইতেও মাছ চালান আসে। রাজবংশীরা মাছ ধরে। এখানে শুঁটকীর চলন নাই।

ঘর :— সাধারণ লোকেদের ঘর খড়ের চাল, দেওয়াল বাঁশের বেড়া। দালানও আছে। মাটীর ঘর নাই।

লোক :— রাজবংশী, পালিয়া ও দোয়াজয়া জেলার উত্তর পূর্ব দিকে থাকে। বিহারীদের দায়রা অঞ্চলে দেখা যায়। শেরসাবাদিয়া মুসলমানগণ মুর্শিদাবাদের শেরসাবাদ পরগণা হইতে এখানে আসে। ইহারা চাষীসম্প্রদায়, চাষের প্রণালী খুব উন্নত। ইহাদের কেহ ছুতার, কামার ও তেলীর কাজও করে। নৌকা বাওয়া ইহাদের আর একটি প্রধান কাজ। নদেগুষ্টি মুসলমান গণ জেলার দক্ষিণে মহানন্দার পশ্চিমে থাকে। উহারা উৎসবে নূতন কাপড় পরে, দেওয়াল ও অন্যান্য জায়গায় আল্‌পনা দেয়। 'বুড়িমার' পূজা করে। ইহাদের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহ হয়। চাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাঁওতালরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাঁওতালদের মধ্যে মুরুমু, কিসকু, বাস্কে, বেদিয়া এইসব ভাগ আছে। সাঁওতালরা তাহার নিজ নিজ গ্রামের সর্দারের কথা মান্য করে। নিজেদের মধ্যে ছাড়া অন্য জাতের সঙ্গে বিবাহ হয় না। ছেলে মেয়ে ভূমিষ্ঠ হইবার ৩।৪ দিন পর 'নাপতা' উৎসব করে। তখন উহাদের নামকরণ হয় ও পরে উপস্থিত সকলের বুকে ময়দা গোলা জল লাগান হয়। নিমের গুড়ার সহিত সিদ্ধ ভাত অতিথির মধ্যে বিতরণ করা হয়। রাজবংশীরাও চাষী। ইহাদের সংখ্যাও এখানে যথেষ্ট। রাজবংশীরা নিজেদের পুরাতন রাজবংশীদের বংশধর বলিয়া থাকে। স্থানীয় নাম বাঙ্গাল। তামাক ও তরিতরকারী উৎপাদনে ইহারা খুব দক্ষ, ইহারা নিজেদের মাহুত বা প্রধানকে নির্বাচন করে। ছোটখাট বিষয়ের নিষ্পত্তি মাহুত দিয়াই হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে।

শিল্প :— এখানে ডোমেরা বাঁশ দিয়া নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর ডালা, কুলা, মোড়া ইত্যাদি তৈয়ারী করে। বন হইতে মধু সংগ্রহ করা হয়। এখানকার আমের মধু অতি উৎকৃষ্ট। খেঁজুরের রস হইতে তাড়ি ও গুড় তৈয়ারী করে। আখের রস হইতেও গুড় ও আখের চাক তৈয়ারী করে। এক একটি আখের চাক আধমণ ১৫ সের পর্য্যন্ত হয়।

জেলার প্রধান শিল্প সিল্ক। পূর্বে এই সিল্ক দেশ বিদেশে যাইত।

এখানকার রেশমী ধুতি, শাড়ীর বিশেষ নাম আছে। উন্থু, গুল বিশি, বুলবুল, চশম, চাঁদতারা, কদমফুলী ম'পচর প্রভৃতি রেশমী ও রেশম সূতায় মেশান সুন্দর সুন্দর কাপড় তৈয়ারী হয়।

রেশম—কালিন্দীর তীরে, গণিপুর প্রভৃতি জায়গার ছোট পুঁড়া ও পুঁড়াদের জাত ব্যবসা। জেলায় মটকাই প্রধান অন্য রেশমও পাওয়া যায়।

নবাবগঞ্জে উৎকৃষ্ট কাঁসার বাসন তৈয়ারী হয়।

উৎসব ও সংস্কৃতি :—জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তিতে রামকেলিতে নিমাইএর পায়ের ছাপ দেখিবার জন্য অনেক বৈষ্ণব এখানে আসেন। সেই উপলক্ষে বড় মেলা হয়। ভাদ্র সংক্রান্তির মেলাতে ঢাকা মৈমনসিংহ হইতে লোকেরা নানা জিনিস বিক্রয় করিবার জন্য আসে। কানসাট কালীর নামে ঝাপরীতে প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসের প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে পূজা হয়। দৈনিক ১০।১২টা বলি হয়। পায়রাও উড়াইয়া দেওয়া হয়। মালদহে 'গম্ভীরা' লোক সঙ্গীত লোকের কাছে আদরনীয়। বিগত বৎসরের প্রধান ঘটনা অবলম্বনে কাহিনী রচনা করিয়া গান গাওয়া হয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজনের সময় তিনদিন এই উৎসব চলে। মহরম, ইদলফেতর এইসব বড় বড় পরব ছাড়া পীর মকদুমশাহ, জলাল ও কুতুব শাহের সম্মান উপলক্ষে হজরত পাণ্ডুয়া মেলা হয়।

যানবাহন :—নৌকা দিয়াই যাতায়াত বেশী হয়। বাস ও গরুর গাড়ী চলে। চাপাই নবাবগঞ্জ হইতে ট্রেণে সোজা কলিকাতায় আসা যায়। অন্য পথে মহানন্দা পার হইয়া ট্রেণে কলিকাতায় আসা যাইত। মালদহ শহরের সহিত রেলপথের সংযোগ নাই।

শহর ও গঞ্জ :—মালদহ শহরের পুরাতন নাম ইংরেজ বাজার। ইহা রেশম শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। ইহা মহানন্দার তীরে অবস্থিত। মালদহে একটি বড় চিত্রশালা আছে।

মালদহ শহর হইতে ৬ মাইল দূরে ভোলহাট গ্রামটি একটি রেশম শিল্পের কেন্দ্র।

গৌড়—বাংলার হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান যুগের রাজধানী গৌড় মালদহ শহর হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। গৌড়ে প্রাচীন ঐতিহাসিক

দ্রষ্টব্যস্থান প্রচুর আছে। সাদুল্লাপুরের প্রাচীন স্নানের ঘাট, বড় সাগ দীঘি, রূপসাগরের নিকট বড় সোনামসজিদ বা বারদুয়ারী, ভগ্নদুর্গ, দুর্গে প্রবেশদ্বার, দাখিল দরওয়াজা, কদমরসুল মসজিদ, ফিরোজমিনার, তাঁতিপাড় মসজিদ, বল্লালদীঘি প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর দ্রষ্টব্য আছে। নিয়ামৎউল্লার সমাধি কাছে টাকশাল দীঘির ধারে ছোট সোনা মসজিদের সম্মুখের পাথরের কা অতি সুন্দর। পিয়াসবাড়ী দীঘির কাছে একটি বড় রেশমের কারখান আছে।

নিমাসরাই—মহানন্দা ও কালিন্দীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। ইহার পুরাত নাম মালদহ। রেশম বা সুতার কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল।

পাণ্ডুয়া—অতি প্রাচীন রাজধানী। প্রাচীন নাম পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। ইহাবে হজরৎ পাণ্ডুয়াও বলা হয়। এখানে পীর সৈয়দ মখদুমশাহ্ ও জলাল তব্‌রিজীর সমাধি আছে। আদিনায় সুবিখ্যাত আদিনা মসজিদ দর্শনীয়।

হায়তপুর কালিন্দীর কূলে বানিজ্য প্রধান স্থান।
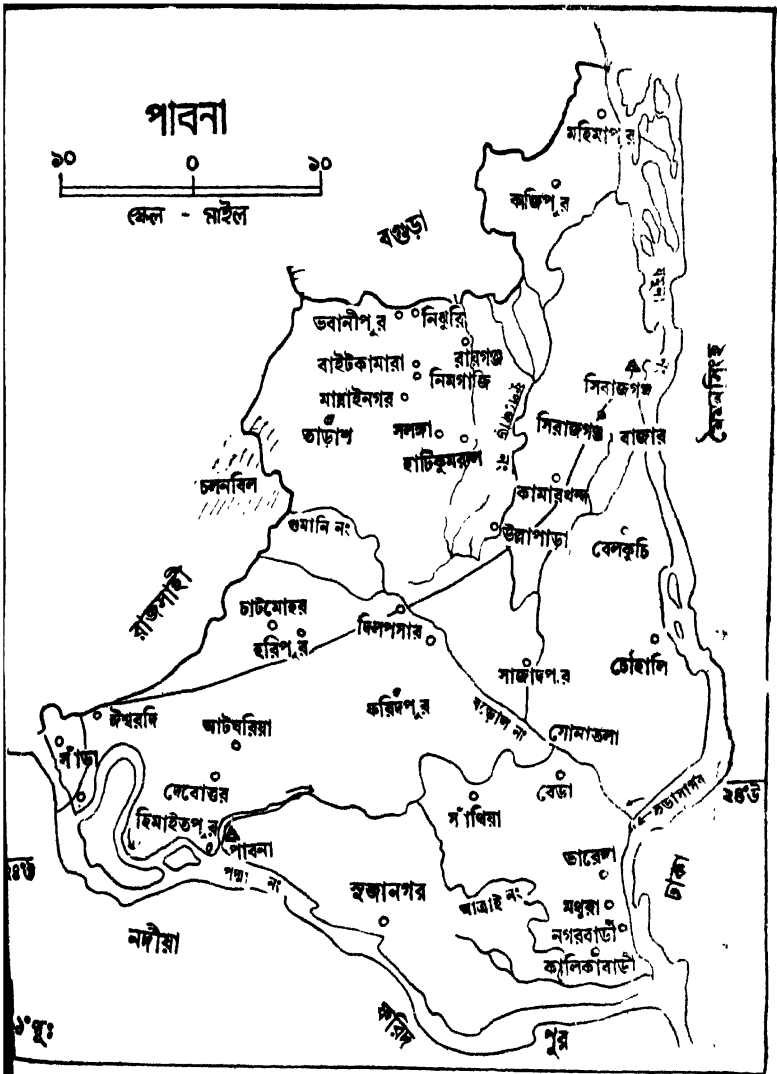
পাবনা রাজশাহী বিভাগের একটি জেলা। জেলায় দুইটী মহকুমা।

সদর মহকুমার থানা :—পাবনা, আটঘড়িয়া, সাড়া, চাটমোহর, ফরিদপুর, সুজানগর, সাঁথিয়া ও বেড়া।

সিরাজগঞ্জ মহকুমার থানা : -সিরাজগঞ্জ, সাহাজাদপুর, চৌহালি, কামারখন্দ, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ, তাড়াশ, কাজিপুর ও বেলকুচি।

মাটি ঃ—জেলার সমগ্র দক্ষিণ ভাগ এবং পূর্বভাগ নদী ও খালেবিলে ভরা। নদীতে বহু চর আছে। নদীর নিকট বা চরে দোআঁশ মাটি, অন্যত্র এঁটেল। বর্ষার পরেও এত কাদা হয় যে মোটর বহুস্থানে কাদায় একেবারে বসিয়া যায়।

রায়গঞ্জ থানার পশ্চিম ভাগ ও তাড়াশ থানার উত্তর ভাগে খিয়াড় মাটি। দত্তবাড়ী, ক্ষীরতোলি, বাইটকামাবা, ফরিদপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি খিয়াড় মাটিতে অবস্থিত।

(শুখনা উঁচু জায়গাকে "কাঠি" বলে, গোয়ালারা থাকে, সেখানে চাষও হয়)।

নদনদী ঃ—"কোল" শব্দে নদীর পরিত্যক্ত অপ্রধান ধারাকে বুঝায়। যদি বর্ষায় তাহাতে পলি পড়িয়া ভরাট না হয়, তবে তাহা বিলের মত পড়িয়া থাকে। "হালোট"—মৈমনসিংহের হাওড়, সেখানে বর্ষায় স্রোত বহে। "ডাল"—শাখা।

পাকসির কিছু দক্ষিণে পদ্মার "কোল" পড়িয়া আছে, এখন বর্ষায় সে পথেও যথেষ্ট জল চলে, ষ্টিমার সে সময়ে যাতায়াত করিতে পারে। বড়াল নদী যেখানে যমুনায় পড়িয়াছে সেই মোহনাকে হুড়াসাগর বলে, ঐ নামের কোনও নদী নাই। পাবনা সহর হইতে মথুরা যাইতে আত্রাই নামে নদী পার হইতে হয়। যমুনার ("যবুনার") স্রোতে সিরাজগঞ্জ সহরের সিকি অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

পুষ্করিণী, কুয়া ইত্যাদি ঃ—যে অংশে খাল বিল বেশী সেখানে জলের প্রাচুর্যের জন্য পুষ্করিণীর চলন কম। গ্রীষ্মকালে সেখানে পানীয় জলের অনটন ঘটে।

গ্রামে তাই নলকূপের খুব প্রাদুর্ভাব হইতেছে। কুয়ার চলন গ্রামে বেশ আছে, সচরাচর ১৫।২০ হাত গভীর করা হয়। (হিমাইতপুর গ্রামে ৩০ হাত মাটির পর বালি পাওয়া যায়। নলকূপে ১০০।১২৫ হাতের ভিতরেই জলের স্রোত পাওয়া যায়)। বর্ধিষ্ণু গ্রামে কিছু কিছু পুষ্করিণী আছে।

খিয়াড় মাটিতে ৪।৫ হাত গভীর ডোবা কাটিয়া সাঁওতাল ও বুনোরা জল তোলে। নিমগাছের দক্ষিণে জয় সাগর নামে এক বিশাল দীঘি আছে। তাহাতে ৬০।৬৫ বাঁধান ঘাট আছে। (লম্বায় আধ মাইল, চওড়ায় সিকি মাইল হইবে)। মাধাই নগরে বড় বড় পুকুর আছে। (ইঁটের ভগ্নস্তূপ,

বাঁধান ইঁটের রাস্তা, বড় বড় টিলা বাইটকামারা, মাধাই নগর প্রভৃতি প্রাচীন গ্রামে পাওয়া যায়। এগুলি এক সময় বর্ধিষ্ণু অবস্থায় ছিল।)

চাষ :—পলি পড়ে এমন অঞ্চলে পাটই ভাল হয়। কাজিপুর সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে পাট খুব ভাল। কাজিপুরে আমন এবং আউষ দুই রকম ধানই হয়। বর্ষাল ধানও হয়। জেলায় ধানও বেশ হয়। রবিশস্যের মধ্যে গম, যব, ধান, তিল হয়। তিলের তেল মাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বেশী তিল বিক্রয় করে। চরে ছোলা (ঘোড়ার খাদ্যের জন্য বিক্রয়), কলাই, মুগ, মটর, মশুর, অড়হর, খেসারিও হয়। সাধারণ চাষী মাষকলাই ও মটরডাল বেশী খায়।

তরিতরকারি :—সর্বত্র ভাল, আলু এবং কপির ও চাষ আছে। জেলায় বাঁশ যথেষ্ট জন্মে। খিয়াড় মাটিতে একচাষ, ধানের হয়। পাট হয় না, কেবল ভিটামাটিতে করে।

দুধ :—পাবনা জেলায় গরুর চলনই বেশী, দুধও খুব হয়। নিমাগাছি হইতে পশ্চিম অঞ্চলে, বগুড়া, রাজসাহীর দিকে, মহিষ ক্রমে বেশী দেখা যায়। গোয়ালারা কাঠিতে (উচু শুখনা যায়গা) গরু রাখে, চরে মুসলমান চাষীরা যথেষ্ট সংখ্যায় গরু পোষে। তাই যমুনা ও পদ্মার ধারে ধারে দুধ যথেষ্ট ও ভাল পাওয়া যায়।

মাছ :—পদ্মার ইলিশ বিখ্যাত। পদ্মা এবং যমুনা নদীতে ইলিশ ভিন্ন চাঁই মাছও প্রসিদ্ধ, পাবনার চাঁই মাছ নামকরা। পদ্মার চিথল মাছও বেশ পড়ে। যমুনা নদীতে মাঝে মাঝে মহাশোল মাছ কিছু পাওয়া যায়, তাহা খুব আদর করিয়া লোকে কেনে; পদ্মায় মহাশোল পড়ে না। বিল অঞ্চলে কৈ, মাগুর, সিঙ্গি প্রভৃতি জিওল মাছ খুব ধরা পড়ে। তাড়াশের কিছু পশ্চিম হইতে রাজসাহী জেলার মধ্য পর্যন্ত যে চলন বিল আছে, তাহাতে যথেষ্ট মাছ পড়ে। (বিলের মধ্যে চলন, গ্রামের মধ্যে কলম, কলম গ্রাম চলন বিলের ধারে অবস্থিত)।

মাছের চালান সিরাজগঞ্জ ও গোয়ালন্দ দিয়া হয়, পাকসিতে আজকাল তত মাছ ওঠে না। মাছ এক এক সময় নদীর এক এক অঞ্চলে বেশী আসে, জেলেরা তদনুসারে ধরে ও নিকটবর্তী রেলষ্টেশনের মারফত চালান দেয়।

চালানের ফলে জেলায় মাছ আক্রা হইয়া গিয়াছে। (চলন বিলে সুতার "গজ" বাঁধিয়া মাছ ধরার রীতি প্রচলিত আছে)।

:

খাবার :—পাবনার গাওয়া ঘি প্রসিদ্ধ। ঐখানকার ক্ষীর এবং ছানার তৈয়ারি "রাজভোগসই" ও "রসকদম্ব" সর্বত্র প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে। ভারেঙ্গা, মথুরা ও (নদীদ্বারা ভগ্ন) নগরবাড়ী অঞ্চলের ক্ষীর এবং দই খুব নাম করা।

জেলার সর্বত্র চিঁড়া, মুড়ি ও খই এর চলন আছে। খাগড়াই নামে চিনির পাকে ঝর ঝরে এক প্রকার মুড়কি তৈয়ারি হয়।

ঘরদুয়ার :—জেলার প্রায় সর্বত্র গরীব লোক খড়ে ছাওয়া বাংলা ঘর তৈয়ারি করে। বেড়া তিন রকমের হয়। বাঁশের (১) চ্যাগাড় দিয়া, অর্থাৎ বোনা বেড়া। (২) কাচার বেড়া (বাঁশ কেচে কেচে নেওয়া = ছেঁচা), তাহার ভিতর বাহিরে মাটি লেপে। (৩) বনের বেড়া। অনেক জায়গায় উঁচু ভিতের উপর বাড়ী করে।

গোয়াল ঘরে বা বাড়ীর চতুর্দিকে প্রয়োজন হইলে পাটকাঠির বেড়া দেওয়া হয়। যাহাদের সঙ্গতি আছে তাহারা চালে করগেট টিন, অথবা কানিস্তারা টিনও ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু টিনের বেড়ার চলন নাই।

এ জেলার (দক্ষিণে) একটি বিশেষত্ব, ধনীদের মধ্যে ইটের দালানের দিকে ঝোঁক খুব বেশী। সারা উত্তর বঙ্গের মধ্যে পাবনা শহরে পাকা বাড়ী অপেক্ষাকৃত বেশী। খিয়াড় অঞ্চলে, অর্থাৎ তাড়াশ থানা হইতে রাজসাহী জেলার দিকে সর্বত্র মাটির ঘর ও ছনের চাল। মাটির ঘর দোতলাও হয়। ধনী লোকে ছনের পরিবর্তে টিনের চাল দিয়া থাকেন। সাঁওতালদের বাড়ী মাটিরই হয়।

জ্বালানি :—কাঠ ও ঘুঁটের চলন বেশী। জেলায় জ্বালানি কাঠ যথেষ্ট পাওয়া যায়। গ্রামে কয়লার চলন খুব কম। পাটখড়ি উনুন ধরানোর জন্য গৃহস্থেরা সময়মত কিনিয়া রাখে।

রেল ও ষ্টিমারের কাছাকাছি কয়লার ব্যবহার আছে।

শিল্প :—তাঁত শিল্পের জন্য দোগাছি (পাবনা শহরের ২॥০ মাইল পূর্বে) এবং সাজাদপুর চৌহালি অঞ্চল বিশেষ প্রসিদ্ধ। হিন্দু তাঁতিরা জাতি ব্যবসা ছাড়িয়া লেখাপড়া ও চাকরির দিকে গিয়াছে, নয়ত দারিদ্র্যে ডুবিয়া গিয়াছে। তাঁতের কাজ মুসলমান জোলাদের একচেটিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বে জোলারা প্রধানতঃ মুসলমানদের পরণের জন্য সস্তা কাপড়, লুঙ্গি, শাড়ী, গামছা তৈয়ারি করিত। ১৯৪০ সাল নাগাদ জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক ইহাদের শিল্পের নূতন উন্নতি বিধান করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শে জোলারা তাল

ধুতি, শাড়ী বুনিয়া পাবনা শহরের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। সে কাপড় পছন্দসই এবং মজবুত। ফলে জোলাদের ব্যবসায় উন্নতি হইযাছে। কিন্তু হিন্দু তাঁতিরা জাত ব্যবসায় ছাড়িয়া অন্য পথ লইতেছে।

কামার, কুমার, মুচি, ধোপা, নাপিতদের অবস্থা উত্তরোত্তর অবনত হইতেছে। গ্রাম দেশে নাপিত, ধোপা এখন হিন্দুস্থানী বেশী। মুচিও সারা জেলায় হিন্দুস্থানী বেশী। হিন্দু কারিগরেরা প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতেছে। (জেলায় ম্যালেরিয়ার খুব প্রাদুর্ভাব আছে।)

হিন্দু তৈলকার নাই। সকলে মুসলমান। বলদের চোখে ঠুলি, নীচে ফুটা ও একটি বলদ। জেলায় সরিষার তেলই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়; তিল তেল মাথায় মাখার জন্য কিছু চলে।

কাঁসারি ইত্যাদির সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই, তবে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোকই কাঁসার কাজ করে। ঘর দুয়ার নির্মাণের কাজ মুসলমান কারিগরেরা করিয়া থাকে।

সাজাদপুরে কাগজ তৈয়ারি হইত। কিন্তু মুসলমান কারিগরদের সে শিল্পটি এখন মৃতপ্রায়। হিন্দু পাইত্যা জাতি শীতলপাটি করে, জেলার সর্বত্র পাটির ব্যবহার আছে। চালানি মাদুর (সপ্) সাঁওতালেরা সহর বাজারে কেনে, তাহারা খেজুর পাতার পাটিও বোনে। অপরে সেরূপ খেজুর পাতার চাটাই ব্যবহার করে না। ঝাঐল তেঁতুলিয়ার (সিরাজগঞ্জ থানা) শীতলপাটি জেলার মধ্যে প্রসিদ্ধ।

বিদেশী শিল্প :—পাবনা শহরে ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে (যথা হিমাইতপুরে ৪টি মোজা-গেঞ্জির কারখানা আছে) হিন্দু ভদ্রলোকদের পরিচালিত বিস্তর মোজা গেঞ্জির কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতা আমদানী হয়, কল প্রধানতঃ বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে। মুসলমানগণও কিছু এ ব্যবসায়ে ঢুকিতেছেন। পাবনার গেঞ্জি খরিদ করিতে ভারতবর্ষের বহু প্রদেশের দালাল আসিয়া থাকে। জাপানী কলে 'পাবনা ফিনিশ' নাম দিয়া গেঞ্জি তৈয়ারি হইয়া আসিত। পাবনা শহরের মফঃস্বলে কয়লার ইঞ্জিনে কল চালান হয়। সাঁড়াতে মাছ চালান দিবার জন্য বরফের কল আছে। সিরাজগঞ্জে পাটের গাট বাঁধার কল আছে। বিড়লা, রেলি প্রভৃতি কোম্পানীর নিজের কল আছে।

হাট, বাজার, মেলা :—জেলায় ব্যবসা বাণিজ্য প্রধান, মেলার চলন কম, পূজা পার্বণে মেলা বসে, কিন্তু ব্যবসায়ের দৃষ্টিতে তাহা বড় নয়। ঐ মেলাকে "আড়ং"ও বলে, যেমন "দুর্গাপূজায় আড়ং বোসলো।" চৈত্রসংক্রান্তিতে মেলা বসে, কিন্তু তাহাও দু'একদিন মাত্র থাকে। বেলকুচি থানায় এনায়েতপুরে পীরের মেলায় বহু মুসলমান সমবেত হয় (মার্চ মাসে)।

সকল গ্রামে প্রাতঃকালে বাজার বসেনা বটে, তবে সপ্তাহে দুদিন হাট প্রতি গ্রামেই বসে। সেইখানে লোকে আবশ্যকীয় জিনিষ কেনে ৷।১০ খানা গ্রামের মধ্যে আবার বড় বড় হাট বসে, সেখানে কাপড় চোপড়ও খরিদ করিতে লোকে আসে। বর্ষায় সর্বত্র নৌকায় চলাচল করা যায়, তখন গৃহস্থেরা ব্যবসার বড় বড় কেন্দ্র হইতে প্রয়োজনীয় সকল জিনিষ কিনিয়া লইয়া যায়। বেড়া ঐরূপ খব বড় বাজার। গোয়ালন্দ হইতে মাল সহজে নদীপথে আমদানী করা চলে। গরু বাছুরের হাট কয়েকটি আছে। আটঘরিয়া থানায় দেবোত্তর বিখ্যাত। বাঙ্গালী মুসলমান বিক্রেতা বেশী, হিন্দুস্থানীও আসে। অন্যান্য জেলার লোকও আসিয়া থাকে। গরু হাঁটাপথে আমদানী হয় বলিয়া রেল লাইনের বা নদীপথের সঙ্গে গোহাটার যোগ নাই।

বন্দর ও গঞ্জ :—সিরাজগঞ্জ : পাট, মাছ। পাবনা, চাট মোহর, বেড়া : সবরকম জিনিষ। কাজিপুরের পাট।

যাতায়াত :—মানুষ ও মালপত্র লইয়া আসার জন্য বর্ষা ছাড়া অপর সময়ে গরুর গাড়ী যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। ভবানীপুর, নিমগাছ অঞ্চল হইতে পশ্চিমে মহিষের গাড়ীও চলে। সওয়ারির (ডুলি) যথেষ্ট ব্যবহার সর্বত্র আছে (বর্ষাকালে ছাড়া, বিহারীরা সওয়ারি বয় আবার বর্ষায় দেশে চলিয়া যায়। বর্ষায় নৌকাই প্রধান বাহন।

স্বাস্থ্য :—নদীর কাছাকাছি, যেখানে বন্যায় প্লাবিত হয় সেখানকার স্বাস্থ্য ভাল। কিন্তু চাটমোহর, সাজাদপুর, তাড়াশ প্রভৃতি থানায় অতিশয় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব আছে। 'পেটটি হাঁড়ি, মাথাটি তাড়ি, তাড়াশ থানায় বাড়ী' প্রবাদ আছে।

সামাজিক সংস্কার :—ধোপা, নাপিতদের যে সকল চাকরান জমি ছিল এখন সেগুলি খাস হইয়া যাইতেছে, তাহারা জাতি ব্যবসায় ছাড়িয়া অন্য

বৃত্তি ধরিতেছে। জেলায় মধ্যবিত্ত ও জমিদার শ্রেণীর সংখ্যা ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট। ডারেঙ্গা, মথুরা, বেড়া প্রভৃতি অঞ্চলে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য আছে। দিলপসার, চাটমোহর, হরিপুর (আশুতোষ চৌধুরীর বাড়ী), প্রভৃতিতে ভদ্রলোকদের প্রাধান্য। চাটমোহর থানায় ঐ গ্রামের ২।।০ মাইল দক্ষিণে গুনাইগাছায় নবদ্বীপের মত সংস্কৃত (ন্যায়) চর্চার কেন্দ্র ছিল। হাটিকুমরুল, মাধাইনগর, বাইটকামারা প্রভৃতি স্থলে প্রাচীন কীর্তি (পুকুর, ইটের বাড়ী, মূর্তি) দেখা যায়। মুসলমান সমাজে জোলা ও তেলিরা (মোঘল শ্রেণী) অধস্তন বলিয়া গণ্য হয়। তবে বেলকুচি থানায় এনায়েতপুরে জনৈক (জোলা বা কারিগর জাতীয়) পীর সাহেবের কাছে বৎসরে লক্ষাধিক লোক সমবেত হয়, টাকা, পয়সা, গরু, ছাগল উপহার দেয়। মৈমনসিংহে তাঁহার শিষ্য বেশী। ১৫ দিন তাঁহার উৎসব চলে।

খিয়াড় জমি পূর্বে জঙ্গলাবৃত ছিল। সাঁওতাল এবং বুনোরা সেখানে জঙ্গল কাটিয়া বসবাস করার পর ভদ্রলোকও আজকাল বাস করিতেছে।

বৈশ্যসাহা (জল অচল) ও তিলিদের (জল অচল) হাতে মহাজনী, তেজারতি, প্রভৃতি ব্যবসায় আছে। সিরাজগঞ্জে মাড়োয়ারী মহাজন থাকিলেও জেলায় উপরোক্ত জাতিই প্রধান।

বগুড়া
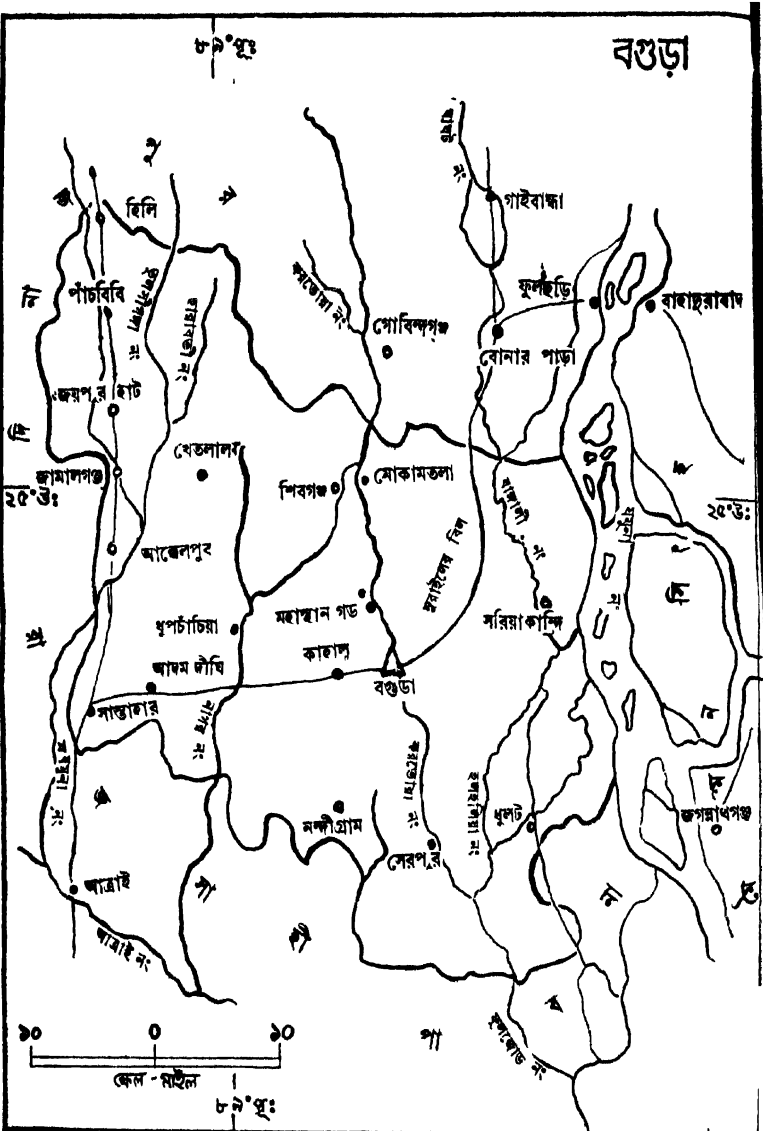
বগুড়া রাজশাহী বিভাগের একটি জেলা। জেলায় কোন মহকুমা নাই।

জেলার থানা :—বগুড়া, সেরপুর, শিবগঞ্জ, নন্দীগ্রাম, কাহালু, ধুপ-চাঁচিয়া, খেতলাল, জয়পুরহাট, আদমদীঘি, পাঁচবিবি, সারিয়াকান্দি, ধুনট ও গাবতলী।

মাটি :—খিয়াড় বিশেষ একপ্রকার গেরুয়া রঙের মাটি, যে জায়গায় চাষ হয় না সেখানে লোহার মরিচা পড়া দাগ মাঝে মাঝে দেখা যায়। এই মাটি খুব আঁঠাল। করতোয়ার পশ্চিমতটে বগুড়া থানার অর্ধেক, সেরপুরের অর্ধেক, শিবগঞ্জের সিকি অংশ, কাহালু, ধুপচাঁচিয়া, আদমদীঘি, খেতলাল, জয়পুরহাট ও পাঁচবিবি থানায় খিয়াড় মাটি। নদীর ধারে ধারে পলিমাটি আছে।

দোআঁশ পলি—সেরপুরের পূর্বভাগ, ধুনট, গাবতলী, বগুড়ার পূর্বভাগ, সারিয়াকান্দি, শিবগঞ্জের তিন পোয়া অংশ দোআঁশ পলি।

নন্দীগ্রাম থানায় কাল আঁঠাল মাটি দেখা যায়। ভিটা মাটি বলিতে উঁচু করা জমি বুঝায়। বহু জায়গায় ভিটামাটিতে আগে তুঁতগাছের চাষ হইত, আজকাল কাটিয়া সমান করা হইতেছে।

নদনদী :—করতোয়ার স্রোত পূর্বের তুলনায় খুব কমিয়া গিয়াছে। পূর্বে সেরপুরে নদী এত চওড়া ছিল যে প্রবাদ আছে যে পার হইতে খেয়াঘাটায় দশ কাহন কড়ি দিতে হইত ("দশ কাহনিয়া সেরপুর")। এখন কিছুই নাই।

জলাশয় ইত্যাদি :—খিয়াড় অঞ্চলে পুকুর খুব বেশী। খেতলাল থানায় নান্দিয়াল দীঘি বিখ্যাত। পলিতে পুকুর খুব কম, কুয়ার চলন বেশী। পলির দেশে মাটির পাট আগাগোড়া বাঁধিয়া কুয়া করে, নীচে ডবল দেয়, উপরে একটি করিয়া। খিয়াড় অঞ্চলেও যথেষ্ট কুয়া আছে, তবে তাহাতে শুধু জলের জায়গাতে পাট দেয়, অন্যত্র আবশ্যক হয় না। (ধুনটে পুকুর টিঁকে না, সারিয়াকান্দিতে তবু হয়।)

চাষ :—খিয়াড় মাটিতে আমন ধান (রোপা) প্রধান শস্য, ("শালনে" ধান খুব সুগন্ধ ও প্রসিদ্ধ) অল্প আউশ হয়। পলিতে পাটই ("কোষ্ঠা") প্রধান ফসল, তাহা ছাড়া বড় নদীর ধারে চৈতালি ফসলও করে। ধান যাহা হয় তাহার মধ্যে আউশ এবং আমন দুইই আছে। বোনাই বেশী, কিছু রোপা।

পূর্বভাগে (পলি) খেসারির ডাল বেশী। মাষকলাইও হয়, চরে কিছু কিছু মুগ কলাই উৎপন্ন হয়। পটল পাঁচবিবি ও আদমদীঘিতে পলির মধ্যে খুব হয়, আক্কেলপুর ও জামালগঞ্জ হইতে চালানও যায়। ১৫।২০ বৎসর

হইতে (বড় বন্যার পর) আদমদীঘির পূর্বভাগে আলু ও টোমাটোর চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সহরে আলুর চাষ অনেক দিন হইতে আছে।

তৈলবীজের মধ্যে ধুনট থানা হইতে (পিঠায় ব্যবহারের জন্য) কৃষ্ণতিল চালান যায়। খিয়াড় এবং পলি, দুই দেশেই ভিটামাটিতে (অর্থাৎ উঁচু জায়গায়) সরিষা উৎপন্ন হয়। পলিতে বিলেও সরিষা বোনে, তখন সেখানে জল থাকে না। আখের চাষ মাঝামাঝি রকমের।

ফল :—পাঁচবিবি, খেতলাল, জয়পুরহাটে—কাঁকুড় ও তরমুজ খুব ভাল। চরের জমিতে বড় হয়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত পানসে আস্বাদ হয়। আম, আনারস, কলা সান্তাহার, উভয় অঞ্চলেই হয়। খিয়াড়ে ফল ছোট হইলেও মিষ্ট বেশী, পলিতে বৃদ্ধি বেশী কিন্তু মিষ্টতা কম। পলির কলায় বিচি হইয়া যায়। ধুপচাঁচিয়া, আদমদীঘি ও খেতলালে ধানের পর "মিঠা লাউ" এবং বিলাতি কুমড়া (মাটির উপর হয়) খুব ভাল চাষ হয়। অল্প পরিশ্রমে গৃহস্থ যথেষ্ট লাভবান হয়। ছোট করেলা ও খুব হয় ঐ সময়।

বাঁশ :—উভয় অঞ্চলে বাঁশ যথেষ্ট হয়। খিয়াড়ের বাঁশ ছোট ও শক্ত, পলির বাঁশ মোটা, নরম ও সহজে ঘুন ধরে।

দুধ :—গরুর জাত ভাল নয়। আকারে ছোট, দুধ অল্প, ফলতঃ আক্রা। [মুসলমান চাষী—গাইএর সাহায্যে চাষ করে, হিন্দুরা করে না।] জেলায় গোচারণ জমি নাই বলিলেই হয়। ধুনটে গাই দিয়া চাষও করে, দুধও প্রয়োজন মত দেয়।

খাবার :—চিড়া, মুড়ি, মুড়কির চলন বেশী। হাটে যথেষ্ট বিস্কুট বিক্রয় হয়। ঢাকার হিন্দু রুটিওয়ালা এবং মুসলমান কারিগরে করে।

গুড়—আখের গুড়ের বেশ চলন আছে; ৴১ সেরের ঢিমা হয় (চাকা)। সিরাজগঞ্জ থানায় মোকামতলায় ও জামালগঞ্জে ঢিমা প্রসিদ্ধ। পাঁচবিবি থানায় দানাদার গুড়ও বেশ ভাল। যশোহর জেলার অধিবাসী, (রংপুর জেলায়) সরকারী সেরেস্তাদার, জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক ৩০।৪০ বৎসর পূর্বে খেজুর গাছ লাগাইবার খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার ডাক নাম "খর্জুরানন্দ স্বামী" হইয়া যায়। তাঁহার চেষ্টার পর ক্রমে ক্রমে এ জেলাতেও খেজুর গাছ বাড়িতেছে। বগুড়া শহরে ভারে ভারে আজকাল খেজুর রস বিক্রয় হয়, তাহাতে লাভ বেশী। গুড় কম হয়।

মাছ :—মোটের উপর জেলায় মাছ খুব বেশী নয়। যমুনায় রুই, কাতল বিখ্যাত রংপুর জেলায় ফুলছড়ি হইয়া চালান যায়। করতোয়ার রাইখর (রাখলা) মাছ সুস্বাদু। পুকুরেও অল্প সংখ্যক বিলে কিছু কিছু মাছ স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে ধরা পড়ে। আজকাল রাজসাহী হইতে মাছের ডিম চালান আসে, লোকে মশারির মধ্যে করিয়া (অল্প ডুবাইয়া) পুকুরে ছাড়ে, মাছ একটু বড় হইলে নির্ভয়ে বাহির হইয়া যায়।

ঘর :—পলির দেশে কাশ (কেশে), পাটখড়ি, কঞ্চি, (নদীর ধারে) নলের বেড়া করিয়া তাহার উপর মাটি লেপিয়া দেয়। কিছু ছেঁচা বেড়াও আছে। গরীবে কাশ ও ছনের চাল দেয়। টিনের চলন খুব। সিলিংকে 'ছাদ' বলে। ছাদের উপর যেখানে জিনিষ রাখে তাহাকে 'কোঠা' বলে। সব বাড়ীর চারিধারে আব্রুর জন্য মাটির দেওয়াল থাকিবেই, পূর্বাঞ্চলে সাধারণ লোকের পরদা কিছু কম। পূর্বদিকে প্রত্যেক বাড়ী পূর্বমুখী করা হয়, যেন সকালে রোজ উঠিলেই পাটের উপর রোদ পড়ে, তাহা শুকানোর সুবিধা হয়। পাটখড়ির বেড়া দিয়া বসত বাড়ী ঘেরে, তাহাও প্রায় ভাঙ্গা। ধনীদের বেড়া চ্যাগাড় এবং ধাড়া দিয়া করে। চ্যাগার স্থানীয় বাঁশ ফাড়িয়া বাঁখারিকে জলে ফেলিয়া (ইহাকে "পেনেট করা" বলে) পরে টুইল বোনা হয়। ধাড়া অন্যরকম। বাঁশকে সরু সরু করিয়া ফাড়িয়া সরু সরু চৌচ তোলে ইহাকে বাঁশের তেঁওয়াল তোলা বলে)। তাহার সাহায্যে টুইল চ্যাটাই বোনে। টুইল = "তেড়চি বোনা"।

খিয়াড়ে মাটির ঘরই হয়। চাল পলি অঞ্চলের ন্যায় নহে, সবই ধানের নাড়া (আউর বলে) দিয়া ছায়, ২।৩ বৎসর চলে। ("খড়" বলিতে গরু দিয়া মাড়ান, অর্থাৎ পোয়াল)।

গরীবে চালানি সপ (মাদুর) ব্যবহার করে। পাটির চলন বেশী, সিরাজগঞ্জ অঞ্চল হইতে চালান আসে।

জ্বালানি :—বাঁশের ও গাছের পাতা, কাঠ, ঘুঁটে (বড়) ঘসি (এলোমেলো গড়নের) প্রধানত চলে। সহর বাজারের কাছে, গঞ্জে, মিঠাইওয়ালাদের দোকানে, বড় গৃহস্থের বাড়ীতে কয়লার চলন আছে।

শিল্প :—কামার, কুমোর, সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। ধুপচাঁচিয়ার কোদাল ভাল। আগে আসো গোলার বঁটি ইত্যাদির কারিগর নামী ছিল;

এখনও মন্দ হয় না। হিন্দু তাঁতি মশারি, গামছা বোনে, জেলায় চালানি মালই বেশী। মুসলমান জোলা মশারি, গামছা এবং মুসলমান মেয়েদের জন্য "ছ্যাওটা" বোনে। প্রত্যেক ছ্যাওটা ৫ হাত লম্বা হয়, নীল রং করা থাকে। মেয়েরা দুখানি করিয়া পরে। "মেয়ে কত বড় হলো?" "দো কাপড়ার বয়স হলো।" অর্থাৎ বয়স হইয়াছে (নোয়াখালী তুলনায়)। এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে, সস্তা শাড়ী আজকাল চলিতেছে। কুষ্টিয়া, কুমারখালি হইতে চালান যায়। হিন্দু কাঁসারি কিছু সেরপুরে আছে; গন্ধবণিকেও এই ব্যবসায় করে। বগুড়ার সংলগ্ন পল্লীতে রূপার গহনা যথেষ্ট তৈয়ারি হয়। মুসলমান কারিগরেরা ইহা গড়িয়া মৈমনসিংহে চালান দেয়। কাপালি জাতি জেলায় পূর্বভাগে চট বোনে, তবে সে শিল্প মৃতপ্রায়। বগুড়া থানাতে কিছু গরদ হয়, পূর্বে খুব বেশী হইত। বগুড়া সহরেও থান, শাড়ী, চাদর তৈয়ারি হয়। পাঁচবিবিতে আখ মাড়াইএর জন্য বেলচা ঢালাইএর কারখানা হইয়াছে, ইহা জনৈক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দ্বারা পরিচালিত।

হাট, বাজার, মেলা: বগুড়া—ধান, চাল, পান। হিলিতে (এখন দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ১৪টি চালের কল আছে। জেলায় অন্যত্রও আছে। আদমদীঘি থানায় গোপীনাথপুর এবং শিবগঞ্জ থানার পুনটে মেলা হয়। উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। মোকামতলা—গুড়। শিবগঞ্জের মধ্যে মহাস্থানের মেলা (চৈত্র মাস) বেশ বড়।

যাতায়াত:—পথঘাট ভাল। বর্ষায় নৌকায় চলাচল। গরুর গাড়ীর চলন কমিয়া গিয়াছে। মোটরে সাইকেলে খুব যাতায়াত। সওয়ারি পাল্কি আগে খুব বেশী ছিল, এখন নাই বলিলেই হয়।

সামাজিক সংবাদ:—মেটেল জাতি (মুচি শ্রেণী) এখন গরু "ছোলে" খালে না, বাঁশের তোঁয়াল তুলিয়া ধাড়া বুনিয়া বেচে। সাধারণ গৃহস্থেও পানের চাষ করে। কাপালিরা চট বোনে, সারিয়াকান্দি ও ধুনটে (এণ্ডি) সাধারণ গৃহস্থ (যথা কাপালী ও রাজবংশী) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি মধ্যবিত্ত- প্রধান গ্রাম শেরপুর, চাঁপাপুর (ধুপচাঁচিয়া), আদমদীঘি, মহেশপুর (কাহালু) ও রায়কালী (ধুপচাঁচিয়া)। সান্তাহার মাহিষ্য প্রধান অঞ্চল। জেলায় বৈদ্য নাই বলিলেই চলে। (কোচবা) রাজবংশীরা তপশীলি জাতির মধ্যে সংখ্যায় বেশী। তাহাদের এবং ম্যাচ ও খ্যানাদের চেহারায় মোঙ্গোল প্রভব স্পষ্ট। মেটেলরা ময়লা এবং চেহারা অন্যরূপ। এই চারি জাতিই এখন ক্ষত্রিয়

হইবার চেষ্টা করিতেছে। জেলার চাকরি—আদিতে পূর্বে ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলের লোকের প্রাধান্য ছিল। আজকাল তপশীলী ও মুসলমানদের প্রভাব বেশী। তেজাবতি, মহাজনি, ব্যবসা বাণিজ্যে মুসলমানই প্রধান, হিন্দু সামান্য। বস্ত্র ব্যবসায় মাড়োয়ারীদের হাতে। কাশীতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে বগুড়া অধিবাসী অনেক আছেন। মুসলমান আমলে তাঁহারা সম্ভবতঃ জেলা ছাড়িয়া চলিয়া যান।

রেশম কীট পালন ও রেশম উৎপাদন এক্ষণে পুড়া (পুণ্ড্র বা পুণ্ডারিক) দিগের ব্যবসা (বগুড়ার ইতিহাস, পৃঃ ১৮৫)। পুতারি বা পুড়ো মালদহে ৮০০০ (১৯০১), আগে গুড় করিত (বিষ্ণুপুরান), তার থেকে গৌড়।

সংস্কৃতি মণ্ডল :—সংলগ্ন জেলার প্রভাবে কিনারায় ভাষার কিছু কিছু ভেদ পরিলক্ষিত হয়, যেমন সারিয়াকান্দির পূর্বে ময়মনসিংহের প্রভাব স্পষ্ট।

রংপুর
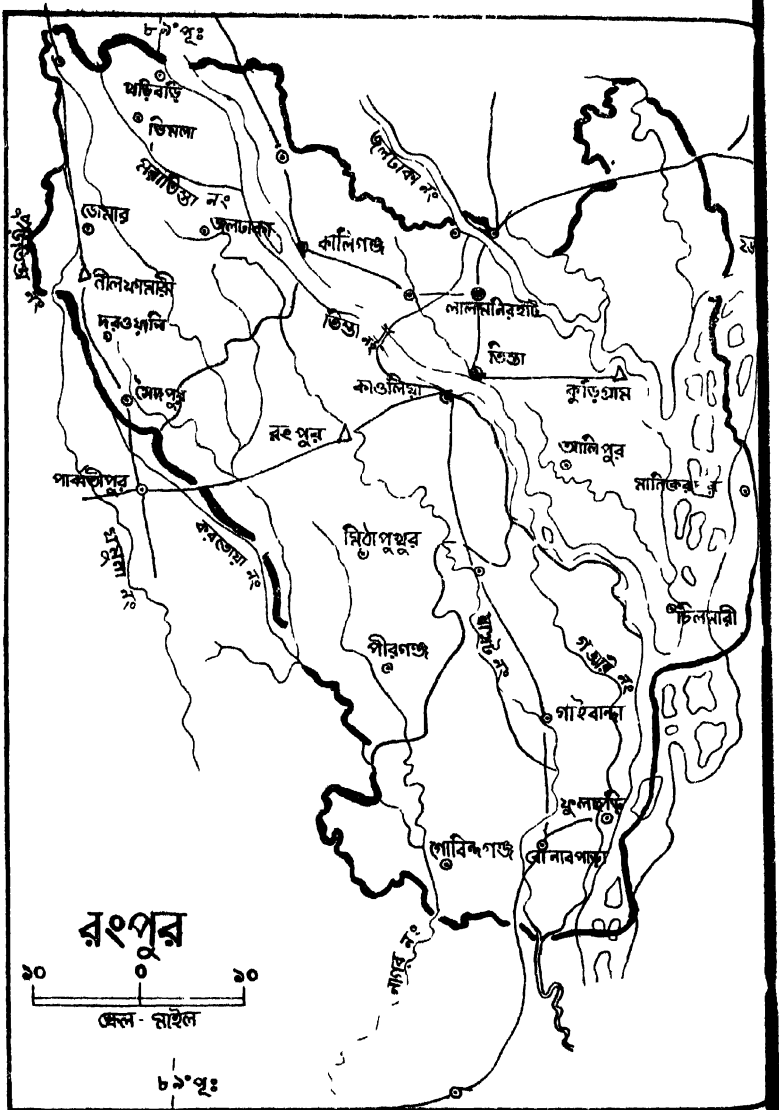
রংপুর রাজশাহী বিভাগের একটি জেলা। জেলায় চারিটি মহকুমা।

সদর মহকুমার থানা : রংপুর, পীরগাছা, কাউনিয়া, গঙ্গাছড়া, বদরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ ও কালিগঞ্জ।

নীলফামারী মহকুমার থানা :—নীলফামারী, ডিমলা, ডোমার, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ, সৈদপুর।

কুড়িগ্রাম মহকুমার থানা :—কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী, ভুরুঙ্গমারি, উলিপুর, রাহুমারি ও চিলমারি।

গাইবান্ধা মহকুমার থানা :-গাইবান্ধা, গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ি, শাখাটা, ফুলছড়ি, শাদুল্লাপুর ও সুন্দরগঞ্জ।

মাটি :—জেলায় পলিমাটি বেশী, তাতে বালির ভাগ কম বেশী আছে। চিলমারি অঞ্চল দোআঁশ। সর্বত্র খুব উর্বরা। নদীর ধারে বালি। মোগলহাট কিছু আঠাল এবং দিনাজপুরের সংলগ্ন বদরগঞ্জে লাল মাটি দেখা যায়।

নদনদী :—তিস্তা নদী যেখানে ব্রহ্মপুত্রে মিশিয়াছে তাহার দক্ষিণের অংশের নাম যমুনা (যবুনা)। তার অল্প দক্ষিণে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের "সোতা" পূর্বদিকে চলিয়া গিয়াছে। সেই মুখটিকে "কোদাল ধোয়ার মুখ" বলে। শীতকালে তাহা সময়ে সময়ে ব্রহ্মপুত্র (অর্থাৎ যমুনা) হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। নদীতেও বেশ জল থাকে।

পুকুর, কুয়া ইত্যাদি :—পুকুর জেলায় খুবই কম, কেননা জল শুকাইয়া যায়। বড় দীঘি নাই বলিলেই চলে, কুয়ার চলন বেশী। ৪।৫ বা ৭।৮।১০ হাতেই জল পাওয়া যায়। কাটাইবার খরচ ৩।৪ টাকা হইতে ১৫।২০ টাকা পড়ে। মাটির পাট দেওয়াই রীতি, কিন্তু সস্তা করিবার জন্য তামাকের ক্ষেতে অনেক সময়ে কুয়া কাটিয়া তাহার মধ্যে বাঁশের একটা গাছ ঘেরা বসাইয়া দেয়। (চাষীরা বালতির সাহায্যে তামাক খেতে কুয়া হইতে ছেঁচ দেয়।) (চিলমারিতে মাড়োয়ারী ব্যবসাদারগণ একটি বড় ইঁদারা নির্মাণ করিয়া দিয়াছে।)

কৃষিজ দ্রব্য :—গাইবান্ধা মহকুমায় পাট প্রধান, তামাক নীলফামারি এবং সদরে, আলু জেলার সর্বত্র হয়, ধান অপেক্ষাকৃত কম। মোগলহাটা অঞ্চলে কিন্তু ধান ও সরিষা প্রধান। সরিষা জেলায় যথেষ্ট হয়, চিলমারি, রাহুমারিতেও খুব বিক্রয় হয় কিছু কিছু আখও উৎপন্ন হয়। তাহা ছাড়া মুগ, মুশুরি, খেসারি প্রভৃতি ফসলও কিছু কিছু হয়। (ধানের মধ্যে চাষীরা মোটা রাখিয়া আয়ের জন্য মিহি বেশী বিক্রী করিয়া দেয়।)

তেল :—রংপুরের সরিষার তেল বিখ্যাত। (চোখে ঠুলি এক বলদ, ও

ফুটো) (মোগলহাটে রাজবংশীরা তেল করে, মুসলমান নয়।)

দুধ :—এদিকে মহিষের যথেষ্ট চলন আছে (মহিষ দিয়া লাঙ্গলও চালান হয়।) গ্রামে দুধ সস্তা খুব পাওয়া যায়। কাঁচা দুধের দই এদিকে খুব চলে, সময় সময় বাজার বোঝাই হইয়া যায়। ঘি করিয়া রাজবংশী এবং মুসলমান চাষীগণ কিছু কিছু বিক্রয় করে। চিলমারি অঞ্চলে দুধের প্রাচুর্য থাকিলেও খুব সস্তা নয়। (দুধের খাবারের তেমন চলন নাই।)

খাবার :—দুধের খাবার শহর বাজারে বেশী। রংপুর, কুড়িগ্রাম, চিলমারি প্রভৃতি স্থানে পাবনা, মৈমনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার গোয়ালা বা ময়রা আসিয়া এখানে দুধ ও খাবারের কারবার করে। রংপুরে চিঁড়া খুব ভাল। গুড় মুড়ি প্রভৃতিও বেশ হয়। তবে মুড়কি বোধ হয় কিছু কম।

মাছ :—জেলার পূর্বভাগে মাছ প্রচুর; রুই, মিরগেল, ঢাইন, কোরাল (ভেটকির মত কিন্তু খুব বড়) কুরসা, বাউস, (কালবোস), নন্দিনা—(রুই এর মত রং) ও কিছু ইলিশ পাওয়া যায়। বিলের মাছ এ জেলায় কম। ব্রহ্মপুত্র নদীতে মাছ ধরার সত্ব বিক্রয় হয়। (শান্তিবাবু নামে জনৈক জমিদারের সত্ব ফুলছড়ি ঘাট হইতে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত, তাদের আয় বৎসরে ৭০।৮০,০০০ টাকা। গভর্ণমেণ্টকে কত দিতে হয় জানা নেই। এঁদের কাছে আবার ছোট জেলেরা ইজারা নেন। চিলমারির জনৈক বড় জেলের আয় বার্ষিক ৮০০০ টাকা।)

রাজবংশী ও মুসলমানদের মধ্যে চালানি এবং তিস্তার ধাবে [যথা 'তিস্তাতে'] তৈরী করা শুঁটকির চলন আছে। তাছাড়া শাল, বোয়াল প্রভৃতি মাছ ছাইএর মধ্যে ৫।৭ দিন পুঁতিয়া রাখিয়া তারপর তুলিয়া পুড়াইয়া খায়। এটি রাজবংশীদের বিশেষ প্রিয়। রাজবংশী ও মাহিষ্যদের মধ্যে কাছিম খাওয়ার খুব চলন আছে।

ঘর :—মাটির ভিটার উপরে বাড়ী হয়। গাইবান্ধা মহকুমায় গরীবে পাটখড়ি বা 'বন' নামক ঘাসের বেড়া দেয়, তার চেয়ে অবস্থাপন্নেরা বাঁশের বেড়া দিয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে বেড়ার উপরে মাটি লেপিয়া দেয়। জেলায় সাধারণ লোকের দোতালা ঘরই বেশী, উলুখড়ের চলন নাই, ধানের খড় দিয়ে ছায়। বন্দরে [যেমন চিলমারিতে] টিন বেশী, অন্যত্র টিন খুব

কম। বাহিরের লোকে দালান কিছু কিছু নির্মাণ করিলেও জেলায় সাধারণতঃ দালান অত্যন্ত কম। শহরগুলিতে দালান বাড়িতেছে।

ঘরের সরঞ্জাম :- সপের চলন আছে, বেশ বড় বড তৈয়ারী হয় ও চালান যায়। পাটির ব্যবহার নাই বলা চলে।

জ্বালানি :—শহরে কিছু কয়লা চলিলেও জেলায় কাঠ, খড়ই বেশী।

শিল্প :—রাজবংশীদের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে [বিধবারা বিশেষতঃ] তাঁত বোনে। কিছু কিছু রেশম কীট পালে, তুঁতের পাতা বা কুলগাছের পাতা খাওয়ায়।

রংপুর জেলায় অনেক জায়গায় বেশ ভাল সতরঞ্চি তৈরি হয়। কাঠের বারকোষ, হাতা প্রভৃতির যথেষ্ট ব্যবহার আছে। বিক্রয়ও বেশ হয়। তেলের কাজ চিলমারির দিকে মুসলমান কলুরা করে, মোগলহাট, রংপুর প্রভৃতি জায়গায় রাজবংশীরা করে। আসামের মত নমঃশূদ্র শ্রেণীর [জলচল নয়] জাতি করে [?]। রংপুরে বেতের চেয়ার, মোড়া, টেবিল প্রভৃতি খুব ভাল হয়—[রাজবংশী], অন্যত্র বিক্রয়ের জন্য চালান যায়। মৈমনসিংহের কি ছুকাঁসারি চিলমারি—অঞ্চলে ব্যবসায় করে।

বিদেশী শিল্প :—রংপুরে আমেরিকান কর্মাধ্যক্ষের দ্বারা চালিত (বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান) সিগারেটের কল ছিল, পরে ঐ কাজে বাঙ্গালী নেওয়া হয়। এখন উঠিয়া গিয়াছে। লালমনিরহাট, গাইবান্ধায় চালের কল আছে। রংপুর শহরে তেলের কল আছে।

হাট :—(১) রংপুর শহরের দঃ-পূঃএ আলমনগরে খুব বড় হাট বসে। সব রকম জিনিষ বিক্রয় হয়।

মেলা :—(১) বদরগঞ্জে একমাস ধরিয়া (শীতকাল) খুব বড় মেলা হয়, তাহাতে মহিষ, গরু, ঘোড়া ও বহু উট (মুসলমানগণ কোরবানি করে) বিক্রয় হয়।

(২) লালমনির হাটে উপরোক্ত জন্তু ছাড়া কাঠের জিনিষ ও তাঁতের কাপড় খুব আসে। ১৫ দিন হয়।

(৩) নীলফামারি হইতে ৩ মাইল দূরে দরওয়ানিতে ঐ ছাড়া

সতরঞ্চি বিক্রয়ের জন্য যথেষ্ট আসে। সকল মেলাতে বেশ্যাগণ বহু সংখ্যায় আসিয়া থাকে।

(৪) চৈত্রমাসে বাসন্তী পূজার অষ্টমীতে তিস্তা ব্রহ্মপুত্র সঙ্গমে স্নানে ৭০।৮০০০০ লোক আসে।

বন্দর :—কুড়িগ্রাম মহকুমা : (১) তিস্তা—তামাক, শুঁটকি, ধান, আলু। (২) (৩) (৪) কুড়িগ্রাম, চিলমারি, উলিপুর – ঐ। চিলমারিতে পাটের খুব বড় ব্যবসায় আছে (মাড়োয়ারী খরিদ্দার বেশী, কিছু বাঙ্গালী আছে)। চিলমারি ও (৫) রাহুমারিতে সরিষা যথেষ্ট বিক্রয় হয়। (৬) রাহুমারির নিকট মানিকের চরে গারো পাহাড়ের পা' তুলা, ধান খড়িকাঠ খুব নামে। অন্য দিক থেকে বিক্রয়ের জন্য লঙ্কা যথেষ্ট যায়।

নীলফামারি মহকুমা : (৭) ডোমার (৮) দরওয়ানি, (৯) নীলফামারিতে পাট ও তামাক প্রধান। দরওয়ানির মেলায় সতরঞ্চি বিক্রয় হয়। পার্শি ও সিন্ধী ব্যবসায়ীগণ তামাক খরিদ করিতে আসেন।

গাইবান্ধা মহকুমা :—(১০) গাইবান্ধা (১১) নলডাঙ্গা, (১২) পলাশবাড়ীতে পাট প্রধান। (১৩) সুন্দরগঞ্জে ধান।

সদর মহকুমা :—(১৪) মহিগঞ্জে বড় ব্যবসার জায়গা সতরঞ্চি, তামাক, আলু যথেষ্ট চালান হয়। (১৫) বদরগঞ্জ-পাট, তামাক, (১৬) পীরগাছা-পাট, তামাক, (১৭) কাউনিয়া-পাট, তামাক, আলু। (১৮) মোগলহাট-তামাক, পাট, ধান, সরিষা। মোগলহাট হইতে মগ (আরাকানি, বর্মীরা) তামাক কিনিয়া একেবারে নৌকায় লইয়া যায়। (মোগলহাটের কাছে কুচবিহারের মধ্যে দিনহাটা চালের খুব বড় বাজার।)

যাতায়াত :—গরুর ও মহিষের গাড়ী প্রধান। গাড়ীগুলিও বেশ ভাল। মফঃস্বলে কাঁচা রাস্তা বেশী। রেল ছাড়া ফুলছড়ি, কুড়িগ্রামে ষ্টীমার স্টেশন আছে।

সামাজিক-আর্থিক সংবাদ :—গাইবান্ধা অঞ্চলে পুরাণ ব্রাহ্মণ বসতি আছে। দোকান, ব্যবসা, বাণিজ্য বেশীর ভাগ অন্যান্য জেলার লোকের হাতে, যথা—পাবনা, মৈমনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর। মুসলমানদের মধ্যেও অল্প লোক পাটের বিক্রয় কেন্দ্রে কাজ করে, নয়ত চাষী বেশী।

উকিল, মোক্তার, জমিদারদের মধ্যে পাবনা ছাড়া ঢাকা, বরিশাল, মৈমনসিংহের লোক অনেক আছেন। শহরগুলিতে ঐজন্য ব্রাহ্মণ কায়স্থদের সংখ্যা বেশী। ব্রাহ্মণ জমিদারের সংখ্যা বহু। রাজবংশীরা কিছু অলস। চাষবাস ছাড়া মাছ বিক্রয়, ধোপা, ছুতার, তাঁতের ও বেতের কাজ, নাপিতের বৃত্তি, সোনার কামারের কাজ সবই গ্রহণ করে। রাজবংশী জোতদারও অনেক আছেন, মুসলমান জোতদার অপেক্ষা এদের মোটের উপর টাকা বেশী। ব্রাহ্মণাদি চাকুরীজীবী বাদে তিলি, সাহারা এ জেলায় ব্যবসার জন্য অনেক আছেন।

সামাজিক সংবাদ :—রাজবংশী জাতের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে। এই জাতি ও বেহারা জাতির মধ্যে আফিমের চলন আছে। চিলমারিতে রাজবংশী মেয়েরা শাড়ীই পরেন, তবে গ্রামে হাঁটু পর্যন্ত ছোট কাপড় ও বুকে ডোরাদার গামছা পরার রীতি আছে। [আসামে মেচ, রাভা ও গারোদের মত।] পুরুষেরা গ্রামে লেংটি পরিয়া থাকেন, কোথাও যাইতে হইলে ধুতি পরেন। মেয়েরা খুব তামাক খান। মুসলমানদের মধ্যে রাজবংশী মেয়েদের উপর অত্যাচার করার জন্য বছরের একটা সময় অনেক মকদ্দমা হয়। জেলায় বেশ্যাবৃত্তি হয়ত তুলনায় কিছু বেশী হইবে। [বৃষ্টি না হইলে রাজবংশী মেয়েদের মধ্যে গভীর রাত্রে মাঠের মধ্যে একটি ডাল পুঁতিয়া উলঙ্গ হইয়া নাচা ও মাথা কোটার একটি ব্রত প্রচলিত আছে। নগেন্দ্রবাবু আসামের গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলায় বৃষ্টির জন্য এরকম একটি ব্রতের কথাও শুনিয়াছেন।] [জলঢাকা নামক স্থানে বেশ্যাপল্লীতে রাজবংশী মেয়েদের মধ্যে এখনও মহীপালের গীত গাওয়া প্রচলিত আছে।]

জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি রাজশাহী বিভাগের একটি জেলা। জেলায় দুইটি মহকুমা।

সদর মহকুমার থানা :—জলপাইগুড়ি, রাইগঞ্জ, বোদা, তেতুলিয়া, দেবীগঞ্জ, ময়নাগুড়ি, নাগরাকাটা, ধুবগুড়ি, মাল, মিটিআলি ও পাটগ্রাম।

আলীপুর মহকুমার থানা :—আলীপুরদুয়ার, কুমারগ্রাম, ফালাকাটা, মাদারিহাটা ও কালচিনি।

মাটি :-পলি, বালি ও দোআঁশ। দুয়াস অঞ্চলে জমি খুব উর্বরা। জেলার বিল নাই, ডাঙ্গা দেশ।

জল :—পুকুর টিঁকে না, কুয়ার চলন বেশী।

চাষ :—তামাক—পাটগ্রাম, ফালাকাটা, দেবীগঞ্জ অঞ্চলে বেশী হয়। পাট—সারা জেলাতে হয়, তবে দেবীগঞ্জ, পচাগড়, পাটগ্রামে বেশী। ধান পাটের চেয়ে বেশী হয়। সরিষা, আলু—দুয়ার্স অঞ্চলে বেশী হয়। আলিপুর দুয়ারে চায়ের বাগান আছে, সদরে কিছু। কোন কোন বাগানে কমলালেবু ও তুলার চাষ হয়।

তৈল :—চালানী সরিষার তৈলই বেশী।

দুধ :—উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

মাছ :—স্থানীয় খুব কম, চালান বেশী আসে। নদীতে মহাশোল, বোরা প্রভৃতি মাছ ওঠে।

ঘর :— মাটির দেওয়াল হয় না, দালান খুব কম। বাঁশের বেড়ার চলন বেশী, তাহা 'কাঁটিয়া' (ছেঁচে) দেয়, চটা তুলিয়া বুনিয়া, 'ধারার' বেড়াও চলে, তাহাতে মাটি লেপে না। এতদ্ভিন্ন কেশে, ভামান প্রভৃতির বেড়া করে, তাহার উপরে মাটি লেপে। টিনের বেড়া অবস্থাপন্ন গৃহস্থে দিয়া থাকে। চাল টিনের বা ছনের। (ধানের খড়ের চলন নাই ?)

জ্বালানী —মফঃস্বলে কাঠ, শহরে কয়লা।

শিল্প :—কুলু মুসলমান, হিন্দু নাই (?) তেতুলিয়াতে ৫।৭০০ ঘর তাঁতির বাস আছে। ইহাদের ব্যবসায় লুপ্ত হইয়াছে। এখন সামান্য চাষবাস বা দোকান করে। আগে মেকলি নামে পাটের মিহি স্তায় র‍্যাপারের মত জিনিষ তৈরী হইত, এখন আর হয় না। কিছু কিছু এণ্ডি হয় (পচাগড়ের দিকে)।

পচাগড়—আগে গুড় ও চিনি ভাল হইত। দেবীগঞ্জ—বিছানায় পাতা বা ধান শুখানর জন্য চট তৈরী হইত।

হাটবাজার :—সকল হাটেই প্রায় গরু, মুরগী প্রভৃতি বিক্রয় হয়। (১) ধূপগুড়ি—খুব বড় হাট—ধান, সরিষা, পাট। (২) শালাডঙ্গা—পাট খুব বেশী আসে (বোদা থানা) (৩) শিলিগুড়ি।

মেলা :—(১) পাটগ্রামে বাঁশকাটার মেলা (ছোট)। (২) জলেশ্বর—শিবরাত্রি হইতে একমাস ধরিয়া হয়। এখানে ভুটানীরা ঘোড়া, কুকুর, চামর, কস্তুরী প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আসে। থালা, বাসন, কাপড়-চোপড় খুব বিক্রয় হয়। ঢাকা, রংপুর, দিনাজপুর হইতে বড় বড় খাবারের দোকান আসে।
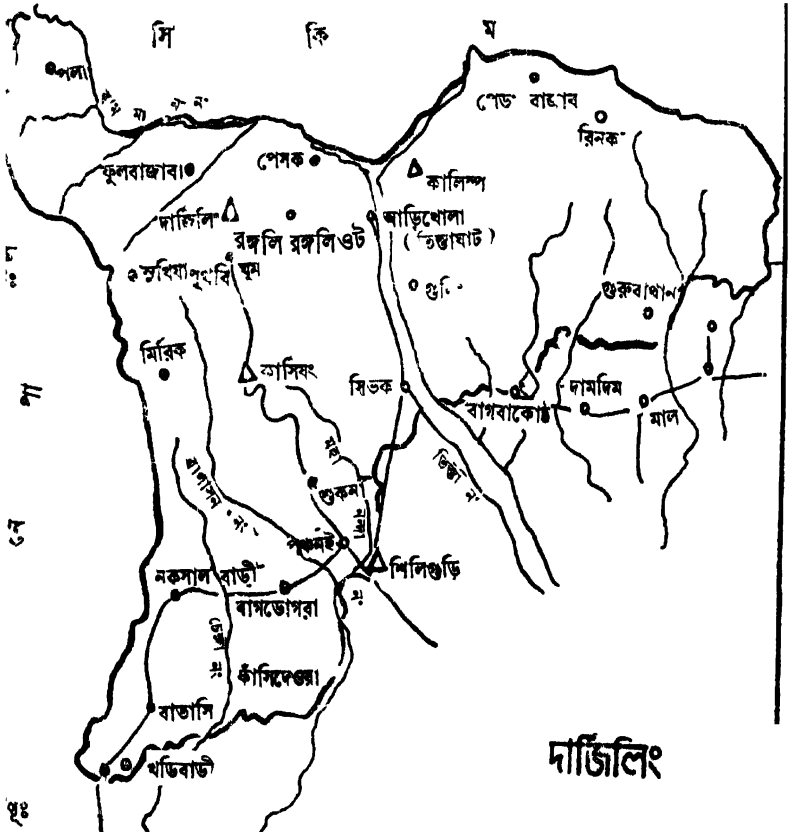
দার্জিলিং

দার্জিলিং রাজশাহী বিভাগেব একটি জেলা। জেলায় চারিটি মহকুমা।

সদর মহকুমার থানা :—দার্জিলিং, পুলবাজার, বঙ্গালি রঙ্গলিওট, সুখিয়া-পুখরি ও যোড়বাংলা।

কালিম্পং মহকুমার থানা —কালিম্পং, গুরুবাথান।

কার্সিয়ং মহকুমার থানা :—কার্সিয়ং ও মিরিক।

শলিগুড়ি মহকুমার থানা:—শিলগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া ও খড়িবাড়ী।

নদ-নদী :—বালাসন, রঙ্গিত, তিস্তা—তিনটি খরস্রোতা পার্বত্য নদী। পানীয় জল অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাহাড়ী ঝরণা হইতে সংগ্রহ করা হয়।

কৃষিজ দ্রব্য :—স্থানীয় পাহাড়িরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য ভুট্টা ও শাকসব্জীর চাষ করে। তাহা ছাড়া আয়ের জন্য বাহিরের ধনীদের চা-বাগান অনেক আছে। সিকিম অঞ্চলে ও দার্জিলিং কমলালেবুর চাষ আছে। [ইহার কারবার পশ্চিমা মুসলমান (কলিকাতা বাজারের) ও কিছু বাঙালী (সাহা) দের হাতে আছে, স্থানীয় অধিবাসীদের হাতে নয়।] দার্জিলিং হইতে কলকাতায় প্রচুর পরিমাণে পেঁপে, স্কোয়াস, কড়াইশুঁটি, আনারস, বাঁধাকপি ও অন্যান্য শাকসব্জী চালান যায়। (ইহার ব্যবসা ও পাহাড়ীয়াদের হাতে নয়।)

গভর্ণমেন্টের হাতে কুইনাইনের চাষ আছে, মংপুতে (কার্সিয়াং মহকুমায়) বড় বাগান আছে।

দুধ :—দার্জিলিঙে গরুর দুধ খুব ভাল। সহরে টাকায় ১০।১২ সের পাওয়া যায়। এর নিকট ক্যাভেণ্ডার কোম্পানীর দুধ, মাখন (এবং শূকরের মাংসের) কারখানা আছে।

খাবার :—পাহাড়ীদের মধ্যে চা এবং সিগারেটের অসম্ভব চলন আছে। কখন কখন ইহারা নুন ও মাখন দিয়া তিব্বতীদের মত চা খায়। (কাঁসার লম্বা গেলাসে চা খাওয়ার রীতি প্রচলিত আছে, চায়ের কাপ নয়।) সাধারণ জলখাবারের মধ্যে চালের গুঁড়া দিয়া গোল গোল একরকম পিঠা ও জিলিপির মত আকারে গড়া নোন্তা একরকম খাবারের খুব চলন দেখা যায়।

মাছ মাংস :—কার্সিয়াঙে বালাসন নদীতে ধরা টাটকা মাছ বেশ পাওয়া যায়, কিন্তু দার্জিলিং শহরে চালানী মাছই বেশী।

ঘর :—অবস্থাপন্ন পাহাড়িরা মাটির দেওয়াল দেয়, গরীবে নল-খাগড়ার মত একরকম কাঠির বেড়া নির্মাণ করে। জংলা ঘাস দিয়া চাল ছায়। বাড়ির পাশে পাহাড়ী বৃষ্টির স্রোতে নালা কাটিয়া রাখা হয়, যেন বর্ষায় ঘরের কোন ক্ষতি না হয়।

জ্বালানী :—কাঠ।

শিল্প :—পাহাড়ীরা শহরে দর্জি, ছুতার প্রভৃতির কাজ করে। (তাহাদের প্রধান বৃত্তি পি, ডবু, ডির রাস্তা এবং দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলে খাটা বা চাবাগানের কুলির কাজ করা। মেয়েরাও কুলির কাজ করে; যাত্রীদের ঘোড়া

ভাড়া দেয়, চায়ের বা খাবারের দোকান চালায়। অনেক ছোটখাট ব্যবসা করে। বড় ব্যবসা প্রায় সবই বাহিরের লোকের অধিকারে গিয়াছে।)

কম্বলের কাজ কিছু হয়, বেশীরভাগ সিকিম, নেপাল, ভুটান হইতে চালান আসে।

দেশী (নেপাল ও তিব্বতে প্রস্তুত) লোহায় জেলার মধ্যে ভাল কুকরি তৈয়ারি হয়।

বিদেশী শিল্প :—ক্যাভেণ্ডারের মাখনের কারখানা আছে। বহু যাত্রী আসার ফলে দার্জিলিং জেলায় যাত্রীদের কাছ হইতে হোটেলওয়ালা, কুলি, সখের জিনিসের ব্যবসায়ীরা বেশ রোজগার করে।

হাটবাজার —দার্জিলিং সহরে প্রতি রবিবারে হাট হয়। সেখানে তরি-তরকারি ছাড়া খাঁটি পশমের তিব্বতী কম্বল ২।৩ টাকাতে পাওয়া যায়। তিব্বতী জুতা ১।০ আন্দাজ দামে বিক্রয় হয়।

মেলা :—দার্জিলিং এবং আড়িখোলার মাঝামাঝি রঙ্গিত নদীর উপত্যকায় দশহরার সময় মেলা বসে। তখন বহু পাহাড়ি এখানে সমবেত হয়, উৎসবাদি ছাড়া কেনাবেচার কাজও খুব চলে।

ব্যবসায় কেন্দ্র —দার্জিলিঙের বা কার্সিয়াং কালিম্পঙের সঙ্গে রেলে কলিকাতার যোগাযোগ আছে। তাহা ছাড়া নেপালের সঙ্গে সুখিয়াপুখরি হইয়া একটি রাস্তা আছে। আড়িখোলাতে সিকিম - তিব্বতের পথে নানাবিধ মাল আমদানি-রপ্তানি হয়।

কালিম্পং—কাঁচা ভেড়ার লোম, কোটি কোটি টাকার, এখান হইতে আড়িখোলা হইয়া বদেশে চালান যায়। কালিম্পং হইতে আড়িখোলা রাস্তায় ৮ মাইল। একটি সোজা দড়ির ঝোলা লাইন আছে, তার সাহায্যে মাল যাতায়াত করে। ভেড়ার লোমের বড় কারবারী জে, মিস্ত্রী নামে জনৈক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। কালিম্পঙে ভুটিয়া ও তিব্বতী, ঘোড়াও বিক্রয়ের জন্য খুব আসে। এখান থেকে নূন, কাপড়, পাহাড়ী দেশে রপ্তানী যথেষ্ট হয়। সে কারবার প্রধানতঃ মাড়োয়ারী ভদ্রোলোকেদের হাতে।

আড়িখোলা বা তিস্তা ব্রীজ—কিছু ভেড়ার লোম নামে। তা ছাড়া চমরী গাই'এর লেজ, মৃগনাভি, তিব্বতের মনোহারী জিনিস বিক্রয় হয়।

শীতের দিনে পাহাড়ীদের বাসা বা তাঁবু পড়ে এবং এরা এই সকল জিনিস বিক্রয় করে।

সুখিয়াপুখরি—ঘুম হইতে ১২ ও দার্জিলিং হইতে আরও ৩ মাইল দূরে নেপালের ধারে অবস্থিত। নেপালের সঙ্গে যাবতীয় ব্যবসা এই পথে চলে।

যাতায়াত :—ঘোড়া প্রধান। তা ছাড়া মাথায় মোটা ফিতা দিয়া, পিঠের উপর কুলপী বরফের খোলের মত ঝুড়িতে মাল নিয়া ওঠানামা করে।

সামাজিক সম্পর্ক :—ইংরাজ চা-বাগানের অধিকারীগণ ধনী। তাদের যথেষ্ট খাতির। বাঙালীরা ইংরাজের মত খরচ করে না। অথচ পাহাড়ী-দের হেয় বলিয়া মনে করে. ফলে দার্জিলিং শহরে বাঙালীদের একটু ঘৃণার চোখে দেখে। অন্যত্র এই ভাব কম।

পাহাড়ীরা কুলির কাজ করে। চায়ের বাগানে, রেল রাস্তায় খাটে। শহরে দর্জি বা ছুতারের কাজ করে, কুকরি গড়ে, মাল লইয়া যাওয়া-আসা করে। মেয়েরা চায়ের দোকান করিয়া বেশ রোজগার করে।

পাহাড়ীরা ফুল খুব ভালবাসে। গানের সুর একটু ভিন্ন রকমের। খুব চা ও সিগারেট খায়।

৮৯° পূঃ
গষ'বাড়ী
মহিষকুচি
হলদীবাড়ী
মেখলিগঞ্জ
ফতেমামুদ
কুচবিহার
মাথাভাঙ্গা
জলঢাকা নং
তিস্তা নং
তুফানগঞ্জ
দেওয়ানগঞ্জ
শিবপুর
নলগ্রাম
কংটামারি
ধরলা নং
চিলাখানা
কালজানি নং
হলদিবাড়ী
শীতলকুচি
গোসানীমারী বন্দর
দিনহাটা
লালবাজার
বামনহাট
শীতলদহ
কুচবিহার
১০ ০ ১০
স্কেল - মাইল
২৬° উঃ
৮৯° পূঃ
২৬° উঃ
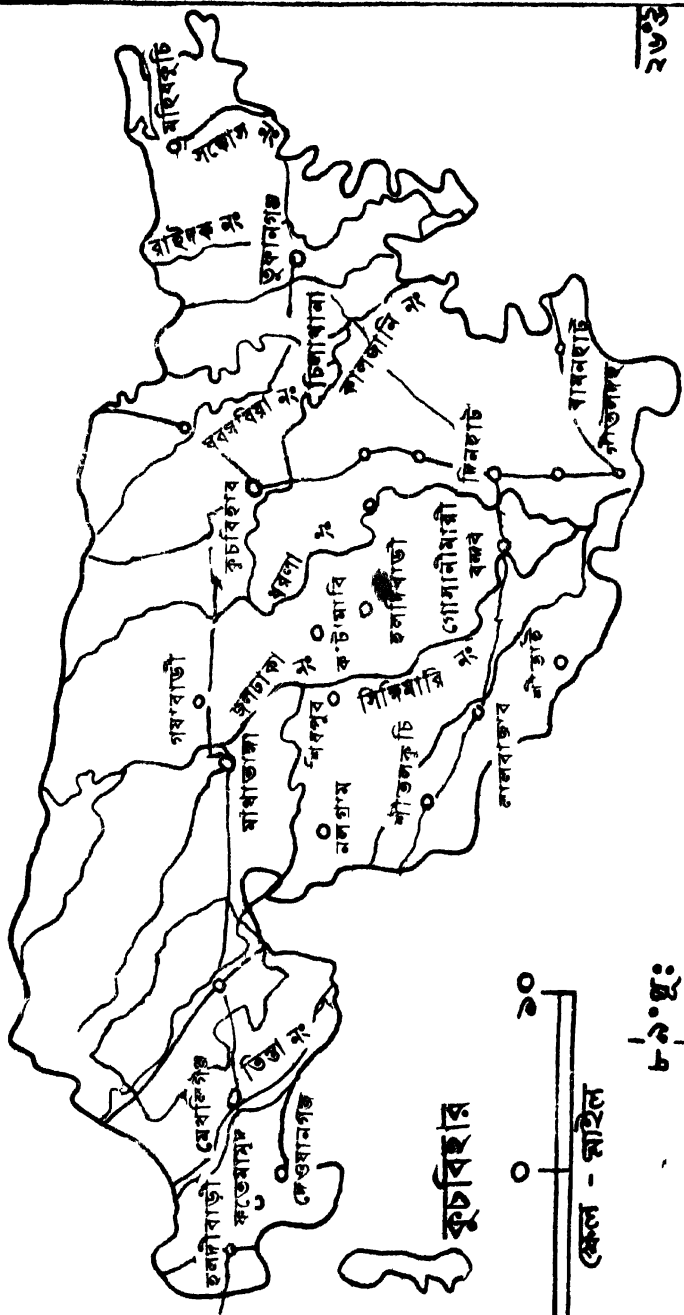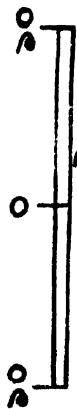
কুচবিহার

কুচবিহারের পাঁচটি মহকুমা। ইহাদের নাম।

কুচবিহাব বা সদব, তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, মেখলীগঞ্জ।

মাটী:—পালিমাটীযুক্ত, তবে অনেক বালি মিশ্রিত। বেশীব ভাগ মাটি এমন দো'আঁশ যে জল ধরিয়া রাখিতে পাবে কিন্তু স্যাঁতসেঁতে বা জলা হয় না। শুকাইয়া গেলে ফাটিয়া যায় না, অল্প চাপ দিলেই ভাঙ্গিয়া যায়। চাষেব জন্য লাঙ্গল চালাইবার অসুবিধা হয় না। উত্তর-পূর্বদিকে গোয়াল-পাড়া জেলার কাছের (কাল দো-আশ) মাটী রাজ্যের সবচেয়ে উর্বরা। কালজানি নদীর পূর্বপাড়ের জমিও উর্বরা। লালবাজারের কাছে উঁচু বা ডাঙ্গা জমিগুলিতে বালির পরিমাণ বেশী। ইহাতে ভালভাবে সার দিয়া ভাল তামাক, আখ, সুপারীর চাষ করা হয়। বিলের ধারের নীচু জমি বিশেষ কাজে লাগায় না। দিনহাটার কাছের জমি এই রকম নীচু। পয়োস্তি বা নূতন চব জমি চাষেব উপযুক্ত। তবে নদী হিসাবে চরের তফাৎ হয়।

নদনদী:—এই বাজ্যে অনেক নদী—তিস্তা, ধরলা, জলঢাকা, তোরসা, কালজানি, রাইদক, গদাধর বা সঙ্কোশ। প্রায় সব নদীগুলিই হিমালয় পর্বত হইতে উঠিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে বহিয়া যাইতেছে। বর্ষার সময় নদীর জলেব ভীষণ তোড়েব সঙ্গে অনেক বড বড পাথব চলিয়া আসে, বর্ষায় খুব বন্যা হয় ও প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি হয়। বর্ষার সময় নদীতে নৌকা চালনা নিরাপদ নয়।

জলাবিল:—নদীর পুরাতন খাতগুলি একেবারে শুকাইয়া না গিয়া অনেক বিলও জলা হইয়া রহিয়াছে। কুচবিহার পরগণার হাঁসখাওয়া, চম্পাগুড়ি, তুফানগঞ্জের গরুমারার ছাড়া, দুর্লভের ছাড়া, দিনহাটার করলা বিল, শীতাই, মেখলীগঞ্জের সরোহাটি, জগৎবার এই ধবণের বিল। বিল বা জলাকে ইহারা 'ছাড়া' 'দাড়া', 'বিল', 'কুয়া' বলে। মাছের চাষ, পাট ভেজান, গরু ছাগলকে খাওয়ান এইসব নানা কাজে জলা ও বিল ব্যবহার করে।

চাষ :—ধান, চিনা, কাওন, ভুট্টা, প্রায় সব জায়গায় হয়। গম ও বালিও হয়। মেখলীগঞ্জ পরগণায়, মাথাভাঙ্গা পরগণায় ও কুচবিহার পরগণার গিরদ চৌরায় খুব ভাল ধান হয়। নীচু জমিতে, বিলের ধারে কখনও কখনও বোরো ধান লাগায়। ডালের মধ্যে মুগ ডাল সবচেয়ে বেশী হয়। তুফানগঞ্জের মুগ পূর্ব বাংলার সোনামুগের মত উৎকৃষ্ট। মাথাভাঙ্গায় ভাল মুসুর ডাল হয়। মাসকলাই ডালের চাষ ভাল হয় না। তিল, তিসি সরিষার চাষ হয়। সরিষা জেলার সর্বত্র হয়। তুফানগঞ্জের সরিষা খুব ভাল। দুই প্রকার সরিষার চাষ হয় জাতি ও রাই। জাতি সরিষায় বেশী তেল পাওয়া যায়। তিলের চাষ বেশী হয় না। কৃষ্ণ তিলের চাহিদা কিছু বাড়িয়াছে। পাট, শন, কুণকুরা বারিয়া সর্বত্র হয়। মেখলিগঞ্জের পাটের খুব নাম। কুচবিহার ও তুফানগঞ্জে প্রচুর তামাকের চাষ হয়। লালবাজারের তামাক বিখ্যাত। নৌকাযোগে এই তামাক পূর্ববঙ্গে চালান যায়। পূর্বে বর্মার লোকেই এই তামাকের প্রধান ব্যবসায়ী ছিল। আলু, বেগুন, মুলা, সব তরকারীই অল্প বিস্তর করে। বড় বড় পুকুরের ধারে বা নদীর ধারে ফুটি, কাঁকরি তরমুজের চাষ করে।

গাছপালা - ফল :—এখানে খেজুর, বাঁশ, নারিকেলের গাছ প্রচুর আছে। তাল গাছ বেশী নাই। তাল বা খেজুর গাছে রস বেশী নাই। আগে লোকেরা শুধু ফল খাইত। তাড়ি, রস বা গুড় করিতে জানিত না। নারিকেল গাছের এক একটাতে ১০০টা পর্যন্ত ফল হয়। অনেক প্রকার কলা জন্মায়। বিচেকলা বা ঝামা-কলা খুব মিষ্টি হয়। পাকা কাচকলাকে ভেরুয়া বলে। মনুয়া চিনিমনুয়া, চাঁপা, নলভোগ, ভরতামন এইসব নানা প্রকার সুমিষ্ট কলা পাওয়া যায়। আম ভাল না, টক ও পোকা। কাঁঠাল প্রচুর হয়।

বাঁশ—বাঁশ প্রায় ৫ রকমের পাওয়া যায়। 'বড়' বাঁশের গাট কাছাকাছি, বাড়ী বা অন্য কিছুর জন্য ব্যবহার করে।

মাখলা বাঁশ—খুব পাতলা ও সহজে চেরা যায়, পোকা ধরে না। পেরুবাঁশ কাটাযুক্ত, নলবাঁশ খুব নরম।

জঙ্গলে সেগুন, শিশু প্রধান। কদম গাছও খুব দেখা যায়।

ঔষধি—যথেষ্ট আছে। হরিতকী প্রচুর, ইহাকে কাঁসুল বলে। আমলকী, বহেরা, রিঠাও পাওয়া যায়। কুচী, নিম কুটরাজ, নিশিন্দা,

আপাং বাচ, ডাং শ্বেতকমল, অনন্তমূল নানা প্রকার গাছ পাওয়া যায়। ঔষধে ব্যবহার হয়।

জঙ্গলে নলখাগড়া, ইকড় পাওয়া যায়, পুণ্ডী ও হোগলা সব জায়গায় পাওয়া যায়। খোরঘাস ঘর ছাউনীর কাজে লাগে। ল্যাবেণ্ডারগন্ধী এক প্রকার ঘাস জন্মায়। বেত পাওয়া যায় না।

জীব-জন্তু-পাখী :—কুচবিহারের উত্তর দিকের জঙ্গলে অনেক জীব-জন্তু আছে। বাঘ, গণ্ডার, চিতা, বন্য মহিষ, কাল ভালুক, পাটলা খাওয়া, পুণ্ডীবাড়ী, মহিষ কুচিতে দেখা যাইত। চাষ ও বসতির জন্য বড় বড় জন্তু আর এখন খুব দেখা যায় না। ভালুক, নেকড়ে (হাকুড়া) যথেষ্ট উৎপাত করে। আদিবাসী শিকারীরা রাত্রে বনে মজবুত ফাঁদ পাতিয়া রাখে। বন্য শূকরও প্রচুর আছে। শস্যের নানা প্রকার ক্ষতি করে। লোকেরা অন্য হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও ইহাদের বেশী ভয় করে। আদিবাসীরা দড়ির লম্বা জাল দিয়া হরিণ ধরে। যে জায়গায় হরিণ আছে মনে করে তাহার তিন দিক ঘিরিয়া জাল পাতিয়া রাখে। সামনের খোলা অংশে বাঁশের গদা দিয়া আওয়াজ করে। হরিণরা ভয় পাইয়া জালের দিকে ঝাপাইয়া যায় ও ধরা পড়ে। এইভাবে বন্য শূকরও ধরে। শিকারীরা (রাজবংশী) ইহাদের মাংস পোড়াইয়া খায়। চামড়া ও শিং জমাইয়া রাখে, বিক্রী করে না। সামান্য বখশীষ পাইলে দিয়া দেয়। খরগোশও ধরে। স্থানীয় লোকেরা শসা বলে। ইহাদের মাংস লোকেরা খুব উপাদেয় মনে করে।

নদীতে কুমীর আছে। ঘাড়িয়ালই বেশী।

এখানে নানা প্রকার পাখী দেখা যায়। খঞ্জনা পাখী এখানে খুব পবিত্র মনে করা হয়। বিজয়া দশমীর দিন খঞ্জনা দর্শন করিতে হয়। এইরূপ উৎসবে মহারাজাও যোগ দেন।

মাছ :—খালে-বিলে রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবউস প্রভৃতি যথেষ্ট আছে। শিকারী, বাজারি, তিয়ার গারোরা মাছ ধরে। ছিপে মাছ ধরাই প্রধান। মাছ ধরার জন্য বাঁশের তৈয়ারী ঝাকাই, পলো, দারা, দামদারু ব্যবহার করে। খাল বিল হইতে সাধারণতঃ পাটা দিয়া ধরে। ইলিশ মাছ ধরার সময় মাথা চেরা লম্বা বাঁশের খোটা ২ সারিতে পোতে। মধ্যখানের খোলা যায়গায় জাল পাতিয়া রাখে। জলস্রোতে নাড়া পাইয়া চেড়া বাঁশে ক্রমাগত শব্দ হয়। মাছগুলি ভয় পাইয়া পালাইতে গেলে জালে আটকায়।

শুঁটকী মাছের আদর আছে। এখানকার লোকেরা বিশেষ তৈয়ারী করিতে জানেনা। ব্রহ্মপুত্রের নিকটবর্ত্তী জায়গা হইতে আনে। পদ্মকাষ্ঠ, চন্দনকাষ্ঠ নানারূপ শুঁটকী আছে।

দুধ :—এখানে পশু-চারণ ভূমির অভাব নাই। কিন্তু স্থানীয় গরু মহিষ খুব রোগা। দুধের প্রাচুর্য্য নাই। ছোটদের মধ্যে দুধ খাওয়ার চল আছে। বড়রা দধি পছন্দ করে।

ঘর :—বাঁশের খুটি দিয়াও বাঁশের দরমার গায়ে মাটী দিয়া লেপা দেওয়ালের সাহায্যে ঘর বানায়। চারটি যুক্ত বাড়ী হয়। ২টি ঘরে শোয় ১টী রান্নার অন্যটিতে গরু ছাগল রাখা হয়। ২।৩ ফুট উচু বাঁশের মাচায় করিয়া চারিদিক দেওয়াল দিয়া বন্ধ করিয়া শোবার ঘরের ১ দিকে ভাড়ার ঘর তৈয়ারী করে ঐ ঘরে শস্য মজুত রাখে। বাড়ীর দরজাও বাঁশের তৈয়ারী জানালা নাই। একটু ভাল অবস্থার লোকেরা কাঠের দরজা দেয়। সাধারণ লোকের ঘরে বিশেষ আসবাবপত্র নাই। মাটীতে অথবা বাঁশের মাচায় শোয়।

লোক :—হিন্দু, মুসলমান, রাজবংশীরা মোরাংগিয়া এখানে থাকে।

রাজবংশীদের ধর্ম হিন্দু ও আদিবাসীদের সংমিশ্রণে। তাহারা হরি, শিব, দুর্গা, বিষহরি, বুড়োঠাকুর, বুড়াঠাকুরাণী প্রভৃতির পূজা করে। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের পূর্ণিমায় মদন-কামের পূজা করে। লম্বা সোজা বাঁশ লাল ও সাদা কাপড় জড়াইয়া ও ডগায় চামর বাঁধিয়া বাঁশগুলি উঠানে পোতে। ইহার পূজা হয়। পূজা শেষে কাপড়গুলি খুলিয়া জলে ভাসাইয়া দেয়। হিন্দু মেয়েরা নানা ব্রত পালন করে। কলেরা, বসন্ত, বৃষ্টিহীনতা ইত্যাদি উপলক্ষে নানা পূজা করে।

মোরাংগিয়াদের কুচবিহার ছাড়া বিশেষ অন্য কোথাও দেখা যায় না। ইহাদের বেশ শক্তি সামর্থ্য আছে, চেহারা বেশ মজবুত। ইহারা হিন্দু, অন্য জাতের রান্না খাবার খায় না। ইহারা প্রথম লাঙ্গল চালাইতে জানিত না কোদালের সাহায্যে চাষ করিত। তাহারা যে গ্রামে প্রথম আসে তাহার নাম কোদাই খেতি। ইহারা বাড়ী তৈয়ারী করে—খড়ের চাল মেরামত করে। মেয়েরাও বাবার সম্পত্তি পায়।

শিল্প :—শিল্পের মধ্যে রেশম শিল্প প্রধান। এই রেশম কীট ক্যাষ্টরওয়েল পাতা বা ভুট্টা গাছের পাতা খায়। এই রেশমকে এণ্ডি বলে-বেশ মোটা।

বাহিরে বিশেষ বিক্রী করে না। নিজেদের প্রয়োজনে বিক্রী করে। কুমার আছে। তালপাতা দিয়া নানারূপ পাখা ও খেলনা তৈয়ারী করে। স্থানীয় লোহাররা ভাল লোহা বানাইবার নিয়ম জানে। ইহাদের 'খাণ্ডাস' (বড় কাটারির মত) খুব ধারাল ও উৎকৃষ্ট লোহার। আদিবাসী ও ডোমেরা বাঁশ দিয়া মাছের ও চাষের অতি সুন্দর জিনিষ তৈয়ারী করে। গ্রামে 'ফোটা' ও পাটানি বোনার চল আছে—রাজবংশী মেয়েরা পরে এক প্রকার রঙ্গীন বা সাদা জামা, বগল হইতে পা পর্য্যন্ত ঝুল। পাট হইতেও সুন্দর চট ও মেখলি নামে সুন্দর কাপড় বোনে। মেখলিগঞ্জ মেখলি কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। শাল, শিশু, সেগুন গাছের কাঠ আসবাবের কাজে ব্যবহার করে পানওয়া গাছের কাঠ খুব শক্ত, কাঠাল, গাব, জামের কাঠও ভাল। শিমূল গাছের কাঠও রৌদ্র বৃষ্টি না লাগিলে অনেকদিন টেঁকে সেইজন্য ঘরের মেঝে ও ভেতরের ছাদ এই কাঠ দিয়া তৈয়ার করে।

তেল—বলরামপুরে ভাল সরিষার তেলের জন্য বিখ্যাত তেলীরা মুসলমান।

যাতায়াত :—নদীপথে পূর্ববঙ্গেরও নানাস্থানে তামাক ও পাট, চাল, সরিষা রপ্তানী করে। তিস্তা নদীতে সারা বছর ৩।৪ টন মালবাহী নৌকা চলিতে পারে। কালজানি নদী পথেই বেশী মাল চলাচল করে। কুচ-বিহারের ফেরী ব্যবস্থা খুবই ভাল। মহারাজার নির্মিত রেলপথে লালমনির হাট হইতে কুচবিহার পর্য্যন্ত ও কুচবিহার হইতে যাওয়া যায়। কুচবিহার হইতে ধুবড়ী পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা আছে।

শহর - বন্দর :—বলরামপুর পাটের বড় গঞ্জ। চন্দ্রবাঁধ'য় ভাল গোয়ালা পাড়া আছে ডোমেরাও এখানে থাকে। বাঁশের সুন্দর জিনিষ তৈয়ারী হয়।

ঘোড়ামারা কালজানি নদীর উপর পাট, সরিষা ও সরিষা তেলের রপ্তানীর বড় বন্দর।

গোযানীমারি—রাজা কোটেশ্বরের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে।

বিয়াল্লিশের বাংলা

(প্রেসিডেন্সী বিভাগ)

চব্বিশ পরগণা
স্কেল মাইল
হালিসহর
বীজপুর
নৈহাটি
ভাটপাড়া
জগদ্দল
আমডাঙ্গা
বারাকপুর
দত্তপুকুর
গোবরডাঙ্গা
মসলন্দপুর
হাবড়া
স্বরূপনগর
বারাসত
বাদুড়িয়া
দেগঙ্গা
বসিরহাট
টাকি
দমদম
রাজারহাট
হাড়োয়া
হাসনাবাদ
আলীপুর
টালিগঞ্জ
বজবজ
ভাঙ্গড়
বিষ্ণুপুর
সোনারপুর
শামুকপোতা
সন্দেশখালি
বারুইপুর
ফলতা
পোর্ট ক্যানিং
ভাঙ্গনখালি
পাঠানখালি
মগরাহাট
কুলপি
সুতাহাটা
ডায়মণ্ডহারবার
জয়নগর
মথুরাপুর
লক্ষ্মীকান্তপুর
যাদবপুর
বাসন্তী
নন্দীগ্রাম
দীঘির পাড়
মধুসূদনপুর
কাকদ্বীপ
ঘুরিগঙ্গা
ফ্রেজারগঞ্জ
সাতক্ষীরা
যশোহর
যমুনা
গোসাবা
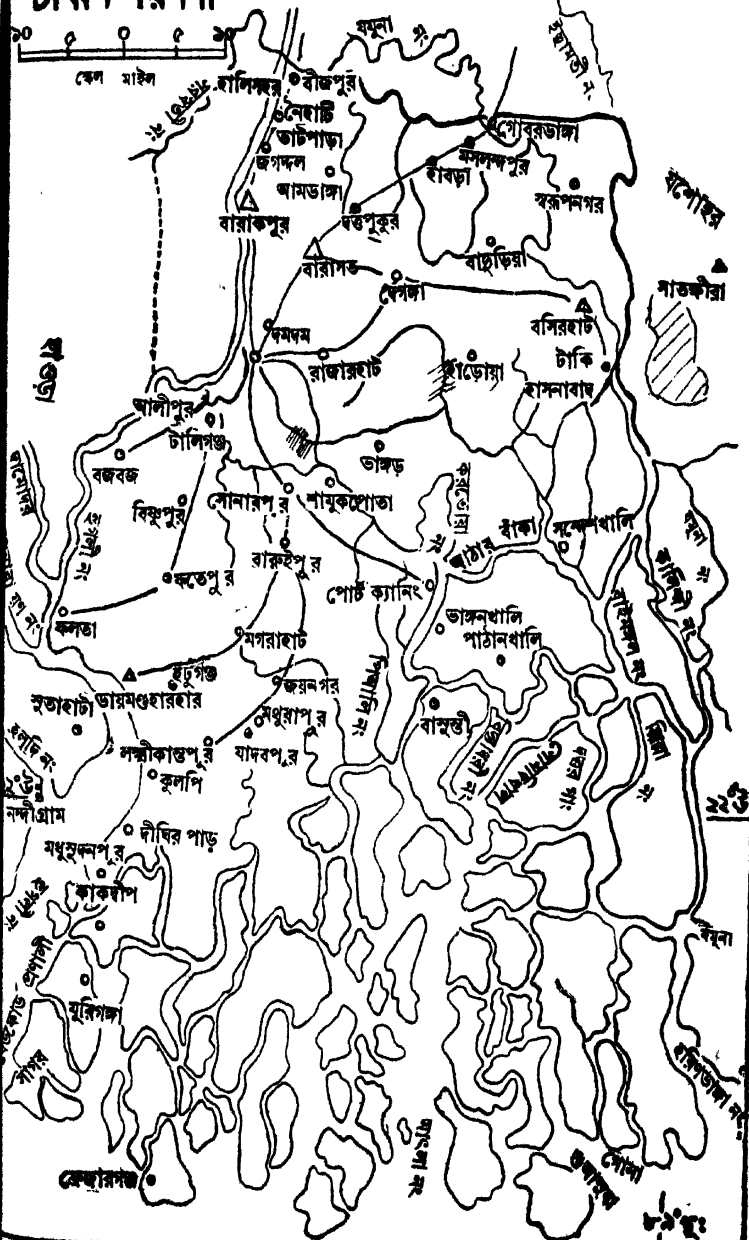
চব্বিশ পরগণা

চব্বিশ পরগণা প্রেসিডেন্সী বিভাগের একটি জেলা। ইহার পাঁচটি মহকুমা।

সদর মহকুমার থানা: আলিপুর, টালিগঞ্জ, সোনারপুর, বেহালা, মেটেবুরুজ, মহেশতলা, ক্যানিং, জয়নগর, বারুইপুর, বিষ্ণুপুর, বজবজ ও ভাঙ্গড়।

ব্যারাকপুর মহকুমার থানা: ব্যারাকপুর, বরানগর, টিটাগড়, নোআপাড়া, খড়দহ, দমদম, নৈহাটি, জগদ্দল ও বীজপুর।

বারাসত মহকুমার থানা: বারাসত, হাবড়া, দেগঙ্গা, আমডাঙ্গা ও রাজারহাট।

বসিরহাট মহকুমার থানা: বসিরহাট, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া, হাসনাবাদ, হাড়োয়া ও সন্দেশখালি।

ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার থানা: ডায়মণ্ডহারবার, মগরাহাট, ফলতা, কুলপী, সাগর, মথুরাপুর ও কাকদ্বীপ।

মাটি:—মাটি পরীক্ষা করিলে ডায়মণ্ডহারবার মহকুমাকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। বারুইপুর, জয়নগর প্রভৃতি অঞ্চল দিয়া এক সময়ে বুড়ীগংগা বহিয়া যাইত। এই মিঠেন অংশের জমি দোআঁশ। মগরাহাট থানার দুয়ের তিন ভাগ মিঠেন, ফলতা থানার অর্ধেক হইতে একের তিন ভাগ ঐরূপ। মহকুমার অবশিষ্ট অংশ হুগলী নদীর উপরে, সেখানকার মাটি লোনা। মহকুমার দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্বাংশ লোনা। লোনা অঞ্চলে মাটি এঁটেল।

নদ-নদী:—বুড়ীগংগা, বিষ্ণুপুর, জয়নগর প্রভৃতি গ্রামের নিকটে বহিত, এখন মজিয়া গিয়াছে। তবু মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য লোকে ঐ সকল স্থানে যায়, হুগলী নদীর ধারে যায় না। হুগলীতে জোয়ার-ভাঁটা খেলিলেও উঁচু বাঁধের কারণে জল নদীর গর্ভেই আবদ্ধ থাকে।

জল:—মিঠেন অঞ্চলে ও লোনা জায়গাতে পুকুরের চলই বেশী। হুগলী বা হাওড়া জেলার মত পুকুরের জল পান, স্নানের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেচের জন্য নয়। মিঠেনে ইদানীং ৩০ ফুট আন্দাজ গভীর নলকূপ

করিলেই বেশ জল পাওয়া যায়। লোনা অঞ্চলে পুকুর ৮।৯ বা ১০।১২ (কদাচিৎ ১৫।১৬) ফুট খোঁড়া হয়, তাহাতে নীচের জল ওঠে না, বৃষ্টির জলেই পুকুর ভরিয়া থাকে। (বরিশালে কিন্তু পুকুরের জল নীচে হইতে ওঠে, জোয়ার-ভাঁটাও খেলে।)

কাকদ্বীপ, সাগর ও মথুরাপুরের অর্ধেক সুন্দরবন। কাকদ্বীপে ২৫০ ফুট গভীর নলকূপ হইতে ভাল পানীয় জল পাওয়া যায়। একটি জায়গায় ৪০০ ফুট গভীরেও লোনা জল বাহির হওয়ায় নলকূপটি পরিত্যক্ত হয়।

কৃষি :-ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় শুধু আমন ধানেরই চাষ হয়; আউশ হয় না। মিঠেন জমিতে ফল গাছ (আম-কাঁঠাল), কপির ভাল চাষ হয়। সেখানকার গাছপালা সতেজ, জায়গাটিও বৃক্ষ বহুল। কিন্তু লোনা অঞ্চলে গাছ কম, তাহাদের পাতারও তেমন বাড় নেই। চাষের মধ্যে সেখানে ভাল পটল ও ওলকচু হয়। এই ছু'টির আস্বাদ লোনা জমিতেই নাকি ভাল হয়। কুলপির পটল ভাল। মিঠেনে কিছু কিছু কলাই ও তরি-তরকারীও হয়।

ডালের মধ্যে খেসারির খুব চলন আছে। ধানের জমিতে শেষের দিকে ছড়াইয়া দেয় ও ধান কাটার পরে যথাসময়ে ডাল তুলিয়া লয়। মিঠেন অঞ্চলে (গংগার পুরাণো গাবায়) খেজুর গাছ হইতে খুব ভাল গুড় হয়। জয়নগরের গুড় সেইজন্যই অত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তৈলবীজের চাষ নাই, চালানি সরিষার তেলে কাজ চলে।

দুধ :—পূর্ববংগের মত পশ্চিমবংগে বাজারে দুধ বিক্রয় হয় না। এখানকার গরুর জাত খারাপ, দুধও ভাল নয়। কলকাতার কাছাকাছি অঞ্চল হইতে কিছু দুধ কলিকাতায় চালান যায়। সুন্দরবন অঞ্চল হইতে চালান দেওয়া কষ্ট বলিয়া সেখানে মাঝে মাঝে দুধ টাকায় ১২ সের পর্যন্ত বিক্রয় হয়, কিন্তু সে দুধও পরিমাণে অল্প।

খাবার :—মগরাহাট থানায় মোল্লারচকের দই বেশ নামকরা, কলিকাতায় চালান যায়। জয়নগরের খেজুর গুড় ও মোয়া (খই-এর) ভাল। কুলপি, ফলতা, ডায়মণ্ডহারবার থানায় ভাল তাল-পাটালি তৈয়ারি হয়। কিছু তালের গুড় লোকে নিজেদের ব্যবহারের জন্যও করে। সাধারণতঃ মুড়ি, গুড় ও পান্তাভাত জলখাবার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মুড়ির পরিবর্তে খৈ ও মুড়ি দুইয়ের তিন ভাগের সঙ্গে একের তিন ভাগ মিশাইয়াও লোকে খায়।

মাছ :—অল্প। সুন্দরবনে খাল, অন্যত্র নদীর ধারে বাঁধ—এই দুই অঞ্চলে লোকে কম মাছ ধরে। পুকুরের মাছই বেশী বিক্রয় হয়, তবে বর্ষায় নদীর ইলিশও বিক্রয় হয়। শুটকির চলন আদৌ নাই।

ঘর :—মাটি থান থান করিয়া কাটে, তাহাকে 'চ্যালা' বলে। সেইগুলি পরপর সাজাইয়া মাটির দেওয়াল রচনা করে। বাঁশের চাল করিয়া তাহার উপর খড়ের ছাউনি দেয়, এদিকে উলুখড়ের চলন আদৌ নাই।

আসবাব :—ধানের খেতে একরকম ঘাস হয়, তাহার নাম 'পাতি'। ইহা দ্বারা মোটা মাদুর করে, তাহাকে 'ঝাঁৎলা' বলে। খুলনা জেলা হইতেও মোটা কাটির মাদুর (পটপটীর মাদুর) আমদানি হয়। মেদিনীপুর হইতে সরু কাটির মজবুত ও টেঁকসই মাদুর চালান আসে।

বাঁশের উপর ন্যাকড়া জড়াইয়া, কড়ি দিয়া সাজাইয়া ঝোলান আলনা করা হয়। ইহাকে 'কড়ির সাঙা' বলে। আজকাল সাঙা কম দেখা যায়, শুধু বাঁশের আলনা করে। তক্তাপোষের চলন আছে।

জ্বালানি :—শতকরা বার আনা ঘুঁটে, খড় ইত্যাদির চলন, অবশিষ্ট কাঠ; কয়লার চলন খুব কম। ঘুঁটেও সব সময়ে পরিপাটিভাবে করে না। গ্রীষ্মকালে মাঠে গোবর ছড়াইয়া এলোমেলোভাবে তাহাকে পাকাইয়া শুখায়। ফলে, গোবরের গোলা অনিয়মিত বিভিন্ন গোলাকার ধারণ করে।

শিল্প : ডায়মণ্ডহারবারে তালপাতার টুপি ও দড়ির দোলনা (হ্বামক) তৈয়ারী ও বিক্রয় হয়। স্থানীয় মিস্ত্রী (হিন্দু) বেশ ভাল নৌকা গড়িয়া থাকে। কুমোরেরা তালগুড়ের বা তাড়ির জন্য খুব পাৎলা ও হাল্‌কা মাটির ভাঁড় গড়ে। আধ মণ, ত্রিশ সের ধরে এমন পাতলা খুলিও তৈয়ারি করে। তাহাতে গুড় জ্বাল দেওয়া হয়।

কামারেরা গ্রামের সাধারণ প্রয়োজনের উপযোগী জিনিস তৈয়ারি করে। খেজুর ও তালগাছ কাটার ভাল দা গড়িয়া থাকে। মহিষবাথান, বজবজ প্রভৃতি অঞ্চলে কারখানার মজুর আমদানীর ফলে পাশি জাত আসিয়াছে এবং তাড়ির চলন হইয়াছে। আগে ইহা ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় আদৌ ছিল না। মহকুমার তাঁতি ও জোলা না থাকায় খাদি-বুনাইবার খুব অসুবিধা হয়। তাহারা কলিকাতা সহরের বৃদ্ধির সহিত হয়ত সেদিকে চলিয়া গিয়াছিল বা অন্যত্র পলাইয়া গিয়াছিল। কিছু তাঁতি জাতের চাষী মেদিনীপুর হইতে ডায়মণ্ডহারবারের সুন্দরবন অঞ্চলে আসিয়া চাষ করিতেছে।

মহকুমার ধোপা ও নাপিতকে চাকরাণ জমি দেওয়ার রীতি ছিল, এখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

বিদেশী শিল্প :-হাটবাজার—(১) মগরাহাট চালের খুব বড় গঞ্জ ছিল, শা ওয়ালেস্, রেলি ব্রাদার্স প্রভৃতি এখানে চাল খরিদ করিত। ৩০ বছর আগে লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার হইত। সে চাল আসে-পাশের অঞ্চল হইতে ঢেঁকিতে ছাঁটাই হইয়া আসিত। (২) আজকাল চালের পরিবর্তে ধান বেশী রপ্তানী হয়। নৌকায় সোজাসুজি ফলতা ও ডায়মণ্ড-হারবারে ধান আসে। ঐ দুই স্থান তাই এখন মগরাহাটের বদলে ধানের গঞ্জ হিসাবে বর্ধিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে।

মেলা :—গঙ্গাসাগরের মেলা বিখ্যাত। চৈত্র সংক্রান্তিতে বর্ধমান, বীরভূমের মত এ অঞ্চলে ঘরে ঘরে উৎসব হয়। ধানের চাষী বলিয়া দুর্গা পূজার সময়ে ইহাদের ঘরে খাবার কম থাকে, সেটা তত বড় উৎসব নয়। গ্রাম্যজন চৈত্র মাসেই বেশী আমোদ আহ্লাদ করে।

সংস্কৃতি ও মানুষ :—জেলার মধ্যে পোদ চাষীর প্রাধান্য খুব। তাহারা এখান হইতে খুলনার সাতক্ষীরা পর্যন্ত সুন্দরবন কাটিয়া নূতন আবাদ করে। ডায়মণ্ডহারবারের উত্তরাংশের সংগে কলিকাতার খুব যোগ। জেলার অন্যান্য মহকুমা যথা—বারাসত, বসিরহাট, বারাকপুরের সংগে ডায়মণ্ড-হারবারের কোন সম্পর্কই নাই।

আবার ডায়মণ্ডহারবারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অংশ বাদে সুন্দরবনের 'লাট" অংশের সংগে হুগলীর ওপারে মেদিনীপুরের বেশী যোগ। সেখানকার জমিদারও মেদিনীপুরের লোক। সাগর থানার ৮০%, কাকদ্বীপের ৬০%, মথুরাপুরের সুন্দরবন অঞ্চলের ৬০% অধিবাসী মেদিনীপুর জেলা হইতে আসিয়াছে। (মেদিনীপুরের ২।৪০০০ তন্তুবায় ঐখানে চাষ করে, তাহারা তাঁতের ব্যবহার ভুলিয়া গিয়াছে।)

নদীয়া
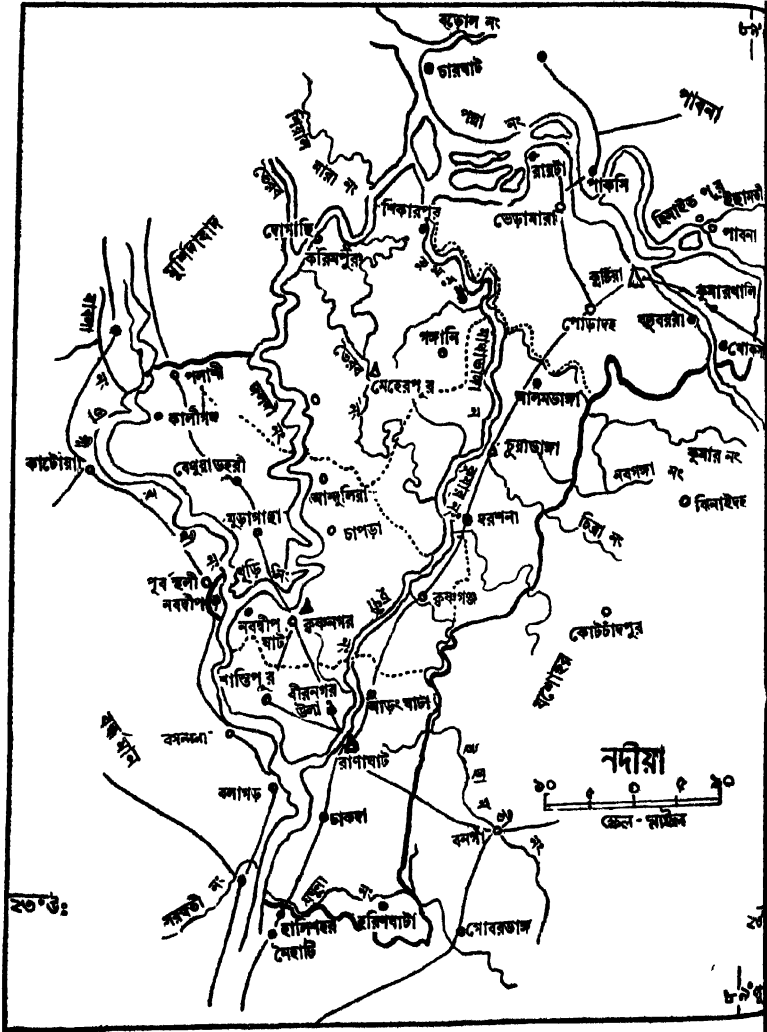
নদীয়া প্রেসিডেন্সী বিভাগের একটি জেলা। জেলায় পাঁচটি মহকুমা।

সদর মহকুমার থানা: কৃষ্ণনগর, কালিগঞ্জ, নাকাসিপাড়া, চাপড়া ও নবদ্বীপ।

রাণাঘাট মহকুমার থানা: রাণাঘাট, শান্তিপুর, চাকদহ, হরিণঘাটা ও হাঁসখালি।

কুষ্টিয়া মহকুমার থানা: কুষ্টিয়া, মীরপুর, ভেড়ামারা, কুমারখালি, খোকসা ও দৌলতপুর।

চুয়াডাঙ্গা মহকুমার থানা: চুয়াডাঙ্গা, আলমডাঙ্গা, দামুরহুদা, জীবননগর ও কৃষ্ণগঞ্জ।

মেহেরপুর মহকুমার থানা: মেহেরপুর, তেহট্ট, করিমপুর ও গাংনি।

মাটি:—রাণাঘাট মকুমায় দোআঁশ, নরম মাটি। সদরে অনেক রকমের মাটি পাওয়া যায়, নলকূপে ৫ রকমের মাটি ওঠে। চুয়াডাঙ্গায় মাটি অপেক্ষাকৃত শক্ত, বালির ভাগ কম, কিন্তু নলকূপ হইতে মোটা দানার বালি বাহির হয়। কুষ্টিয়ার মাটি সদরের চেয়ে কিছু এঁটেল।

নদ-নদী:—ভাগীরথী আগে নবদ্বীপ সহরের পশ্চিম দিয়া বহিত। মোহনার নিকট জলঙ্গী 'খড়ি' নামে পরিচিত। পদ্মা হইতে জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা পৃথক বাহির হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শিকারপুর ও চুয়াডাঙ্গার পাশে কুমার নদী, উহাই রাণাঘাটের পশ্চিমে চূর্ণী নাম ধরিয়া ভাগীরথীতে মিশিয়াছে। মেহেরপুরে ভৈরবের অবস্থা মৃতপ্রায় (যশোহর জেলাতেও তদ্রূপ)। যশোহর জেলা ঝিনাইদহের কিছুদূরে উত্তরে যে কুমার নদী আছে তাহার সহিত শিকারপুর বা চুয়াডাঙ্গার পাশ দিয়া প্রবাহিত কুমারের কি কোন যোগ ছিল? গড়াই-এ পূর্বের চেয়ে জলের স্রোত বর্ষাকালে কমিয়া গিয়াছে বলিয়া যদুবয়রা গ্রামের অধিবাসীদের বিশ্বাস, সে রকম গর্জন আজকাল আর বর্ষায় শোনা যায় না। (চুয়াডাঙ্গা মহকুমায় মাথাভাঙ্গার সংস্কারের জন্য মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়ের নামে একটি খাল কাটা হয়, তাহাতেও কোনও উপকার হয় নাই।)

নদীর এক অংশ যদি নদী হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, বর্ষাতেও সে পথে জল না চলে, তবে তাহাকে 'ডামোশ' (অক্স-বো লেক) বলে। বর্ষায় যদি জল চলে অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হইয়া যায়, তবে ইহাকে 'কোল' বলে (দি মাইনর চ্যানেলস ইন এ ব্রেডেড ষ্ট্রীম)।

পুকুর, কুয়া ইত্যাদি—জেলার সর্বত্র মাটির পাট দেওয়া (একহারা অথবা দোহারা) কুয়ার চলন বেশী। আজকাল অবশ্য নলকূপ খুব হইতেছে। কিন্তু রাণাঘাট ও সদরে তৎসঙ্গে পুকুর ও দীঘিও কিছু কিছু আছে। কুয়াই প্রধান। কুষ্টিয়া মহকুমায় বাড়ি নির্মাণের সময়ে একটি ছোট পুকুরের মত খোঁড়া হয়, সম্বৎসর জল থাকে, রান্না বা বাসন মাজার জন্য ইহার জল

ব্যবহৃত হয়। ইহাকে 'মেঠেল' বলে। বর্ষায় কুয়ার জল কুষ্টিয়া অঞ্চলে খুব কাছে আসে, হাতে করিয়া জল তোলা যায়, অপর সময়ে ৭।৮ হাত নীচে নামে।

চাষ ঃ—নদীয়া জেলাতে আউশধানের চাষ বেশী; বর্ধমান, কাটোয়া হইতে আমন শহরে চালান আসে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন মহকুমায় যে সকল চাষ হয় তাহার ফর্দ দেওয়া গেল ঃ রাণাঘাট—তরিতরকারি (কুমড়া, কপি প্রচুর), পাট, রবিশস্য। সদর—আখ, পাট, রবিশস্য, কলাই। মেহেরপুর রবিশস্য লঙ্কা, হলুদ, কলাই প্রভৃতি। চুয়াডাঙ্গা—তিসি, সরিষা, হলুদ, পাট, আখ পান। কুষ্টিয়া—পেঁয়াজ রসুন প্রভৃতি, পাট, আখ।

দরশনা ও পলাশীতে চিনির কল হওয়ার ফলে সদরেও কাছাকাছি আখের চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কাঠ ঃ—সদর ও রাণাঘাট মহকুমায় বেশ ভাল দেশী সেগুন উৎপন্ন হয়, যথেষ্ট চালান যায়। রেল কোম্পানি কিছু কিছু গাছ রোপণ করিয়াছে। বীরনগরে রোপণ আরম্ভ হইয়াছে।

তেল ঃ—সরিষার তেলই ব্যবহার হয়, কিছু তিলের তেল মাখিবার জন্য চলে। চালানী তেলই বেশী।

দুধ ঃ—দুধের অবস্থা জেলায় মোটের উপর খুব ভাল নয়। তবে কুমারখালি বা কুষ্টিয়া অঞ্চলে বেশ পাওয়া যায়। শীতের দিনে ৵১৫/০ সের হয়, বর্ষায় ৵১০/৴০। সহরে আরও কিছু বেশী দর পড়ে।

খাবার ঃ—সাধারণতঃ চিড়া, মুড়ির চলন আছে। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ খাবারের জন্য কয়েকটি স্থানের প্রসিদ্ধি আছে। রাণাঘাটের পান্তুয়া, মুড়াগাছার ছানার জিলিপি, কৃষ্ণনগরের সরভাজা ও সরপুরিয়া, কুমারখালির খাগড়াই (চিনির পাকের খই, কখনও বা এলাইচ সংযুক্ত) ও 'মটকা' (খাজার মত জিনিস), শান্তিপুরের খাসা মোয়া এবং নিখুঁতি নাম করা খাবার।

গুড় ঃ—খেজুরের গুড় চুয়াডাঙ্গা, রাণাঘাট, মেহেরপুর মহকুমায় বেশ ভাল রকম হয়। গুড়ের কাজ মুসলমান চাষীরাই বেশী করে।

মাছ ঃ—কুষ্টিয়া মহকুমাতে মাছ বেশী। বর্ষার দিনে পদ্মায় ও গড়াই নদীতে বাদামের নৌকা (বাদামী রং? বাদামের মত গড়ন?) ইলিশ মাছ ধরিবার জন্য নদী ছাইয়া ফেলে। উহা কুষ্টিয়া হইতে চালান যায়। বর্ষার শেষে টাঁই মাছও বেশ ওঠে। অন্যান্য মহকুমায় মাছের অবস্থা সাধারণ।

মাংস :—সদর ও মেহেরপুর মহকুমায় বিক্রয়ের জন্য হাঁস, মুরগী, ছাগল, ভেড়া পালন হয়। এগুলি কলিকাতায় চালান যায়। (তুলনা—মুর্শিদাবাদ)

ঘরবাড়ি :—জেলায় সর্বত্র মাটির দেওয়াল দেওয়া রীতি, উলুখড় দিয়া চাল ছায়। তবে চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া মহকুমায় কিছু কিছু টিনের ঘর (চাল ও দেওয়াল) হইয়াছে। কোঠাবাড়ির চলন জেলার সর্বত্র যথেষ্ট দেখা যায়। কুষ্টিয়া মহকুমায় গরীবে ছিটে বেড়ার ঘরও করে।

আসবাব :—গরীবের ঘরে মাদুর ও কাঁথার ব্যবহার দেখা যায়। জেলার সর্বত্র হাটে প্রচুর মাদুর বিক্রয় হয়।

জ্বালানি :—কাঠ ও ঘুঁটে সর্বত্র চলে, রাণাঘাট ও সদরে কয়লা কিছু বেশী চলে, অন্যত্র অপেক্ষাকৃত কম।

শিল্প :—কাপড়ের কাজ,—রাণাঘাট মহকুমায় শান্তিপুরের তাঁতের কাজ বিখ্যাত। বহু জায়গায় ধুতি ও শাড়ী চালান যায়। মেহেরপুরেও তাঁতের কাজ হয়। চুয়াডাঙ্গায় জোলারা লুঙ্গি, গামছা প্রভৃতি বুনিয়া বিক্রয় করে। কুষ্টিয়াতে সূতা রং করিয়া যথেষ্ট বিক্রয় হয়। বসাক-তাঁতি ও জোলারাই কপড়ের কাজ করে। শোলার কাজ—সদরে মালাকর জাতি ও মেহেরপুরে মাহিষ্যেরা সোলার সাজ, হ্যাট্ প্রভৃতি গড়িয়া চালান দেয়। হ্যাটের শেষ কাজ (কাপড়ের) অন্যত্র হয়। মাদুলি—শান্তিপুরে মাদুলির খুব বড় কারবার আছে। এখানে তৈয়ারি করিয়া অন্যত্র চালান দেয়। কাঁসার কাজও আছে। ইহা কাঁসারিদের হাতে। পুতুল—নদীয়া জেলার মাটির বা কুমোরের কাজ বিখ্যাত। কৃষ্ণনগরের পুতুল বাঙলার সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ধামা—ধামা ও বেতের কাজ যশোহর জেলার মত। মেহেরপুর মহকুমায় মুচিদের একশ্রেণী করিয়া থাকে। তেল—চুয়াডাঙ্গায় কলু, মুসলমান, কুষ্টিয়াতে হিন্দু বেশী (?)। এক বলদের ঘানি।

বিদেশী শিল্প :—কুষ্টিয়ায় মোহিনী মিলস্ ও কিছু কিছু মোজার কল আছে। বরফের কলও আছে। দর্শনা ও পলাশীতে ইংরাজ কোম্পানীর চিনির কল আছে। দর্শনাতে মদ চোলাইএর কাজও হয়।

হাটবাজার, গঞ্জ :—রাণাঘাট মহকুমা—রাণাঘাট, হরিণঘাটা, চাকদহ। সদর—কালীগঞ্জ ভূষিমালের ও সোলার টুপির বড় কেন্দ্র; বেথুয়াডহরি, পলাশী, বড় আঁদুলিয়া; চুয়াডাঙ্গা—কৃষ্ণগঞ্জ, আলমডাঙ্গা; কুষ্টিয়া—

কুমারখালি—সুতার কাজ, আখের গুড়, তামাক, অল্প পাট; মেহেরপুর - বৈদ্যনাথতলার হাট বেশ বড়।

মেলা :—রাণাঘাট—শান্তিপুরের রথ ও রাসের মেলা। সদর—কৃষ্ণনগরের বারদোল; নবদ্বীপ—ঝুলন ও বৈষ্ণব পর্ব। চুয়াডাঙ্গা—শিবনিবাসে শিবরাত্রিতে বড় মেলা হয়। সেইখানে লাঙ্গলের ঈশ বিক্রয় হয়, তাছাড় সাধারণ জিনিসও আসে।

যাতায়াত :—জেলায় গরুর গাড়ীর যথেষ্ট চলন। গরু ও ঘোড়ার পিঠে (বিশেষ করিয়া কুষ্টিয়া মহকুমায়) মাল লইয়া যাওয়া আসা আছে। যেখানে নদীতে সম্ভব সেখানে নৌকায় মাল চলাচল করে। তাছাড়া রেল এবং মোটর চলে।

মানুষ :-চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া মহকুমায় মুসলমান চাষীর সংখ্যা বেশী। অন্যত্র চাষীর মধ্যে মাহিষ্যেরা প্রধান (বিশেষতঃ মেহেরপুরে)। ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালীদের মধ্যে তিলি জাতির হাতে বেশী। মাড়োয়ারী ব্যবসাদারও কিছু কিছু আছে। গরু, ভেড়া চালানের কাজ মুসলমানদের হাতে। মাছ ও নৌকার কাজ মালো জাতিতে করে, তাহারা জেলার মধ্যে একটি বিশিষ্ট প্রভাবশালী সম্প্রদায়। গোয়ালাদের আর্থিক অবস্থাও ভাল (মেহেরপুর)। মুসলমানেরা সচরাচর গরীব। চুয়াডাঙ্গা মহকুমায় কিছু মুসলমান মহাজন ও ব্যবসাদার আছে। কুষ্টিয়া, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি মধ্যবিত্তপ্রধান শহর। এগুলি প্রাচীন শহর।

সামাজিক ব্যবস্থা :-জেলায় সর্বত্র গাঁতা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে।

উৎসবাদি, আমোদ প্রমোদ :—রাণাঘাটের মধ্যে শান্তিপুরাদিতে সখের থিয়েটার ও যাত্রার দল অনেক আছে। মেহেরপুর মহকুমায় মাণিকপীরের গানের চলন ও হরিনামের বহু দল আছে। চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়াতে বেহুলার ভাসানের চলন যেন বেশী, অনেকগুলি সখের দল আছে।
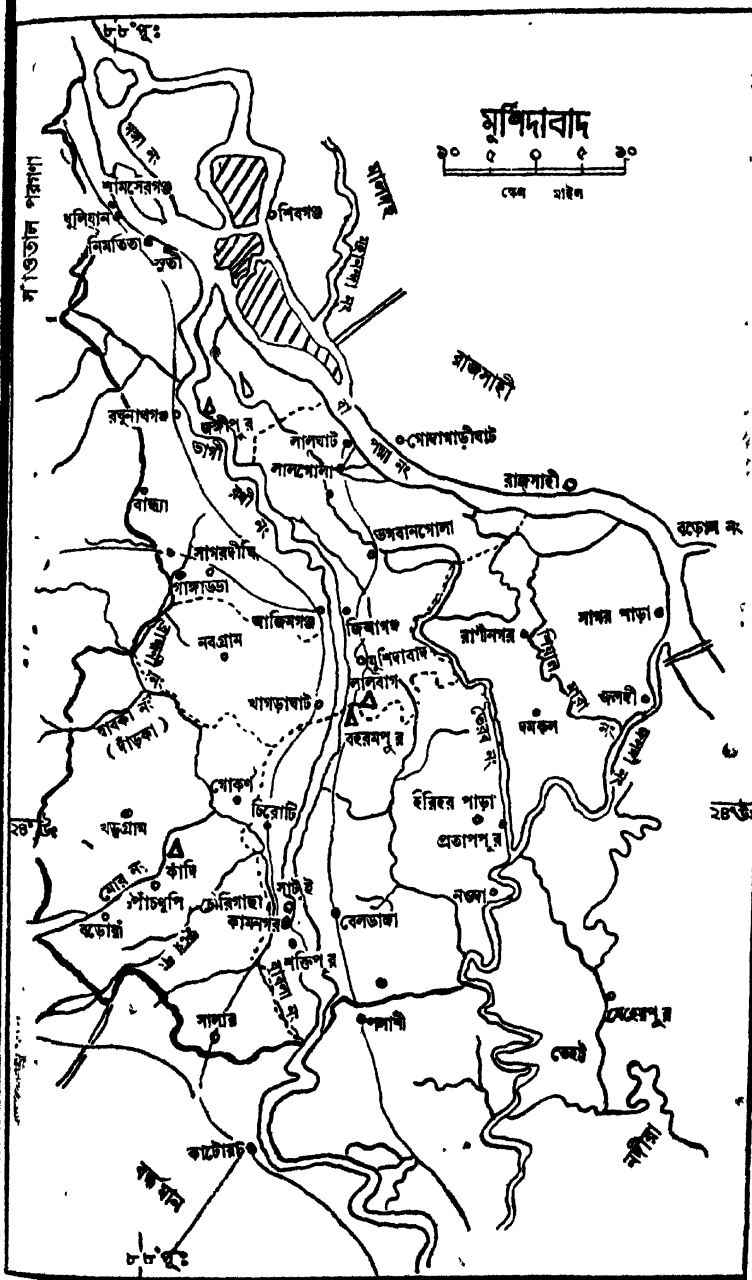
মুর্শিদাবাদ
১০ ৫ ০ ৫ ১০
স্কেল মাইল
রাজসাহী
গোদাগাড়ীঘাট
রাজসাহী
পদ্মা নং
লালগোলা
ভগবানগোলা
জিয়াগঞ্জ
আজিমগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ
লালবাগ
বহরমপুর
খাগড়াঘাট
নবগ্রাম
সাগরদীঘি
ধুলিয়ান
নিমতিতা
শিবগঞ্জ
জঙ্গীপুর
রঘুনাথগঞ্জ
বাড়্‌লা
গোকর্ণ
চিরোটি
খড়গ্রাম
কান্দি
বেলডাঙ্গা
শক্তিপুর
সালার
পলাশী
কাটোয়া
বর্ধমান
নদীয়া
হরিহর পাড়া
প্রতাপপুর
সাগর পাড়া
রাণীনগর
জলঙ্গী
ডোমকল
তেহট্ট
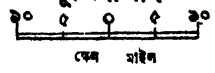
মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদ প্রেসিডেন্সী বিভাগের একটি জেলা। জেলায় চারটি মহকুমা।

সদর মহকুমার থানাঃ বহরমপুর, নওদা, হরিহরপাড়া, দমকল, জলঙ্গী ও বেলডাঙ্গা।

লালবাগ মহকুমার থানা ঃ মুর্শিদাবাদ (লালবাগ), লালগোলা, রাণীনগর, ভগবানগোলা, জিআগঞ্জ ও নবগ্রাম।

জঙ্গীপুর মহকুমার থানা ঃ রঘুনাথগঞ্জ (জঙ্গীপুর), সাগরদীঘি, সুতী, সমসেরগঞ্জ ও ফরাক্কা।

কাঁদি মহকুমার থানা ঃ কাঁদি, খড়গ্রাম, বড়োয়াঁ ও ভরতপুর।

মাটি ঃ—মাটি হিসাবে মুর্শিদাবাদ জেলাকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়—কালান্তর, বাগড়ি ও রাঢ়। সদর মহকুমার মধ্যে বেলডাঙ্গা হইতে কিছু পূর্বে (প্রায় ৩ মাইল) নওদা থানা পর্যন্ত কালান্তর। ইহা খুব কাল, চিটে, আঁঠাল মাটি, প্রায় মধ্য ভারতের কৃষ্ণ মৃত্তিকার (ব্ল্যাক কটন সয়েলের) মত দেখিতে। ইহাতে কয়েক মাস জল থাকে, পথঘাট নির্মাণ করা অতিশয় কষ্টকর। বাগড়ি ভাগীরথীর পূর্বদিক হইতে পদ্মা পর্যন্ত বিস্তৃত। (লালগোলা, ভগবানগোলা, রাণীনগর, জলঙ্গী, দমকল, লালবাগ, বহরমপুর, বাগড়ি)। ধুলিয়ান সামসেরগঞ্জও বাগড়ির মধ্যে পড়ে। এখানে মাটি দোআঁশ, গঙ্গার চরগুলিতে বেলে-দোআঁশ। নীচু জমিতে পলি পড়িয়া লাল রং হয়, ডাঙ্গা জমি কাল। উভয়ই গরমে ফাটে এবং ইহাতে ঘুটিং জমে (অত্যন্ত শুষ্ক দেশ), কাদায় চিট খুব (প্রবাদ—'ভক্তিমান কাদা')। কাঁদি মহকুমায় প্রায় এঁটেল ('মেটেল' বলে। ইহা খুব চিট, শুখাইলে ফাটিয়া ফাটিয়া যায়, কাল রং)। কিন্তু গঙ্গার পর মাইল চারেক দোআঁশ। জেলার পশ্চিম ভাগে রাঢ় দেশের মত মাটি, তিন রকম,—'বেলে', 'মোটা', 'এঁটেল'। বেলেতে ধান ও আলু হয়, এঁটেল পুকুরের গাবার চিট মাটি, মোটা উভয়ের মাঝামাঝি। পুকুরের এঁটেলেতে পুনকো ও পাটশাক শুধু হয়, অন্য কিছু করে না। কাঁকুরিয়া অঞ্চলে গাছপালা ছোট ছোট, খেজুর গাছ বেশী। ভূমি উঁচু ও নীচু।

বরওয়ান প্রভৃতি অঞ্চলে ও অন্যত্র আগে রেশমের জন্য মাটি উঁচু করিয়া তুঁতের চাষ করা হইত। এখন সে শিল্প নাই, ফলে জমিগুলি আবার কাটিয়া নামাইতে হইতেছে। নদীর চরের জমিকে দিয়াড়ের জমি বলে।

নদনদী :—ভৈরব প্রায় মরিয়া গিয়াছে। ভাগীরথীর জলও খুব কমিয়া গিয়াছে, কিছুকাল আগে বেশ বন্যা হইয়াছিল। দ্বারকা, কুয়ে, ময়ূরাক্ষীর জল বর্ষায় নামিয়া ভাগীরথীতে পড়িতে না পারার ফলে (রেল লাইন ও ভাগীরথীর বাঁধ) চিরোটী-গোকর্ণ রাস্তার কাছ হইতে দক্ষিণে ১০।১২ মাইল পর্যন্ত এক বিরাট বিল রচিত হয়, তখন স্বচ্ছন্দে রেল লাইন হইতে কাঁদি পর্যন্ত সোজা নৌকায় চলাচল করা যায়। ইহাকে গো-কর্ণের দক্ষিণে হিজলের বিল বলে। এই অঞ্চলে 'শাবলদ' নামে গ্রাম আছে। আগে তাহার বাঁধ ভাঙ্গিলেই লোকে বুঝিত এবার বন্যা হইবে। আজকাল নিয়তই বন্যা হইতেছে। 'ভাঙ্গল শাবল' বাজল মাদল'—হয়ত মাদলযোগে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বন্যার সংবাদ পাঠান হইত। ময়ূরাক্ষীর লাল পলি যেখানে পড়ে, সেখানে বেগুন, কাঁকুড়, খেঁড়ো ও অন্যান্য সকল শস্য অসম্ভব হয়।

বর্ষার সময়ে কালান্তরে জল দাঁড়ায় এবং আষাঢ় হইতে আশ্বিন-কার্তিক মাস পর্যন্ত থাকে। (দাঁড়কা, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতির ধারে জমিদারী বাঁধগুলি প্রায়ই ভাঙ্গা, তাই খড়গ্রাম প্রভৃতিতে বানের জল আসে, কিন্তু নিকাশ ভাল হয় না বলিয়া ধান হাজিয়া যায়। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল।)

জল :—বাগড়ি অঞ্চলে পুকুর অপেক্ষাকৃত কম, গঙ্গার জল নামিয়া গেলে পুকুরের জলও নামিয়া যায়। তাই ইঁদারা ও কুয়ার চলন বেশী। মাটির পাট দিয়া কুয়া বাঁধে, ডবল পাট ব্যবহার করে, তাহাদের মধ্যে ৪ আঙ্গুলের ব্যবধান থাকে, ঐ অংশ মাটি দিয়া ভরিয়া দেয়। আজকাল কংক্রীট দিয়াও মাঝখানে অংশ ভরান হয়। একহারা পাটের কুয়ারও চলন আছে। লালগোলার মহারাজ জেলার সর্বত্র কুয়া কাটানর জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়াছেন, তাহার সুদ হইতে জেলাবোর্ড সমগ্র জেলায় বহু ইঁদারা নির্মাণ করাইয়াছেন। জল সচরাচর বাগড়িতে ৩০ ফুট নীচে। বর্ষার সময়ে জল কাছে আসে। কালান্তরে নলকূপ হইয়াছে, তাহার ফলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে। বাদশাহী সড়কের [(১) রাজমহল-কাঁদি-সাঁইথিয়া (২) বহরমপুর-কৃষ্ণনগর] ধারে ধারে দীঘি আছে, তাহা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কাঁদি মহকুমায় পুকুর বেশী কুয়া সেখানে শুকাইয়া যায়।

চাষ:—(ক) কালান্তর—এখানে অসম্ভব রকমের ধান হয়। (চাষীরা হিন্দু, মাহিষ্য। মুসলমান চাষীও আছে।) ধান নৌকায় বসিয়া কাটিতে হয়, শুধু আগা কাটিয়া লয়। ধানের পরে মাঠে খেসারি ছড়াইয়া দেয়। বহু বহু গোয়ালা এই অঞ্চলে বাস করে। খেসারি কিছু বড় হইলে, পাকিবার পূর্বেই গোয়ালারা চাষীর কাছে খেসারির ক্ষেত বিঘা পিছু ৩।৪ টাকা হইতে ৭।৵ টাকায় ডাকিয়া লয় এবং নিজেদের গরু মহিষ একত্র করিয়া বহু বাথান করে। গরুকে সেই খেসারির গাছ খাওয়ায় এবং সমগ্র টাকা নিজেরা গরুর সংখ্যা অনুসারে ভাগ করিয়া লয়। চাষীকে তাহার প্রাপ্য টাকা দুই-তিন মাসে কিস্তিবন্দিতে শোধ করে। কালান্তরে শীতের সময়ে বাথান ও "কারখানায়" ভরিয়া থাকে, বর্ষায় জল ও ধানই দেখা যায়।

(খ) বাগড়ি—(১) দিয়াড়ের জমি—দিয়াড়ে প্রধানতঃ মুসলমানরাই চাষ করে। তাহারা ছাড়া ডোমিসাইলড্ একটি হিন্দুস্থানী জাতিও এখানকার খুব ভাল চাষী। তাহাদের 'চাঁই' বলে। চাঁই তরি-তরকারীর চাষ প্রধানতঃ করে। তাহা ছাড়া তরমুজ, খরমুজ, কাঁকুড়, বাখারি (কাকড়ি হিল) প্রভৃতি যথেষ্ট উৎপাদন করিয়া বিক্রয় করে। বাখারি চিচিঙ্গার মত লম্বা এক প্রকার কাঁকুড় জাতীয় ফল। চাঁই তরি-তরকারী সময়ের কিছু আগে আগে উৎপন্ন করে বলিয়া লাভও বেশ করে। তরকারীর বিশেষ চাষ বাদ দিলে দিয়াড়ের জমিতে প্রধানতঃ দুইটি ফসল হয়—আউশ ধান অথবা পাট এবং কলাই ও রবিশস্য।

আউশ ধানের মত দিয়াড়ের জমিতে 'ভাদুই' ধান বোনে। বৈশাখে বুনিয়া গঙ্গার জল আসিতে আসিতে শ্রাবণে তুলিয়া লয়। ('কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা'—রবীন্দ্রনাথ)

জল নামার সঙ্গে সঙ্গে বিরিকলাই দেয়। এদেশে ভাজা কলাই খায়, বর্ধমান ডিভিসনের মত কাঁচা কলাই খায় না। কলাই না হইলে গম, যব, ছোলা, মটর, গুঁজে (সুরগুঁজা) ও সরিষা কেনে। মেথি, ধনে, কালজিরা ইত্যাদিও ধুলিয়ানের নিকটবর্তী অঞ্চলে কিছু কিছু হয়।

(২) চর ছাড়া অপর অংশে আউশ বা পাট বোনে। খারাপ জমিতে শ্যামা, কোদা ও কাওয়ান বোনে। চীনাব চলন নাই। (কোদার মধ্যে একটির নাম 'পাগলাকোদা', তাহা খাইলে নাকি মানুষ পাগল হইয়া যায়, তাই চাষীরা সেই গাছ বাছিয়া ফেলে।)

গরুকে খাওয়াইবার জন্ত জুনরি (এখানে ভুল করিয়া 'বজরা' বলে) বোনে, তাহার গাছ কাটিয়া গরুকে খাওয়ায়; কিন্তু শস্য সাধারণতঃ কেহ খায় না। ডাঙ্গা জমিতে অড়হর, হলুদ ও লঙ্কা যথেষ্ট চাষ করে। পেঁয়াজও খুব চালান যায়। চৈতালি ফসলের মধ্যে ছোলা, মটর প্রভৃতি এবং কিছু যব, গম হয়।

চর এবং ডাঙ্গা উভয় জমিতেই আলু প্রায় করে না। পটল খুব বেশী হয়, তাহা ছাড়া শাকপাতা, মূলা, বেগুন যথেষ্ট হয়। শাকের মধ্যে জঙ্গীপুরে মেথি, সরিষা, ছোলা, মটর প্রভৃতির খুব ব্যবহার আছে। [বাগড়িতে কিছু কিছু আমন (মোটা) হয়, যথা স্থতীথানায়। অন্যত্র একটি আমন লাগায় তাহা কার্তিকে ওঠে তাহাকে 'কাইতক্যা ডেঁপু' (কার্তিকের অকালপক্ক বলে)।

বাগড়িতে কিছু তিসির চাষও হয়, তাহার তেল খায়। জঙ্গীপুর মহকুমায় এক সময় খুব লাক্ষার চাষ ছিল। এখন কৃত্রিম গালার চলন হওয়ার পরে লাক্ষার চাষ খুব কমিয়া গিয়াছে।

(গ) রাঢ়—প্রধানতঃ সরু আমন ধান হয়। কাঁদি মহকুমায় আলু যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। চৈতালির মধ্যে কিছু বুট ও সরিষা এবং নদীর ধারে খেসারি হয়। কাঁদি, লালবাগে (পশ্চিমে) খুব তালগাছ আছে। গরীবের চৈত্র-জ্যৈষ্ঠে তাড়ি বড় খাদ্য। বরওয়ান অঞ্চলে প্রচুর আলু হয় ও তাহা পাঁচথুপিতে বাজারে বেশ বিক্রয় হয়।

তৈল :—বাগড়ি ও কালান্তরে মসিনার তেল কিছু কিছু খায়, চালানী সরিষার তেলই প্রধান।

ফলের চাষ :—আম প্রচুর ও ভাল উৎপন্ন হয়। লেবুও বেশ হয়। জঙ্গীপুর মহকুমার আম, কাঁঠাল ও লিচুর বড় ব্যবসা আছে। কোন কোন বাগানে ফল বিক্রয় না করিয়া শুধু কলম করা হয় ও সেই কলম অন্যত্র চালান দেওয়া হয়। কাঁদির আশেপাশে ভাল নারিকেল হয়, কাছাকাছি আর কোথাও হয় না।

দুধ :—(১) জঙ্গীপুর মহকুমায় হিন্দু পশ্চিমা গোয়ালা আছে, তাহারা বাংলা কথাই বলে তবে বাঙালী গোয়ালাদের সঙ্গে তাহাদের বিবাহাদি হয় না। এখানে গরুই বেশী, কিছু মোষ আছে। গরু অপেক্ষাকৃত ভাল জাতের, তবে ২ সের দুধ দেয়, ৭।৮ সের কচিৎ পাওয়া যায়। গরুর খাদ্য হিসাবে গম, যব, কলাইএর গাছ মাড়ার পর শুখাইয়া রাখে। তাহাকে 'ভূষা' বলে। কলাইএর ফসল ভাল না ধরিলে চাষীরা গোয়ালাদের কাছে ক্ষেতশুদ্ধ বিক্রয় করিয়া

দেয়। পরে ক্ষেতে গরু ছাড়িয়া তাহা খাওয়ায়। (ইহারা ছানা বেশী করে না, ঘি বিক্রয় করে, দুধ-ক্ষীর বেচে)।

(২) *কালান্তরে বাঙালী গোয়ালা। তাহারা যেভাবে খেসারির ক্ষেত কেনে তাহা বলা হইয়াছে। ১০০ বিঘার মত জমিও গোয়ালারা কয়েকজন মিলিয়া কিনিয়া লয়। ঐখানে তাহারা 'বাথান' ও 'কারখানা' করে। গোয়ালারা অতি প্রত্যুষে গরু চরাইতে লইয়া যায়, তাহাকে 'নিগোর চাটান' (নীহার চাটান) বলে; ইহাদের বিশ্বাস শিশিরের জল খাইলে গরুর দুধ ভাল হয়। বাথান অগ্রহায়ণ হইতে পৌষ মাঘ পর্যন্ত থাকে। শুধু পুরুষরাই সেখানে থাকে, মেয়েরা যায় না। কারখানায় রাত্রের দুধ শিশিরে রাখিয়া ভোরে 'মাথন' দিয়ে ময়। ননী হইতে ঘি করে। স্কিমড্ মিল্ককে 'সোয়া তোলা দুধ' বলে। সোয়াতোলার পর অবশিষ্ট দুধ কম দরে বিক্রয় করে অথবা ঘোল করিয়া বেচে। (কালান্তরে গোয়ালারা লেখাপড়া জানে না, দড়িতে গিরো দিয়া হিসাব করে বা রাখে)।

বেলডাঙ্গা হইতে নবদ্বীপে ছানা চালান যায়, শক্তিপুরের কাছে শাটুই হইতে কলিকাতাতেও খোয়াক্ষীর ('মোয়া' বলে) চালান যায়।

(৩) হিজলের বিলে (কাঁদি) বাঙালী ভাষাভাষী জোয়ান 'আহির' গোয়ালারা ঐরূপ বাথান করে। সেখানেও গরু ও মোষ দুইই পালে। বর্ষায় বান হয় বলিয়া গরু-বাছুর সাঁওতালদের জমা দেয়, তাহারা বর্ষার কয়েক মাসের জন্য সাঁওতাল পরগণায় গরু চরাইয়া আসে।

(৪) বহরমপুরের কাছাকাছি দুধ আক্রা। বহরমপুর হইতে লালবাগের পথে (মাইল দুই দূরে) আমিনগঞ্জের ১০০।১৫০ ঘর হিন্দুস্থানী গোয়ালা আসিয়া বসবাস করিতেছে এবং চাষ ও গো-পালন আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা নিজেদের 'আহিরি গোয়ালা' বলে।

খাবার:—গুড় বিশেষ ভাল নয়। ১৫ সের ২০ সেরের মত আখের গুড়ের 'চাকি' পাওয়া যায়। খেজুরের গুড় হয় না।

মুড়ির খুব চলন আছে। তাহা ছাড়া চিঁড়া, খৈ, মুড়কিও বেশ চলে। (বারুইরা দক্ষিণ দেশের মত মুড়ি ভাজে, অন্য জাত আগে চাল গরম না করিয়া ভাজে বলিয়া ভাল মুড়ি হয় না। চালভাজার মত হইয়া যায়)।

দুধের খাবারের মধ্যে শাটুই (শক্তিপুর) এর মোয়া (খোয়া ক্ষীর) বিক্রয় হয়। বেলডাঙ্গার 'মনোহরা' মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ খাবার। (জেলার

উত্তরভাগে ছাতুর খুব চলন আছে। রুটিও অনেকে খায়, এমন কি কলাই পিশিয়া তাহার রুটিও করে)।

মাছ :—লালগোলা, বেলডাঙ্গা এবং (হিজলের বিল, তেলকালির বিল হইতে বেলডাঙ্গায় ওঠে) ধুলিয়ান হইতে মাছ কলিকাতায় খুব চালান যায়।

মাছের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অপর কিছু নাই। নদীয়ার অম্বরপুর (বহরমপুর হইতে ৬০ মাইল) হইতে রোজ সাইকেলে কিছু মাছ বহরমপুরে চালান আসে। ২।৩ মণ মাছ লইয়া বাঙালী জেলেরা ৮॥টার মধ্যে গোরাবাজার বহরমপুর, খাগড়ার বাজারে আনিয়া দেয়।

ঘ র বা ড়ি :—(১) কালান্তরে ৪।৫ মাস জল থাকে বলিয়া উঁচু ভিটার উপরে বাড়ি করে। মাটির দেওয়াল দেয়। (২) শমসেরগঞ্জ থানায় অনেকে 'টাটির' ঘর করে। টাটি দু'দিকে লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি বাঁখারি দিয়া তাহার মধ্যে কেশে (কাশ), উলুখড় দিয়া তৈয়ারি করে। ভিতর দিকে মাটি লেপিয়া দেয়। সদর, লালবাগ ও জঙ্গীপুরের কিছু অংশে ছাউনি উলুখড়ের করে, ধানের খড়ের চলন কেবল রাঢ় অঞ্চলে আছে। ঘরে সিলিং করে না। সামান্য কানিস্তারার বা অন্যবিধ টিনের ব্যবহার দেখা যাইতেছে।

মাদুর, পাটি :—জলঙ্গীতে কিছু মোটা মাদুর হয়, অবশিষ্ট সব চালানি। শীতলপাটির ব্যবহার কম।

জ্বালানি :—কাঠ, ঘুঁটে বেশী। কাঠের মধ্যে আম, কুল, বাবলা ইত্যাদি প্রধান। কয়লারও কিছু চলন আছে। সাঁইথিয়া এবং মল্লারপুর হইতে কয়লা চালান আসে।

শিল্প :—তাঁত (১) রেশম ও মটকার জন্য মুর্শিদাবাদ বিখ্যাত। মির্জা-পুরের হিন্দু তাঁতিরা রেশমের কাজ করে। জঙ্গীপুরের সিল্ক ও সদরের মটকা প্রসিদ্ধ।

(২) সালার হইতে ৩।৪ মাইল উত্তরে শিমুলিয়া হইতে তাঁতের (সূতী) শাড়ী কলকাতায় চালান যায়। সালারের কাছে টেঁয়া-বৈষ্ণপুর অঞ্চলে কেটের কাপড় তৈয়ারী হয়। জেলায় অনেক জায়গায় মুসলমান তাঁতি গামছা, কাপড় এবং 'তহবন' (=লুঙ্গি) বুনিয়া বিক্রয় করে।

(৩) ধুলিয়ানের কাছে, অরঙ্গাবাদের কাছে সেরপুরে ও জঙ্গীপুরের কাছে গাড়ুলীপাড়ায় উৎকৃষ্ট কম্বল বোনা হয়। ১০।১২ টাকায় খুব ভাল রাগের মত

কম্বল পাওয়া যাইত, রং একেবারে সাদা। এই কাজ হিন্দু বাঙ্গালী কারিগরের হাতে।

কুমোর—সাধারণ। জঙ্গীপুরের শস্যাদি রাখিবার মত বড় বড় কাঁচা মাঁটির জালা ব্যবহৃত হয়, ইহাকে কুঠি বলে। (১।১॥ মণ হইতে ২০।২৫ মণ পর্যন্ত মাল ধরে। দুই ভাগে গড়িয়া তারপর জোড়া দেয়। ছোটগুলিতে জোড়া বা ফুটা দরকার হয় না, উপর হইতে জিনিস বাহির করা যায় 'দাউলি')।

কামার—ধুলিয়ানে খুব ভাল জাঁতি তৈয়ারি হয়। কিছু চালান যায়। দা (লোহার বাঁট), কাতি (=হালকা কাঠের বাঁটওয়ালা দা), হেঁসো বা হাউসা। (এখানে দাঁতওলা কাস্তের চলন নাই), শাবলের পরিবর্তে "খুন্তি" দিয়া মাটি খোঁড়া হয়। এগুলি স্থানীয় কামারেরা গড়িয়া থাকে।

কাঁসা—খাগড়ার কাঁসা বাংলার মধ্যে বিখ্যাত।

বিড়ি—ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদে ৭।৮০০০ লোকে বিড়ির কারখানায় কাজ করে।

শাঁখা—ভৈরবের ধারে কিছু স্থানীয় হিন্দু শাঁখারী আছে (পদবী 'পাল')। ইহারা মোটা কাজ করিয়া বেচে, শেষের কাজটুকু ঢাকায় হয়। সেখানকার ব্যবসাদারগণ ইহা কিনিয়া চালান দেয়।

বালাপোষ—বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদের বালাপোষ বিখ্যাত। সারা উত্তরবঙ্গে (জলপাইগুড়ি পর্যন্ত) এখান হইতে মাল চালান যায়। এক একজন ১২।১৫০০০ টাকার কাজ করে। ৬।৮৲ বা ১২।১৪৲ হইতে ১০০।২০০৲ পর্যন্ত দাম হয়।

হাতির দাঁত—বাঙ্গালী হিন্দু কারিগর এই কাজ করে। বহরমপুরে করে বটে কিন্তু বেশী বিক্রয় দিল্লী, অমৃতসর অঞ্চলে হয়। সে সকল জায়গায়ও বহরমপুরের কারিগর আছে।

মাতুর - জলঙ্গী অঞ্চলে মোটা মাতুর তৈয়ারী হয়।

কাগজ—মহাদেবনগরে (শমসেরগঞ্জ থানা) আমূলে পাট হইতে মুসলমান কাগজীরা কিছু কাগজ তৈয়ারি করে। ঐ পাট কুদরুমের মত গাছ হইতে হয়, পাহাড় হইতে কিনিয়া আনে।

কলু—সরিষা তেলের চলন বেশী। হিন্দু জল অচল, কালাস্তরে ও বাগড়িতে

তদ্ভিন্ন মুসলমান "খুলু"ও আছে। হিন্দু তৈলকারকে 'কুলু' বলে। (কলের তেলই বেশী ব্যবহৃত হয়)।

গরুর গাড়ীর টপ্পর—জঙ্গীপুর অঞ্চলে খুব ভাল তৈয়ারী হয়, দেখিবার মত, ওয়াটার প্রুফ করার জন্য গাবের আটা মাখান হয়। দাম ৩৷৪ টাকা ছিল। সকল জাতের লোক করে।

চামড়ার কাজ—ধুলিয়ান অঞ্চলে স্থানীয় মুচিরা নিজেরা (নাগরা জাতীয়) চামড়ার জুতা তৈয়ারি করে। সেই জুতা গরীব চাষী প্রভৃতিরা ব্যবহার করিয়া থাকে। শক্তিপুর অঞ্চলে কিছু ভাল জুতাও তৈয়ারী হয়।

নৌকা—ধুলিয়ান অঞ্চলে কিছু কিছু নৌকাও তৈয়ারী হয়। দিয়াড়ের অনেক চাষীরই এক একখানা নৌকা আছে। চাষের অবসর সময়ে এই নৌকা বাহিয়া কিছু রোজগার করে।

বিদেশী শিল্প :—বহরমপুরে দুইটি সরিষার তেলের কল আছে। সরিষা, গৌহাটি এবং পাঞ্জাব হইতে চালান আসে। (কিন্তু ইহা জেলার সিকি তেলের চাহিদাও মিটাইতে পারে না। সাহেবগঞ্জ হইতে বেশী তেল আমদানী হয়। স্থানীয় কল দু'টির একটি বাঙালীর, অপরটি মাড়োয়ারীর।) বেলডাঙ্গায় চিনির কল আছে, তাহার ফলে ঐ অঞ্চলে আখের চাষ বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কাশিমবাজারে একটি কটন মিলের পত্তন হইতেছে।

হাট, বাজার, মেলা :—(১) বেলডাঙ্গায় মঙ্গলবারে খুব বড় তরি-তরকারীর হাট বসে, মহিষ, গরুও খুব বিক্রয় হয়। (২) সাঁওতাল পরগণার হিরণপুরের জীবজন্তুর হাট বিখ্যাত। (৩) লালগোলা—বিরাট হাট হয়, সেখানেও গরু, ঘোড়া বিক্রয় হয়। (৪) গঙ্গাড্ডার ৩ মাইল পশ্চিমে চৈত্র ও ফাল্গুন মাসে বন্ধেশ্বরের খুব বড় মেলা হয়। এখানে চাষীর ও গৃহস্থের প্রয়োজনীয় জানালা, কবাট ও অন্যবিধ জিনিস খুব আসে। জঙ্গীপুর অঞ্চলে হাট বিকেলে বসে। [শিরুয়ার (ধুলিয়ান) মেলায় দোকানের সাজ-সরঞ্জাম বড় পরিপাটি হইত, এখন মেলা পড়িয়া গিয়াছে।] (৫) পাঁচথুপিতে রবিবারে গরুর হাট, তদ্ভিন্ন প্রত্যহ দুপুর পর্যন্ত বাজার বসে। (৬) সাগরদীঘিতে শুক্রবার ছাগল, গরু, তরকারী-পাতি যথেষ্ট আমদানী হয়।

চালান :—লালগোলা, ভগবানগোলা ও ধুলিয়ান হইতে কলিকাতায় প্রচুর ডিম, ভেড়া, ছাগল চালান যায়। (মাছ) মরিচ, পেঁয়াজ, পটলও মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে কলিকাতায় যথেষ্ট যায়।

ধুলিয়ান—কলাই, রবিশস্য, পাট, বাঁশ, আম-কাঁঠালের তক্তা খুব চালান যায়।

যাতায়াত :—কালান্তরে রাস্তা ভাল হয় না, বর্ষার পর নৌকায় চলাচল হয়। কাঁদী ও রেল লাইনের মধ্যেও তদ্রূপ। মটর, বাস, গরুর গাড়ী এবং নৌকার বেশ চলন আছে।

সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থা :—জেলায় হিন্দুস্থানী অনেক। কেহ বহু পুরুষ ধরিয়া বাস করিতেছে, কেহ বা অল্পদিন আসিয়াছে। সাধারণ হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার কথা ইহার পরে বলা হইবে।

(ক) চাঁই হিন্দু, পদবী 'মণ্ডল' কোথাও কোথাও মুরগী পোষে ও খায়। পুরুষে চাষ করে, মেয়েরা বেচে। খুব পরিশ্রমী জাত। ভাঙা ভাঙা হিন্দী, অপরের সঙ্গে বাংলা বলে। (খ) গুঁড়ি (কাঞ্চনতলা অঞ্চলে) নাবিকের কাজ করে, আধা বিহারী। (গ) পাঠান-মুসলমান, দীর্ঘকায়। ধূলিয়ান অঞ্চলে সাধারণতঃ মাছ ধরা এবং বিক্রয়ের কাজ করে। লাঠিয়াল, দরওয়ানের কাজ করে। গ্রামের মধ্যে পাঠান পাড়াও থাকে। বাংলা ভিন্ন অন্য ভাষা বলে না। (ঘ) সহরের চাকর-বাকরের কাজ হিন্দুস্থানীরাই করে। (ঙ) ধোপারাও ঐ জাতের। বহরমপুর হইতে তাহারা কাপড় ধুইয়া কলিকাতাতেও রোজগার করে। (চ) সহরের নাপিতও বিহারী। (বাঙালীর মধ্যে মাছ, ডিম, ভেড়া, ছাগল চালানের কারবার মুসলমানেরা করে)।

হিন্দুর প্রাচীন আর্থিক সামাজিক ব্যবস্থা :—বরওয়ান থানায় পাঁচথুপি খুব পুরাতন গ্রাম। সে অঞ্চলে পুরাতন ব্যবস্থা এখনও কিছু দেখা যায়। প্রতাপ-পুর প্রভৃতি গ্রামেও অনুরূপ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। ধোপা-নাপিতদের জমিদারগণ চাকরাণ জমি দিতেন। সাধারণ চাষী ফসলের অংশ দিত। কুমোর, নাপিত, কামার, পারঘাটার মাঝি, ধোপা, চামার ইহারা সকলে চাষার ফসলের একটা অংশ পাইত। ফসলের এইরূপ অংশ গ্রহণকে 'যেঁও সাধা' বলে (যথা, 'কোথা যাচ্ছ?' 'যেঁও সাধতে যাচ্ছি।') শুধু ধানের নয় অন্য ফসলের অংশও ইহারা পাইত। তৎপরিবর্তে কাহার কি কর্তব্য ছিল তাহা নিম্নে নির্দিষ্ট হইতেছে :—

কামার—চাষার কাস্তে, ফাল ইত্যাদি মেরামত ও শান দিবে। তাহা ছাড়া মজুরিও লয়। নাপিত—কামাইবে। কুমোর—হাঁড়ি গড়িয়া দিয়া দাম লইবে, কিন্তু এই চাষার বাঁধা কুমোর হিসাবে থাকিবে। মাঝি—পার করিয়া দিবে।

চামার—গরু মরিলে লইয়া যাইবে। চাষারা যে কাঁচা চামড়ার 'বাধা' (স্ত্যাওাল, নারিকেল দড়ির ষ্ট্যাপ থাকে) শীতের সময়ে পরে, তাহা তৈয়ারি করিয়া দিবে। ধোপা—কাপড় কাচিয়া দিবে।

চাষীদের মধ্যে 'গাঁতিতে' যাওয়ার (বর্ধমান অঞ্চলের ভাষা 'গাঁতা, গাঁতা দেওয়া) প্রথা আছে। যখন 'যো' লাগে (বীরভূমে 'বাত' লাগা) তখন তাড়াতাড়ি চাষের বা অন্যবিধ কাজ সারিতে হয়। সকলে মিলিয়া একজনের জমিতে কাজ করিয়া দেয়। তাহাকেও আবার অপরের জমিতে তেমনি ভাবে খাটিয়া দিতে হয়। ইহা ছাড়া অন্য দেনা পাওনা কিছু নাই। চাষ বা ফসল কাটার সময়ে গাঁতিতে যায়। ('কোথায় যাচ্ছ?' 'আজ আর আপনার কাজ হবে না, গাঁতিতে যাচ্ছি')।

[দুইটি শব্দ—(১) 'সরান' (= সরণী) সকলে চলাচল করে এমন রাস্তা। মাঠে পায়ে চলার পথকে সরান বলা হইবে। (২) 'ডহর'—যাহা সাধারণের চলাচলের পথ নয়। যেমন পথ হইতে বাগানের ভিতর দিকে একটি রাস্তা, যে পথে বেশী লোক যায় না। তেমন পথের শেষে হয়ত ভাগাড় আছে, সেখানে গরু ফেলে, তখন সেই ডহরকে 'গো-ডহর' বলে।

সাঁওতালরা কাঁদীতে কিছু কিছু বসবাস করিতেছে।

দুর্গাপূজার পর একাদশীর দিন বহরমপুরে গরুর গাড়ী সাজাইয়া তাহার দৌড় হয়। গাড়োয়ান অধিকাংশ মুসলমান। তাহাদের মধ্যে যে জেতে সে একটি ঘড়া (তেলে ভর্তি), কাপড়-চোপড় উপহার পায়।

খুলনা

৮৯°পূঃ
খুলনা
১০ ৫ ০ ৫ ১০
স্কেল মাইল
কালিয়া
গোপালগঞ্জ
তেরখাদা
মধুমতী নং
ফুলতলা
পয়োগ্রাম
দৌলতপুর
মোল্লাহাট
ডুমুরিয়া
কলারোয়া
খুলনা
রূপসা
গাওলা
তালা
চিতলমারি
ফকিরহাট
যাত্রাপুর
সাতক্ষীরা
জলমা
চালনা
বাগেরহাট
কচুয়া
দেবহাটা
পাইকগাছা
রাড়ুলি
দাকোপ
আশাশুনি
রামপাল
কালিগঞ্জ
মোরেলগঞ্জ
শ্যামনগর
শরণখোলা
শিবসা নং
পশুর নং
হরিণঘাটা নং
২২°উঃ
৮৯°পূঃ
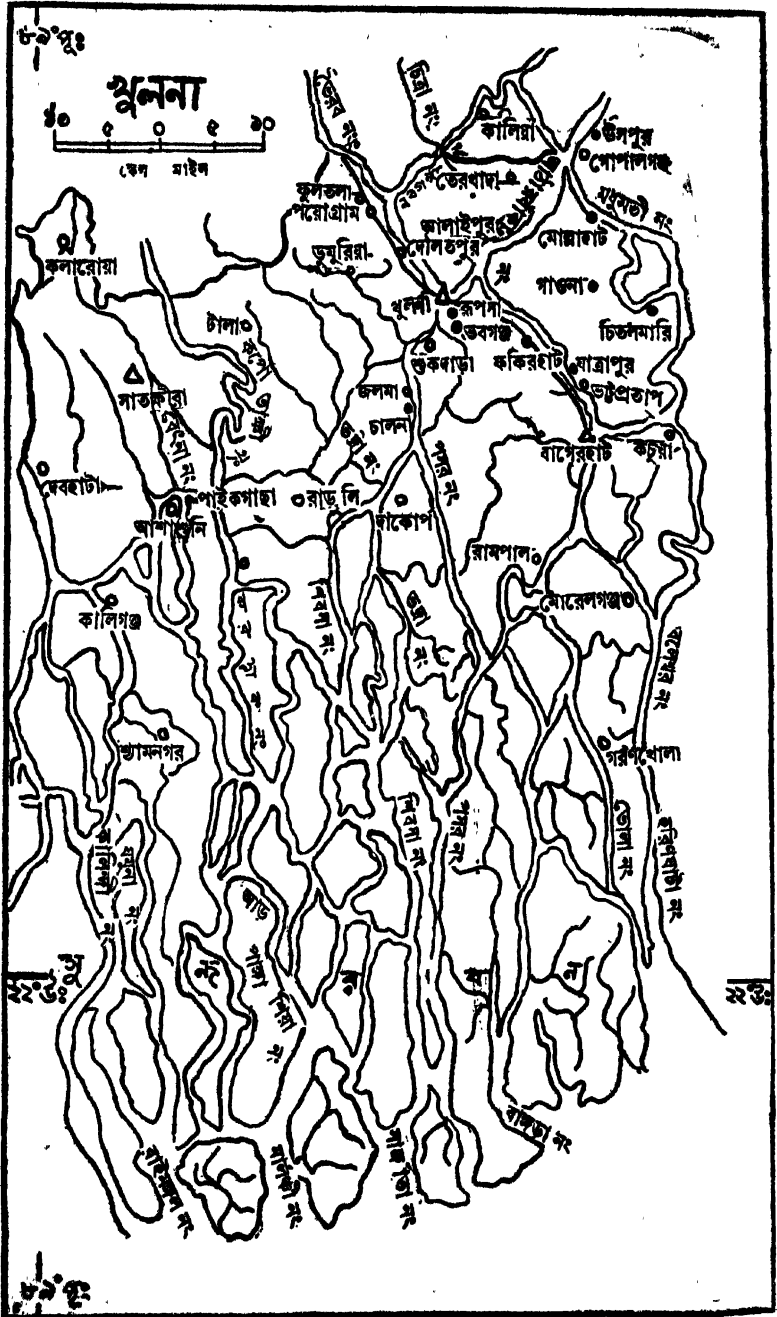
খুলনা প্রেসিডেন্সী বিভাগের একটি জেলা। ইহার তিনটি মহকুমা।

সদর মহকুমার থানা :—খুলনা, তেরখাদা, দৌলতপুর, ফুলতলা, বাতিয়াঘাটা, ডুমুরিয়া, পাইকগাছা, দাকোপ।

সাতক্ষীরা মহকুমার থানা :—সাতক্ষীরা, কলারোয়া, টালা, কালিগঞ্জ, শ্যামনগর, দেবহাটা, আশাশুনি।

বাগেরহাট মহকুমার থানা :—বাগেরহাট, মোল্লাহাট, ফকিরহাট, কচুয়া, রামপাল, মোরেলগঞ্জ, শরণখোলা।

মাটি :—দক্ষিণাঞ্চলে মাটি নোনা। নলকূপে ৫।৬ হাত নীচে বালি পাওয়া যায়।

নদ-নদী :—ভৈরব নদ মৃতপ্রায়। রূপসা, শিবসা ও পসরের অবস্থা ভাল, খুব চওড়া, সারা বৎসর প্রচুর জল থাকে।

পুকুর, কুয়া ইত্যাদি :—জেলায় কুয়া নাই বলিলেই চলে। পুষ্করিণীর প্রচলন বেশী, তাহার পর নলকূপ। আট হাত আন্দাজ গভীর করিলে পুকুরে জল হয়, নলকূপ ১৫ হাত আন্দাজ গভীর হয়। নলকূপে ৫।৬ হাত পরেই বালি বাহির হয়। দক্ষিণাঞ্চলে পানীয় জলের খুব অভাব। লোকে নোনা জলে রান্না করে, পানীয় জল উত্তর হইতে নৌকায় লইয়া যায়।

কৃষিজ দ্রব্য :—(ক) সদর মহকুমা—ধান, গুড়, পাট, নারিকেল, সুপারী, পান, আলু, তরকারী। (খ) বাগেরহাট মহকুমা–পান, সুপারী, ধান। (খ) সাতক্ষীরা মহকুমা—ধান, নল, হোগলা, মাদুরের বেতি। জেলার দক্ষিণ দিকে যে সকল ক্ষেতে নদীর বন্যায় পলি পড়ে, তাহার দাম খুব বেশী। পলি যে জমিতে কম পড়ে তাহার দামও তেমনি কম।

তরিতরকারীর বড় কেন্দ্র ডুমুরিয়া; লেবু, কলা, আনারসের দৌলতপুর।

তৈল :–বাহির হইতে চালানি সরিষার তেলের খুব আমদানী হয়। খুলনা—পূর্ববঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে মাল পাঠাইবার বড় কেন্দ্র। এখানে সরিষার তেল ও কেরোসিনের বড় বড় আড়ৎ আছে। শত শত টিন জমা হয়। এখান হইতে বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় নৌকায় মাল যায়। সেই সকল তৈলবাহী নৌকা উপরোক্ত জেলা হইতে আসিবার সময়ে কখনও চাউল লইয়া আসে।

দুধ :—বাগেরহাটে দেবীর বাজার দুধের একটি কেন্দ্র। সাতক্ষীরাও দুধ ও মাখনের বড় বাজার। মোল্লাহাট ও তেরখাদায় মাখন পাওয়া যায়।

খাবার :—চিঁড়া ও মুড়ির চলন বেশী। সাতক্ষীরার সন্দেশ ভাল।

মাছ :—খুলনা মহকুমায় পাইকগাছার নিকট শুঁটকি মাছ তৈয়ারী হইয়া বিদেশে চালান যায়। জেলার মধ্যে কিন্তু ইহার ব্যবহার নাই। মানসা হইতে জিয়ল মাছ চালান যায়।

মাংস ইত্যাদি :—সদরে গাজীরহাট, দৌলতপুর। বাগেরহাটে ফকিরহাট মাছ, ছাগল, পাঁঠার বড় বিক্রয় কেন্দ্র।

ঘরবাড়ি :—জেলার মধ্যে অধিকাংশ কুটিরের বেড়া চাটাই বা হোগলা এবং কাঠের তক্তা দিয়া হয়। চাল টিন, গোলপাতা ও উলুখড় দিয়া ছাওয়া হয়। জেলার কোন অঞ্চলে কিরকম ছাউনি তাহা বলা হইতেছে—পূর্বে উলুখড় বেশী, টিনের চাল কম। পশ্চিমে—উলুখড় ও টিন সমান সমান। উত্তরে—টিন বেশী, গোলপাতা কম। দক্ষিণে -গোলপাতা বেশী, টিন কম।

ঘরের আসবাবের মধ্যে মাতুরের খুব চলন আছে। মাতুর তৈয়ারীও হয়। তাহা ছাড়া পাটি এবং তক্তাপোষের ব্যবহারও আছে।

জ্বালানি :—কাঠ ও ঘুটে, শুকনা পাতা জ্বালান হয়। সহরে কয়লা বেশী। আজকাল গ্রামেও কয়লা প্রবেশ করিয়াছে।

শিল্প :—ফুলতলা অঞ্চলে আজকাল কিছু কিছু খাদি তৈয়ারী ও বিক্রয় হয়। জেলায় নিম্নলিখিত কেন্দ্রে মাতুর বেশ বিক্রয় হয়, মাতুর তৈয়ারির জন্য বেতি জেলায় যথেষ্ট চাষ হয়—সদরে—চালনা, পাইকগাছা।

তাঁতের কাজ :—সদর—খুলনা, ফুলতলাতে গামছা, মশারি ও খাদি। ফুলতলার তাঁতিরা নানা জায়গায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কাশীতেও ব্যবসা চালাইতেছেন। দৌলতপুরে যথেষ্ট গামছা পাওয়া যায়।

কাঠের কাজ :—বাগেরহাট মহকুমায় বাদালে পিঁড়ে, বারকোষ প্রভৃতি বিক্রয় হয়। সাতক্ষীরা মহকুমায় বড়দলের হাটে ঘরের খুঁটি যথেষ্ট বিক্রয় হয়।

লোহার কাজ :—সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে দা, জাঁতি ইত্যাদি খুব ভাল তৈয়ারি হইয়া থাকে।

মাটীর কাজ :—সদরে খালাইপুর কুমোরদের বড় কেন্দ্র। মাটীর হাঁড়ি, কলসী, মাঠ (জালা) ও মাটীর বাসন এখানে খুব বিক্রয় হয়।

লবণ :—জেলায় সাতক্ষীরা মহকুমায় কিছু কিছু লবণ তৈয়ারি হয়, বড়দলের হাটে বেশ বিক্রয় হয়। কালিগঞ্জেও পাওয়া যায়।

(আধুনিক) বিদেশী শিল্প:—বাগেরহাটে কাপড়ের জামার খুব ভাল ছিট তৈয়ারি হইয়া কলিকাতায় বেশ আদরের সহিত বিক্রয় হয়।

হাট বাজার—[ ] মধ্যলিখিত নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বাহির হইতে আমদানী হয়।

(১) সদর মহকুমা খুলনা—ধান, চাল, পাট, (খেজুরের) চিটেগুড়, নারিকেল, গুড় [কয়লা, টিন, তেল (সরিষা ও কেরোসিন), চিনি, কাপড় ইত্যাদি], ডালা, কুলা প্রভৃতি বাঁশের কাজ। (২) ফুলতলা—গুড়, গামছা, মশারি, খাদি, শোলা, বাঁশ, [(রংপুরের) তামাক]। (৩) ডুমুরিয়া—বেগুন, লঙ্কা, শাকসবজি (পালনশাক, কপি) (৪) জলমা—ধান, চাল। (৫) চালনা—ধান, চাল, দরমা, মাদুর, জ্বালানি কাঠ, গোলপাতা। (৬) খালাইপুর—হাঁড়ি, কলসী, মাঠ, মাটির বাসন, পান। (৭) তেরখাদা—পাট, ধান, চাল, মাখন। (৮) শুকদাড়া ও (৯) ভবগঞ্জ—গরু প্রভৃতি পশুর হাট। (১০) মানসা—(হাট ও রোজ বাজার) জিয়ল মাছ, পান, সুপারী। (১১) দৌলতপুর—আনারস, কলা, পাট, পান, লেবু, খৈ, মুরগী, ডিম, গামছা। (১২) সেনহাটি—নানাবিধ শস্যের গঞ্জ। (১৩) পাইকগাছা—চালানের জন্য শুঁটকি মাছ, মাদুর, চাটাই। (১৪) গাজির হাট—দুধ, গুড়, পাট, মুরগী, মাছ। (১৫) সাপুর—নানাবিধ জিনিসের বিক্রয়কেন্দ্র।

বাগেরহাট মহকুমা—(১৬) বাগেরহাট—সুপারি, পান, নারিকেল, ধান, চাল। (১৭) মোরেলগঞ্জ—ধান, চাল, গুড়, পাট। (১৮) কচুয়া—ধান, চাল, পান, সুপারী, গুড়। (১৯) বাদাল—ধান, চাল, গুড়, পিঁড়ি, বারকোষ প্রভৃতি কাঠের জিনিস। (২০) যাত্রাপুর—পান, সুপারী। (২১) মোল্লা হাট—ধান, চাল, পাট, মাখন। (২২) ফকিরহাট—(হাট ও রোজ বাজার, খুব বড় ব্যবসা কেন্দ্র) ধান, চাল, ছাগল, পাঁঠা, মাছ, দুধ, সুপারী, গুড়। (২৩) বানিয়াসান্তা—ধান, চাল, জ্বালানি কাঠ। (২৪) রামপাল–গঞ্জ। (২৫) দেবীর বাজার—দুধ।

সাতক্ষীরা মহকুমা—(২৬) সাতক্ষীরা—দুধ, মাখন, ওল, কচু। (২৭) বড়দল—(বাংলা দেশের মধ্য বোধহয় বৃহত্তম সাপ্তাহিক হাট)—মাদুর, জ্বালানী কাঠ, স্থানীয় তৈয়ারী লবণ, ধামা, ঘরের খুঁটি, গোলপাতা, চাটাই, কাপড়, টিন। (২৮) কালিগঞ্জ—ধান, চাল, লবণ, আম, কাঁঠাল, দা, কাঁচি, জাঁতি। (২৯) আশাসুনি—গঞ্জ। (৩০) পাটকেলঘাটা—আম, কাঁঠাল, গঞ্জ।

যাতায়াত—নৌকায় ও ষ্টীমারে চলাচল খুব বেশী। মানুষ ও মাল দুইই এই পথে যায়। খুলনা ছ'টি ষ্টীমার লাইনের কেন্দ্র। খুলনা হইতে সাতক্ষীরা, মাদারীপুর, বরিশাল প্রভৃতি জায়গায় ষ্টীমার নিত্য যাতায়াত করে। রেলপথে দক্ষিণ ফরিদপুর ও বরিশাল জেলায় বিক্রয়ের জন্য মাল খুলনাতে নামে। গরুর গাড়ীর চলন আছে।

সামাজিক (অর্থনৈতিক) ব্যবস্থা—নিম্নলিখিত জাতির লোককে চাকরাণ জমি দেওয়া হয়—কুমোর, বাইতি (ইহারা বাজনা বাজায় ; বৃত্তি—চূণ তৈয়ারি করা এবং ডালা, কুলা প্রভৃতি গড়িয়া বেচা), ধোপা ও নাপিত। বাজাদার হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মেরই হয়। কলু—হিন্দু, জলচল। ইহাদের তিলি বলে, উপাধি কুণ্ডু। কুমোর—জলচল। বাইতির জল চলে না। ছুতারের জল চলে না, তাহাদের পদবী 'মিস্ত্রী'। তাঁতিদের মধ্যে (১৷ ক্ষীরতাঁতিদের জল চল, তাহারা কাপড় বোনে। (২৷ অপর 'তাঁতির জল চলে না, তাহারা কাপড়ের ব্যবসা করে। (৩) যুগী জাতি ছোট কাপড় ও গামছা বোনে, তাহাদের জল চলে না।

রাজমিস্ত্রীর কাজ মুসলমানদের প্রায় একচেটিয়া, কিছু কৃষ্ণনগরের কায়স্থও রাজমিস্ত্রীর কাজ করে। মুসলমানেরা অল্প অল্প কাঠমিস্ত্রীর কাজও করিতেছে।

বিভিন্ন জাতির অবস্থান—জেলার উত্তর পূর্ব কোণ হইতে দক্ষিণ দিকে বালেশ্বর নদী ধরিয়া যে অংশ, সেখানে নমঃশূদ্র জাতি প্রধান। তদ্‌ভিন্ন মুসলমান চাষীও আছে। তেরখাদা, মোল্লাহাট, গাওলা, চিতলমারি হইতে দক্ষিণে শরণ খোলা মোরেলগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে নমঃশূদ্ররাই প্রবল।

সাতক্ষীরা মহকুমার হিন্দু চাষীর মধ্যে পোদ এবং নমঃশূদ্র প্রধান। তদ্ভিন্ন অপর চাষী মুসলমান। সাতক্ষীরা রামপাল, পসর নদীর ধাবে ধারে, চালনা, দাকোপ প্রভৃতিতে পোদরাই প্রধান।

খুলনা সদর, রূপসা, ফকিরহাট, যাত্রাপুর, বাগেরহাট, প্রভৃতি অঞ্চল মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি জাতি প্রধান

যশোহর
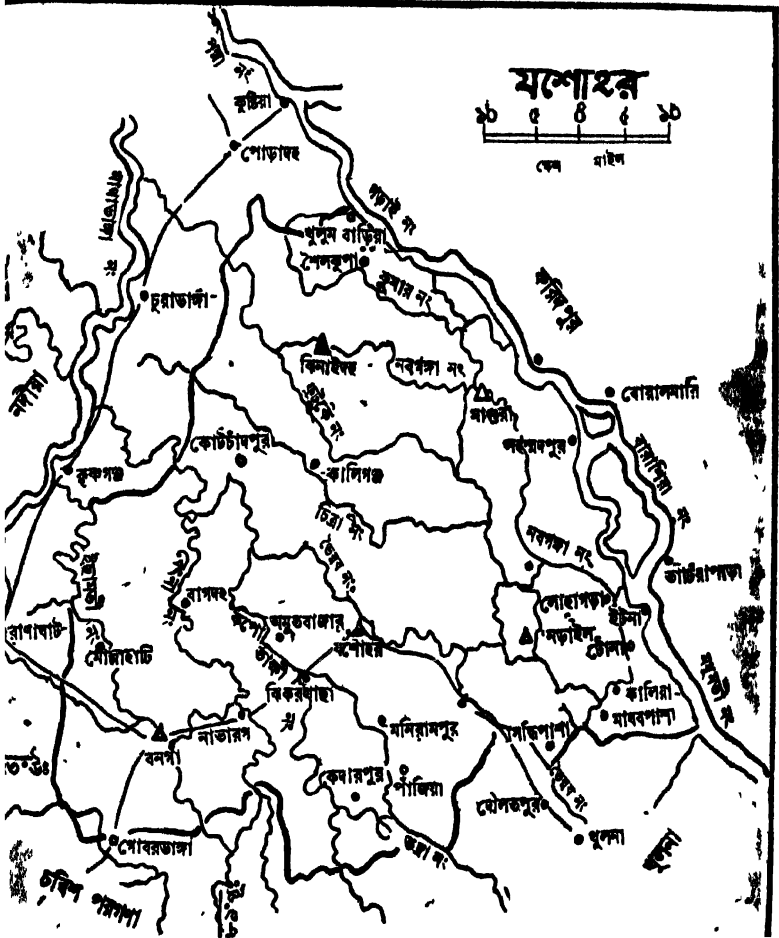
যশোহর জেলায় পাঁচটি মহকুমা।

সদর মহকুমার থানা :—যশোহর, বাঘের পাড়া, মণিরামপুর, কেশবপুর, ঝিকরগাছা, অভয়নগর।

ঝিনাইদহ মহকুমার থানা :—ঝিনাইদহ, কালিগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, শৈলকুপা, হরিণাকুণ্ডু।

মাগুরা মহকুমার থানা :—মাগুরা, শ্রীপুর, শালিখা, মুহম্মদপুর।

নড়াইল মহকুমার থানা :—নড়াইল, লোহাগড়া, আলফাডাঙ্গা, কালিয়া।

বনগাঁ মহকুমার থানা :—বনগাঁ, সরসা, গাইঘাটা, মহেশপুর।

মাটী :—কেশবপুর অঞ্চল সাধারণতঃ এঁটেল ও দোআঁশ। নলকূপ খুঁড়িলে ৬০'।৭০' নীচে বালি পাওয়া যায়।

নড়াইল মহকুমায় দোআঁশ বেশী, কারণ নদী অনেক। মাগুরা নড়াইলের চেয়ে দোআঁশ কিছু কম। ঝিনাইদহে ও সদরে অনেক জায়গায় কাল রঙের এঁটেলমাটি। বনগাঁর দক্ষিণ দিকে বালির ভাগ বেশী মনে হয়।

নদ নদী :—নড়াইল মহকুমায় নবগঙ্গার ধারা শিরোমণি শাহার খাল হইয়া চিত্রা নদীর পথে নড়াইলের দিকে বেশী জল প্রেরণের ফলে লোহাগড়ায় এখন জল কম। সে বন্দরটির ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা হইয়াছে। কিন্তু আরও দক্ষিণে টোনা বন্দরের নিকট 'হ্যালিফ্যাক্স কাট' দিয়া মধুমতীর জল আসায় বড় কালিয়া, মাধবপাশা প্রভৃতির পাশে নবগঙ্গায় সর্বদা জল থাকে। ঐ পথে খুলনা হইতে ষ্টিমার বরিশাল, মাদারিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে যাতায়াত করে। ভৈরব মৃতপ্রায়, কুমার, ঝিনাইদহের নিকট নবগঙ্গার অবস্থা তদ্রূপ। ইছামতী, বেৎনা, কপোতাক্ষী প্রভৃতিও অনেক সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু খুলনা জেলায় ঐ সকল নদীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল।

কুয়া, পুকুর :—কুয়ার চলন অত্যন্ত অল্প, কোথাও মাটির চাড়ির সাহায্যে কুয়া আছে। পুকুরের (পুখর) চলন সর্বত্র। ৭।৮ হাত হইতে ১০।১৫ হাত নীচে জল পাওয়া যায়। অনেক পুখর সংস্কারের অভাবে ধাপ ও শ্যাওলায় ভরিয়া গিয়াছে। জেলায় নলকূপের যথেষ্ট চলন হইয়াছে।

কৃষিজ দ্রব্য :—সদর মহকুমায় ধান, পাট প্রধান। নড়াইল মহকুমা—ধান, পাট, তিল, সরিষা, গুজি (সরগুজা)। মাগুরা—ধান, পাট, রবিশস্য। বনগাঁ—রবিশস্য যথেষ্ট জন্মে। সেখানে (গাঁড়াপাতা এলাকায়) সাঁওতাল জাতি কিছু ভুট্টা এবং গমও উৎপাদন করে। রবি খণ্ড (হলুদ, কলাই, মসুরি, লংকা, সোনামুগ) ছাড়া বনগাঁতে ধান এবং পাটও বেশ হয়। ঝিনাইদহ মহকুমা—পাট, নানাবিধ ধান, ভাল কলাই ও আখের বিলক্ষণ চাষ আছে। পার্শ্ববর্তী নদীয়া জেলায় কেরু কোম্পানির চিনির কারখানা হওয়ার পর সদর রাস্তার দুইধারে (নদীপথে ইহা যায় না, গরুর গাড়ীতে চালান যায় বলিয়া) যশোহর হইতে ঝিনাইদহ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আখের চাষ খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ আখ সামান্য জল বা জলাজমিতেও হয়। ইহার নাম CO213

সদর ও বনগাঁ মহকুমায় খেজুর গাছের খুব চাষ আছে।

বাঁশ :—জেলায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে ভাল্‌কো ও তল্লা বাঁশ প্রধান। এগুলি কাগজের কলের জন্য প্রচুর চালান যায়। বনগাঁর কাছাকাছি সোলার খুব চলন আছে, টুপিও চালান যায়।

কেশবপুর থানায় চুকনগরের বেগুন প্রসিদ্ধ ইহা বরিশাল প্রভৃতি জেলাতেও চালান যায়।

ফল শাকসব্জি :—নারিকেল, সুপারি, পেঁপে, কুল, আম, কাঁঠাল, জাম, জামরুল, কলা, পেয়ারা, বাতাবি, কাগজি, কলম্বাগলেবু, চালতা, তেঁতুল, প্রচুর হরিতকী, আমলকী, বয়ড়া, কামরাঙা, ঢ্যাফল, ক্যাফল (=কাউফল) সফেদা, আতা, নোনা, ডউআ প্রভৃতি ফল হয়। ৭।৮ বৎসর হইতে বিলাতি কোম্পানীতে কাঁচা আমের সময় বাগান কিনিয়া লইয়া উহা ফালি ফালি চিরিয়া বহু গাড়ী চালান দিতেছে।

মূলা, সীম, কলমীশাক, হিঞ্চে, নটে, পালং, কচু, রাঙাশাক, সাদা ও লাল ডাঁটা, উচ্ছে, পটল, করলা, চালকুমড়া, শশা, কাঁকুড় প্রভৃতি যথেষ্ট হয়।

তৈল :—সরিষার তৈল প্রধান। কিছু তিল ও সরগুজার চাষ আছে, তিলের খাবার হয় ও তেল মাথায় মাখে। গুজি সরিষার সহিত ভেজাল দেয়। সরিষার খইল পানের বরজে সারের জন্য ব্যবহৃত হয়। ঘানিতে নারিকেল তেল বাহির করিয়া টাটকা তেলে লক্ষ্মীপূজার সময়ে লুচি ভাজা হয়।

ইহা ছাড়া তেল 'পেড়ি'বার একটি রীতি গরীবের ঘরে প্রচলিত আছে। বীজ কুটিয়া সিদ্ধ করার পর হাতের চেটোর সাহায্যে উপর উপর তুলিয়া লয়। সরিষা হইতেও এই উপায়ে তেল হয়। অবশিষ্ট সরিষা মাথায় ঘসিবার পক্ষে ভাল বলিয়া মেয়েরা ব্যবহার করে। রয়নার তেল এইরূপে পেড়া হয়।

দুধ :—৬০ তোলা সের সময়ানুপাতে /০ হইতে ।০ পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। (বনগাঁতে গরুর একটি ভাল জাত সৃষ্টি হইয়াছে)।

খাবার :—ছানা, সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতোয়া প্রতি হাট-বাজারেই পাওয়া যায়। চিড়ার চলন মুড়ি অপেক্ষা বেশী। নারিকেলের সন্দেশ পূজা-পার্বণ উপলক্ষে বেশী হয়। পিঠার বহুল প্রচলন আছে—পাটি-সাপটা, রসবড়া, মুখসামালি, সরুচাকলি, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, গোপাল ভোগ প্রভৃতি। খেজুর রস, দুধ ও চাল-সংযুক্ত পায়স খাইতে খুব ভাল।

গুড় :—বনগাঁ ও সদরে খেজুরের গুড় বিখ্যাত। কলিকাতায় যথেষ্ট চালান যায়। ঝিনাইদহ অঞ্চলে আখের গুড় বেশ উৎপন্ন হয়।

মাছ :—পুকুর ও নদীর মাছ পাওয়া যায়। শুঁটকির চলন নাই। যশোহর ও ঝিনাইদহ শহরে নোনামাছ বেশ বিক্রয় হয়। যশোহর—মাগুরা পথের ধারে বুধাইলের বিল খুব বড়, সেখানেও নানাজাতীয় মাছ ওঠে। কাছিমের মাংসের কিছু চলন আছে। কিছু চালানি নোনা ইলিশ চলে।

মাংস :—কাওরা ও হাড়িরা শূকরের মাংস খায়। সাধারণ লোক পাঁঠা, খাসি ও ডিম খাইয়া থাকে। মোটের উপর মাংসের চলন কম বলা যায়।

ঘরবাড়ী :—মাটির ভিটা ও বাঁশের বেড়া বেশী। কাঁচা (ছেঁচা) বাঁশের বেড়া (বোনা) চ্যাগাড় অপেক্ষা বেশী হইবে। কেহ কেহ কাঁচা বেড়ায় মাটির লেপ দেয়। তবে তাহার চলন কম। বেড়ায় গাবের আঠা মাখান হয়, উহার রং সুন্দর হয় এবং আরও টেঁকসই নয়। মাটির দেওয়াল জেলায় কিছু কিছু আছে, ঝিকরগাছার আশেপাশে কিছু বেশী হইবে, এদিকে কুটো এবং বিচালী দিয়াও ছায়। ধনী মহাজনে বা সমৃদ্ধিশালী চাষিতে টিনের বেড়া ও টিনের চাল করে। অপরে কুটো (=উলু) র চাল দেয়। টিনের চাল ঝিনাইদহ ও নাড়াইলে অপেক্ষাকৃত বেশী।

আসবাব :—নলের মাদুর খুব ব্যবহার হয়। কাঠির সপ (=মাদুর) ও পাটি জেলার বাহির হইতে চালান আসে। কাঠের সিন্দুকের চলন আছে। বাঁশের আড়ের খুব প্রচলন আছে। আলনা নাই।

জ্বালানি :—ঘুঁটে, বাঁশের উপর গোবর টিপিয়া জমাইয়া জ্বালানি, পাটখড়ি, নাড়া, মটর ও সরিষার 'কাক্‌চা (শুকনা গাছ), শুকনা কঞ্চি, আম, জাম, তেঁতুল, কাঠ ব্যবহৃত হয়।

অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে মিষ্টির দোকানে কয়লার ব্যবহার আছে।

শিল্প :—নলের মাদুর নানা জায়গায় বোনা হয়। বনগাঁর নিকট চেঙ্গুটিয়াতে সোলার টুপি তৈয়ারী হইয়া কলিকাতায় চালান যায়।

মুচি :—ঝিনাইদহ এবং কেশবপুরের কাছে ঘোলখাদা অঞ্চলে বহু হিন্দু বাঙালী মুচির বাস। ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণী বাঁশের কাজ করে, কুলা, চাঙ্গারি, চালন, মাছধরা, ঘুনশি, পলো, চারো বাঁশ ও নলের ধান রাখার ডোল ইহারা একচেটিয়াভাবে করে। তাছাড়া চাটাই ও ধান রাখার পাত্রও করে। অপর একটি শ্রেণী চামড়া ছাড়ায়। যাহারা চামড়া ছাড়ায় তাহাদের

মধ্যে ঐ সম্পর্কে এক প্রকার প্রথা প্রচলিত আছে। চামড়া যাহারা ছাড়ায় তাহারা সেই গরুর চামড়া বেচিয়া যে অর্থ পায় তাহা সমান ভাগে ভাগ করিয়া লয়। চামড়া ছাড়ান শেষ হইবার পূর্বে যে কোন মুচি সেখানে আসিয়া মরা গরুর গায়ে লোহার অস্ত্রটি ঠেকাইতে পারে এবং সেও সমান ভাগের অধিকারী হয়। কলু হিন্দু ও মুসলমান দুই-ই আছে, তবে হিন্দু কম। কুমার, কামার হিন্দু। নড়াইলেব মতি কর্মকারের খুর ও খেজুব গাছ কাটার ছ্যান-দা বিখ্যাত, জেলাব সর্বত্র ও জেলান্তবেও খুব চল আছে। ছুতার—হিন্দু ও মুসলমান। মদ্দিকুলে অনেক জোলার বাস, তাহারা মোটা কাপড় ও গামছা আদি বোনে। গঙ্গারামপুর (মাগুরা) ধূলগাঁও ও সিদ্ধিপাশায় (সদর) বহু তাঁতির বাস। ইহারা কলিকাতায় বড়বাজার ও হাওড়া হাটে প্রচুব মাল (শাড়ী, ধুতি) চালান দেয়। কালনা-কামটানাতেও অনেক জোলা তহফন বোনে।

কোটচাঁদপুরে বহু চিনির কারখানা ছিল, এখন সে ব্যবসায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা এখনও খেজুর ও আখের গুড়ের বড় কেন্দ্র।

জেলায় মাছ ধরার জাল, বাবলা কাঠের গরুর গাড়ীর চাকা তৈয়ারী হইয়া অন্যত্র চালান যায়।

মাগুরায় মালাই নগরে ঝিনুকের সৌখীন কাজ হয়। (অনুকূল মুন্সী ইহার প্রতিষ্ঠাতা।)

ইটনা—কবফায় বড় বড় চালানি নৌকা তৈয়াবি হয়, বাড়োই এবং মিস্ত্রীরা করে। স্থানীয় লোকে ইহা বিক্রয় করে।

বিদেশী শিল্প—যশোহরে সেলুলয়েডের কয়েকটি কারখানা হইয়াছে।

হাট, বাজার, বন্দর, গঞ্জ:—

(১) সদর মহকুমা : ১. কেশবপুর—এক সময়ে চিটে গুড়ের খুব বড় কেন্দ্র ছিল। এখন খেজুর গুড়, লঙ্কা চালান যায়। ২. মণিরামপুর—খেজুর গুড়, ধান, চাল, কিছু কলাই। ৩. ঝিকরগাছা—সোনামুগ, পাট, চাল, লঙ্কা, বেগুন। ডালের ও গুড়ের খুব বড় বিক্রয় কেন্দ্র। গরুর বড় হাট বসে।

(২) নড়াইল মহকুমা : ৪. লোহাগড়া—নবগঙ্গার জল কমিয়া যাওয়ায় এখন পড়তি অবস্থা। ধান চালের গঞ্জ। ৫. সিরামপুর (নলদির নিকটে) পাটের বড় আড়ং। ৬. নড়াইল—চিড়া ও খেজুরের পাটালি চালান যায়। ৭. বড়দিয়া (টোনা ইষ্টিশন)—পাটের বড় কেন্দ্র ও গঞ্জ।

(৩) বনগাঁ মহকুমা : ৮. বনগাঁ—সোনামুগ খুব ভাল। ডাল, কলাই, ও যথেষ্ট পাট। বনগাঁর নিকট হইতে যথেষ্ট সোলা ও বাঁশ চালান যায়।

(৪) ঝিনাইদহ মহকুমা : ৯. শৈলকুপা—ধান চাল, আখ ও আখের গুড়। (শাহা প্রধান জায়গা, ৭।৮০০ ঘর শাহার বাস)। ১০. কালিগঞ্জ—বড় ব্যবসা কেন্দ্র।

(৫) মাগুরা মহকুমা : ব্যবসায় কম। ১১. নহাটা—বাটাজোড়-সাধারণ গঞ্জ।

যাতায়াত :—গরুর গাড়ী ও নৌকার চলন বেশী। সাইকেলের চলন খুব বাড়িয়াছে। স্থল পথই প্রধান। [সদর রাস্তার ধারে তাই নূতন চালানি কারবার গড়িয়া উঠিয়াছে - যথা আখ, আমের ফালি ইত্যাদি।]

সামাজিক সংবাদ :—বনগাঁ, ঝিনাইদহ, ও মাগুরা মুসলমান প্রধান। নড়াইলের শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা বেশী, অন্যত্র মুসলমানদের মধ্যে চাষীর সংখ্যা বেশী। নড়াইল ও মাগুরার কোন কোনও অংশে নমঃশূদ্র চাষীর সংখ্যা বেশী, পার্শ্ববর্তী ফরিদপুরের গোপালগঞ্জেও তাই। নমঃশূদ্র চাষীরা উদ্যোগী সাহসী, তাহাদের অবস্থা মোটের উপর ভাল। শিল্পকাজ করেনা, কিছু চাল ডালের ব্যবসায় করে। মাছ যথেষ্ট ধরে ও খায়। বাড়োই নমঃশূদ্রের মতন এক শ্রেণী। উহাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া চলে। বাড়োই টিনের ঘর গড়ে ও নৌকা গড়ে। নড়াইল মহকুমায় কয়েকজন গোবৈদ্য আছেন, ইহাদের 'দাগো ঘোষ' বলে। গরুর চিকিৎসায় ইঁহারা পারদর্শী এবং যথেষ্ট রোজগার করিয়া টিনের ঘর করিয়াছেন। হিন্দু মুসলমান চাষী উভয়ে উহাদের খুব আদর করে। ইহাদের জল অচল। তবে ইটনায় কয়েকজনের চেষ্টায় জল চল হইয়াছে। নমঃশূদ্র ও জেলেদের মধ্যে খুব ভাল কবি-দার বা কবিআল আছেন। তাঁহারা বারোয়ারী পূজায় গান করেন।

মুসলমান গরীবের মধ্যে রাজমিস্ত্রী ও সামান্য কাঠের কারিগর আছে। তাহা ছাড়া জোলা কলু ত' আছেই। ঝিনাইদহে কিছু মুসলমান জমিদার আছেন। ইদানীং মুসলমান চাকরী ও তেজরতি করিয়া নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া তুলিতেছে। জমিদারদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থের সংখ্যা বেশী। নড়াইল জমিদাররা কায়স্থ, হাটবেড়ের জমিদারও তাই। নলডাঙ্গা, চাঁচড়ার জমিদার ব্রাহ্মণ।

কুমারের কাজ—কোলা—ছোট মুখ বিশিষ্ট, গ্রীবাহীন এক প্রকার জালা। ইহা মাটিতে পুঁতিয়া রাখে। ইহার ভিতরে গরীবে শীতের পরে লেপ রাখে। সুপারী পচায়, অন্য জিনিষও রাখে। ইহার আকার হইতেই কি কোলা ব্যাঙ হইয়াছে ?

ভাষা—ওঁর এ বিষয়ে ভারি টক আছে—অনুরাগ বা interest আছে।

বিয়াল্লিশের বাংলা

(বর্দ্ধমান বিভাগ)

মানচিত্র
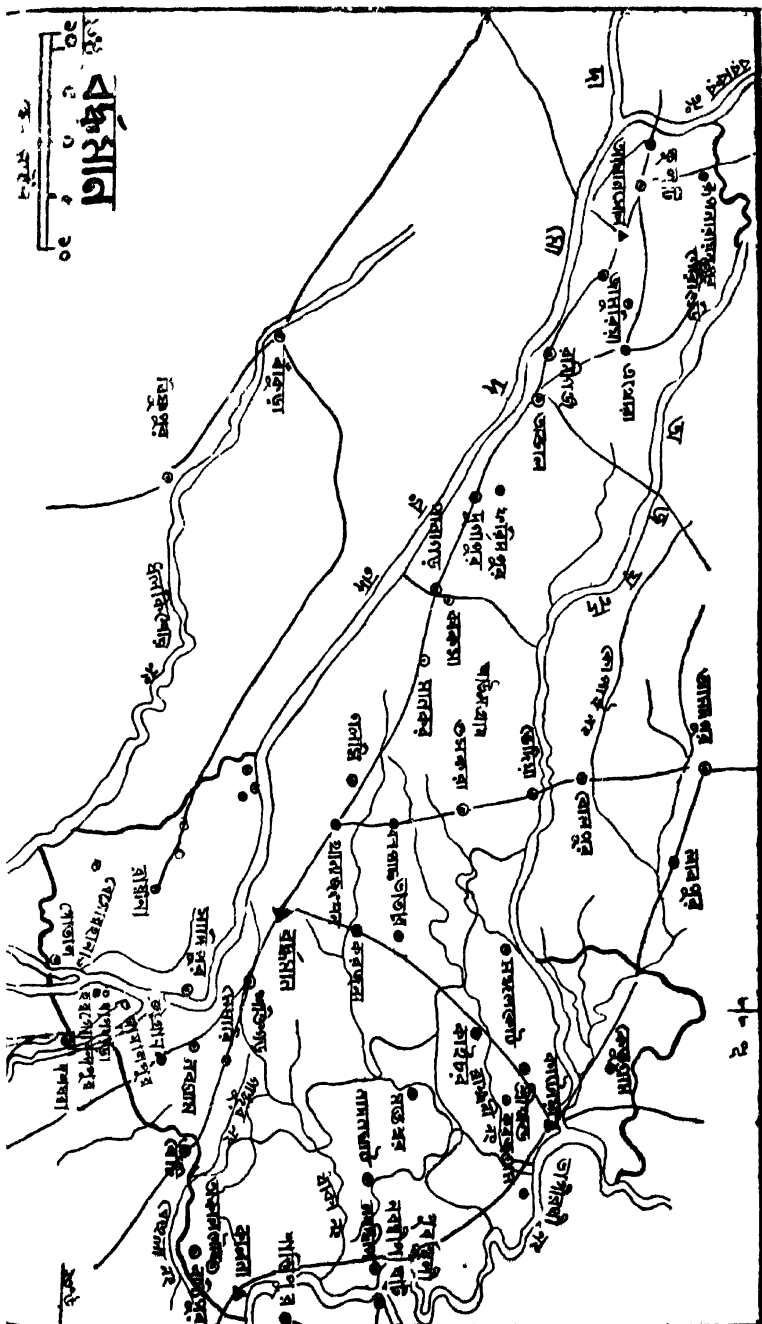
বর্ধমান জেলার চারিটি মহকুমা।

সদর বা বর্ধমান মহকুমার থানা : বর্ধমান, ভাতার, মেমারি, খণ্ডঘোষ, আউসগ্রাম, জামালপুর, গলসি, রায়না।

কাটোয়া মহকুমার থানা : কাটোয়া, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট।

কালনা মহকুমার থানা : কালনা, পূর্বস্থলী, মন্তেশ্বর।

আসানসোল মহকুমার থানা : আসানসোল, কুলটি, বরাবনি, সালানপুর, রাণীগঞ্জ, অণ্ডাল, ফরিদপুর, কাঁকসা।

মাটি :—আসানসোল মহকুমায় নদী পাথুরে জায়গা দিয়া বহিয়া গিয়াছে। গলসি ও আউসগ্রাম হইতে পূর্বে ও দক্ষিণে পলিমাটির দেশ। নদীর দুই পাশে দোআঁশ মাটি; অজয়, ভাগীরথী ও দামোদরের পাশে পাশে দোআঁশ পলি। দামোদরের কয়েকটি শাখা সদরের খুব সামান্য অংশ মেমারি, জামালপুর ও কালনা দিয়া বহিত, সেখানেও দোআঁশ মাটি। ওড়গাঁএর ডাঙ্গাতে বেলেমাটি, ইহা পতিত পড়িয়া আছে (৫ মাইল × ৩ মাইল)। তাহার পশ্চিমে মাঝে মাঝে কাঁকুরে লাল মাটি, শালবনে ভরা, দুর্গাপুরের পশ্চিম দিয়া দামোদরের ধার পর্যন্ত গিয়াছে।

কাটোয়ার দক্ষিণে করজ গ্রামে বিলের ধারে হঠাৎ বিচ্ছিন্নভাবে কিছুদূর দোআঁশ মাটি পাওয়া যায় (এইখানে 'কাটোয়ার ডাঁটা' হয়)।

জেলার মধ্যভাগে অন্য অংশ (আসানসোল ছাড়া) এবং রায়না, খণ্ডঘোষের ভিতরে দারুন এঁটেল মাটি। কেতুগ্রামে নদীর ধার ছাড়া এঁটেল। মেমারি, জামালপুর, কালনা থানায় জায়গায় জায়গায় বিস্তীর্ণ বালি জমি পাওয়া যায়, বালি তুলিয়া চালান দেওয়া হয়।

নদী :—গঙ্গা সরিয়া যাওয়ার ফলে জেলার কোন কোন অংশ গঙ্গার পূর্বে চলিয়া গিয়াছে। নবদ্বীপ পশ্চিম পারে আসিয়াছে। দামোদর (১৯৪৩) বন্যায় বাঁকা খড়ে হইয়া গঙ্গায় জল ঢালিয়া দিয়াছিল। দামোদরের প্রধান সোতা এখন মুণ্ডেশ্বরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ওঁয়াড়ির উত্তরে কুমীরখোলার হানা দিয়া কিছু জল দেবখাল দিয়া বহিয়া মুণ্ডেশ্বরীতে পড়ে। ইহার নীচের দিকে অনেক জমি বেনাবনে ভরিয়া অব্যবহার্য হইয়া গিয়াছে।

পুকুর ইত্যাদি :—পুকুর সর্বত্র কিন্তু ভাগীরথীর ধারে দোআঁশ মাটিতে নদীর জল নামিয়া গেলে পুকুর শুকাইয়া যায় বলিয়া কুয়ার বেশ চলন আছে।

পাহাড়ী অঞ্চলে বাঁধ কিছু কিছু আছে। অন্যত্র পুকুর ও দিঘীর খুব প্রচলন। আজকাল নলকূপের চলন হইয়াছে।

কৃষিজ দ্রব্য :—এঁটেল মাটির অঞ্চলে ধানই একমাত্র ফসল। সামান্য আখ ও রবি ফসল হয়। দোআঁশ মাটিতে সব রকমই ফসল হয়। কালনা, মেমারি ও জামালপুর থানার দক্ষিণ অঞ্চলে পাটের চাষ আছে। গঙ্গার চরে কিছু কিছু ভাল কলাই হয়। নাদনঘাটের পশ্চিম উত্তরে বিল আছে। সেখানে ২।৮০০০ বিঘা জমিতে বোরো ধান হয়। (লাগায় পৌষে, কাটে বৈশাখে) জামালপুর ও মেমারি থানার কিছু অংশে খুব শাঁকালুর চাষ হয়।

বীরভূম জেলার মত কেতুগ্রাম থানার উত্তরে পুকুরের জল শুকাইয়া গেলে লোকে পুকুরের গাবায় পুনকো, নালতে প্রভৃতি শাক লাগাইয়া বেশ রোজগার করে। অন্যত্র এই চলন নাই। তরিতরকারি নদীর ধারে হয়। মেমারি ও জামালপুর থানায় খুব আলুর চাষ আছে। যেখানে দোআঁশ মাটি সেখানে কিছু কিছু আম, কাঁঠাল, নারিকেল গাছ হয়। এঁটেল মাটিতে টকগাছ (তেঁতুল ইত্যাদি) ও বাবলা গাছ বেশ হয়। তালগাছ জেলার সর্বত্র। ইহার কাঁড়ি ঘরের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাড়ির চলন গাছের তুলনায় কম।

তৈলবীজ :—সরিষার তেলের চলন আছে, তবে সবই চালানি। যৎসামান্য সরিষা ও তিলের চাষ হয়।

দুধ :—গলসি থানার পশ্চিমে দামোদরের ধারে গোয়ালারা মহিষ ও গরু রাখে। বাঁকুড়াতেও ওই রকম। পূর্বস্থলী ও কেতুগ্রাম থানার গঙ্গার ধারে গয়লারা দুধ-ঘি-র ব্যবসা করে, ইহাদের গরুই সব। খড়ে নদীর ধারে কাটোয়া থানায় ঐরূপ। ইহা ছাড়া গোয়ালা খুব কম, জেলায় দুধের মোটের উপর খুব অভাব। গরুর জাত ভাল নয়, ৴১ আন্দাজ দুধ দেয়। গঙ্গার ধারে গরুর জাত কিছু ভাল।

খাবার :—মসাগাঁ হইতে কিছু ছানা কলিকাতায় চালান যায়। ভাত ও মুড়ি প্রধান খাদ্য—গঙ্গার ধারে মুড়ি কিছু কম খায়, অন্যত্র পাহাড় প্রমাণ। চিঁড়ে পাল-পরবে খায়, নিয়মিতভাবে নয়। (ছুতারে চিঁড়ে করে।) সহরে রাত্রে লোকে কিছু কিছু রুটি খায়। মধ্য বর্ধমানে সাধারণতঃ একবার রাঁধিয়া দুবেলা খায়, বড় গৃহস্থ হইলে শুধু ভাতটা রাত্রে রাঁধে। হুগলী

ও নদীয়ার সংলগ্ন অংশে রান্না দুবেলা হয় এবং রান্নার ধরণও ঐ জেলার মত। কলাইএর ডাল, পোস্ত, টক খাওয়া খুব চলে। মাংস খাওয়ার রেওয়াজ কম।

গুড়ঃ—আখের গুড় বেশী, স্থানীয় লোকে করে। খেজুর গুড় খুব কম, বিদেশীরা করে।

নামকরা খাবারঃ—বর্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা; শক্তিগড়ের ল্যাংচা; জোগ্রামের কাঁচাগোল্লা; মানকরের কদমা।

মাছঃ—গঙ্গার ধারে বেশী। অন্যত্র পুকুরের মাছ বেশী। শহরে চালানি মাছ। সারা জেলায় পুকুর জমা দেওয়া হয়, মালিক অর্ধেক পায়। দামোদর ও গঙ্গার পোনা নিয়া জেলেরা জমা লওয়া পুকুরে ফেলে।

দামোদরে ইলিশ মাছ ওঠে, তবে ধরার রীতি স্বতন্ত্র। যেখানে জল কম সেখানে দাঁড়ের মত একটা জিনিস ধরিয়া তাহার উপর মানুষ বসিয়া থাকে। ইলিশ যাইবার সময় বুঝিতে পারে ও জাল ফেলিয়া দুএকটা ধরিয়া ফেলে।

ঘরঃ—জেলার সর্বত্র মাটির ঘর। ছাউনি ধানের খড়েরই বেশী, কদাচিৎ উলুখড়ের চলন আছে। সাধারণতঃ অবস্থাপন্ন লোকে দালান ঘর করে, তবে এঁটেল জমিতে দালান ফাটিয়া যায় বলিয়া সেখানেও তাহারা মাটির ঘর করে।

বেগোর হানার কাছে যেসব অঞ্চলে প্রায় বন্যা হয়, সেখানে ঘর দুয়ার খুব উঁচু ভিটার উপরে গড়া হয়। বড় বইলান ও তাহার কাছে কামারগড়্যো, আদমপুর গ্রাম এই ধরণের গ্রাম। তাহার মধ্যে কামারগড়্যো গ্রামের আসন একটু স্বতন্ত্র ধরণের। গ্রামের চারিদিকে খাল, মধ্যে আরও খাল। এই খালের মাটি কাটিয়া মধ্যের অংশ উঁচু করা হইয়াছে। তাহাতে খালের ধারে সারি সারি বড় বাড়ি অবস্থিত। হুগলী জেলার মুণ্ডেশ্বরী পার্শ্ববর্তী মলয়পুর গ্রামেও খুব উঁচু ভিটার উপর বাড়ি করা হয়।

গরীবের ছিটে বেড়ার ঘর করে (কঞ্চির ও মাটির প্রলেপ), মাটির গোলা করিয়া দেওয়াল দেয়। রায়না খঁণ্ডঘোষের এঁটেল জমিতে মাটির চ্যালা দিয়াও ঘর করে, তাহা কাদা দিয়া গাঁথে। কিছু বেনা ও কেশের ছাউনির ব্যবহার গরীবের ঘরে দেখা যায়। জামালপুর থানার হুগলী সংলগ্ন অংশে

কিছু খোলার চলন আছে। সেখানে ধানের চাষ কম, খড় দুর্লভ, তাই খোলা এবং রাণীগঞ্জের টালি ব্যবহৃত হয়। ঘরের সরঞ্জামের মধ্যে তক্তাপোষ, সিন্দুক গরীবের ঘরে হাঁড়িকুলুঙ্গী।

যোগদীশ—ঘরে ঢুকিতেই সম্মুখে কার্নিশ দেওয়া কুলুঙ্গী। ইহাতে সাজান বাসন থাকে, ঠাকুর দেবতার পূজা তার সামনে একটু উঁচু জায়গায় হয়।

জ্বালানীঃ—কাঠ, পাতা, ঘুঁটে। ভদ্র গৃহস্থ ঘরে কয়লার চলন হইয়া গিয়াছে।

শিল্পঃ—চাকরান জমি নাপিতকে দেওয়া থাকে। গ্রামে ধোপা নাই বলিলেই চলে। পূজার দরুণ কামারকে চাকরান দেওয়া থাকে।

কুমোর · সাধারণ। কালনা থানার কুমোরপুরে ডুগি, খোল এবং তুবড়ি বড় বড় (২।৩ হাত) পর্যন্ত গড়িয়া থাকে। ঐ থানার সাতগেছে গ্রামে কুয়ার পাট ভাল করে। বর্ধমান শহরে হিন্দুস্থানী কুমোরেরা বাস করিতেছে। তাহারা খাবারের দোকানের জন্য খুরি গড়ে। নবদ্বীপে যেমন ঠাকুর কুমোরে করে, এখানে তাহা নয়। ছুতারে ঠাকুর গড়ে।

ছুতার—ইহারা ঠাকুর গড়ে, মেয়েরা সর্বত্র চিঁড়ে করে। দু'সের ধান লইয়া এক সের চিঁড়ে দেয়। গাড়ীর চাকা তৈয়ারির কাজ জেলার সর্বত্র হিন্দুস্থানী ছুতারে করে। জামালপুর থানার ইটলায় খুব ভাল মাকু হয়।

কামার—জল চল। সোনা রূপা ও লোহার কাজ করে। স্বর্ণকারের জল অচল। কামার পাড়ায় সোনা রূপার কাজই বেশী হয়। কাঞ্চননগরের কামারেরা ছুরি কাঁচি গড়ে। কামার লাঙ্গল বাঁধে, কাস্তে ইত্যাদি মেরামত করে। ইহার জন্য হাল পিছু বছরে এক মণ ধান পায়। রাণীগঞ্জ বাজারে ও জামালপুর থানায় ভাল বঁড়শি হয়।

কাঁসারি—কাটোয়া থানা দাঁইহাট ও গলসি থানায় কইতড়া, মেমারিতে জাবুইএ কাঁসার কাজ ভাল হয়।

তাঁতি—জামালপুর থানায় মহিষগড়িয়া, বিদ্যাবতীপুর (বিদ্যোৎপুর), ধনেখালি আড়ঙ্গের কাপড় হয়। ঐ থানায় সেলিমাবাদে সস্তা তাঁতের কাপড় হয়, তাহার বিক্রি ভাল। মেমোরি থানার দেবীপুর ও কালনা থানার পার্শ্ববর্তী স্থানে ভাল কাপড় হয়, উহা দেবীপুর আড়ঙ্গের কাপড় বলিয়া বিখ্যাত। পূর্বস্থলী থানার মেড়তলায় শান্তিপুর আড়ঙ্গের ভাল ধুতি শাড়ী

তৈয়ারি হয়। কেতুগ্রাম থানার নিরোল ও পার্শ্ববর্তী স্থানে মোটা ধুতি, শাড়ী, গামছা তৈয়ারি ও বিক্রয় হয়। বর্ধমান শহরের কাছে নীলপুরে মশারির থান ও গামছা (মুসলমান জোলা বোনা হয় ; ইহার বড় ব্যবসা আছে ; মানকরে আগে তসরের কাজ ছিল, এখন কারিগরেরা ছিপের সুতা করে। দাঁইহাট, মুগুল প্রভৃতি গ্রামে কেটে ও তসরের বেশ ভাল কাজ এখনও হয়। বর্ধমান শহর ও রাণীগঞ্জে হিন্দুস্থানী কারিগরে কম্বল তৈয়ারি করে। পাটুলি ও ভাতার থানায় মাহাতা গ্রামে বাঙ্গালি (?) কারিগরে বেশ কম্বল করে।

কলু -জল অচল। এক বলদ, ফুটাওয়ালা, চোখে ঠুলি।

শোলার কাজ—কেতুগ্রাম থানায় পার্শ্ববর্তী নদীয়া জেলার মত শোলার হাট হয়। পাটুলিতে প্রতিমার জন্য শোলার সাজ হয়।

মাদুর—মন্তেশ্বর থানার নাদমঘাটের কাছে চাষীরা কিছু মাদুর করে। খেজুর চ্যাটাই সর্বত্রই অল্প বিস্তর তৈয়ারি হয়।

ঝাঁটা—খেজুর পাতার ঝাঁটা, তালকাঠির ঝাঁটারও চলন আছে। নারিকেলের কাঠি দিয়া অন্য জায়গার মত তৈরী হয়, তবে সর্বত্র পাওয়া যায় না।

বিদেশী শিল্প—ধানকল, তেলের কল। আসানসোল, বরাকর অঞ্চলে লোহা, ফায়ার ক্লে, পটারী ওয়ার্কস আছে। রাণীগঞ্জে কাগজের কল ইত্যাদি হইয়াছে।

হাট বাজার :—পাচুন্দির হাটে (কেতুগ্রাম) গরু বাছুর খুব বিক্রয় হয়। জেলার সর্বত্র ছোট ছোট হাট আছে।

মেলা :—ছোটখাট মেলা জেলার সর্বত্র। কেতুগ্রাম থানার দধিয়া বৈরাগী তলায় বেশ বড় মেলা হয়। পূর্বস্থলী থানায় পাটুলির কাছে জামালপুরে বুড়োরাজার (ধর্মঠাকুরের) বেশ বড় মেলা হয়।

সংস্কৃতি-মণ্ডল : - কেতুগ্রামের চাল চলন কতকটা বীরভূম, কতক মুর্শিদাবাদের মত। ফরিদপুর, গলসি প্রভৃতির সঙ্গে পূর্বে বাঁকুড়ার যোগ বেশী ছিল। কিন্তু আজকাল রাণীগঞ্জ বড় হওয়ায় বাঁকুড়া হইতেই লোকে এদিকে বেশী আসে। হুগলী সংলগ্ন মেমারি, জামালপুর, কালনায় মাটির বাসন হুগলী জেলার মত।

তীর্থস্থান :—কেতুগ্রামের কাছে দুইটি পীঠস্থান। কৈচর ইষ্টিশনের কাছে ক্ষীরগ্রামে এক পীঠস্থান (মঙ্গল-কোট), বোড়োতে (রায়না) বলরাম ঠাকুর ও বোয়াইএতে চণ্ডীর স্থান প্রসিদ্ধ। বরাকরে নদীর ধারে ৩টি পাথরের রেখ মন্দির, কল্যাণেশ্বরীতে ১টি ঐরূপ আছে। বন্ডিপুরের কাছে একটি দেউল আছে। দাঁইহাটের কাছে জগদানন্দপুরে একটি পাথরের মন্দির আছে।

বন্দর, গঞ্জ ইত্যাদি :—ধান : (১) বর্ধমান, (২) মেমারি, (৩) শক্তিগড়, (৪) গুসকরা, (৫) কালনা, (৬) কাটোয়া, (৭) নাদনঘাট। কালনা ও নাদনঘাটে বারমাস নৌকা চলে, কাটোয়ায় সব সময়ে নয়। অবশিষ্ট জায়গায় রেল ও গরুর গাড়িতে মাল যাতায়াত করে। (৮) জামালপুর ও (৯) শুঁড়ে কালনা—ছোট গঞ্জ।

হুগলী

হুগলী
স্কেল মাইল
দামোদর নং
দ্বারকেশ্বর নং
বিষ্ণুপুর
শ্যামবাজার
গোঘাট
আরামবাগ
বালি
সালেপুর
গৌরহাটি
খানাকুল
জামালপুর
চকদীঘি
দশঘরা
মলয়পুর
তারকেশ্বর
চাঁপাডাঙ্গা
রাজবলহাট
আঁটপুর
হরিপাল
নালিকুল
সিঙ্গুর
জনাই
কামারকুণ্ডু
চন্দননগর
চুঁচুড়া
ব্যাণ্ডেল
ত্রিবেনী
বলাগড়
গুপ্তিপাড়া
অকালপৌষ
শ্রীরামপুর
উত্তরপাড়া
বেলুড়
কদমতলা
কলিকাতা
ডোমজুড়
বড়গাছিয়া
আমতা
উলুবেড়িয়া
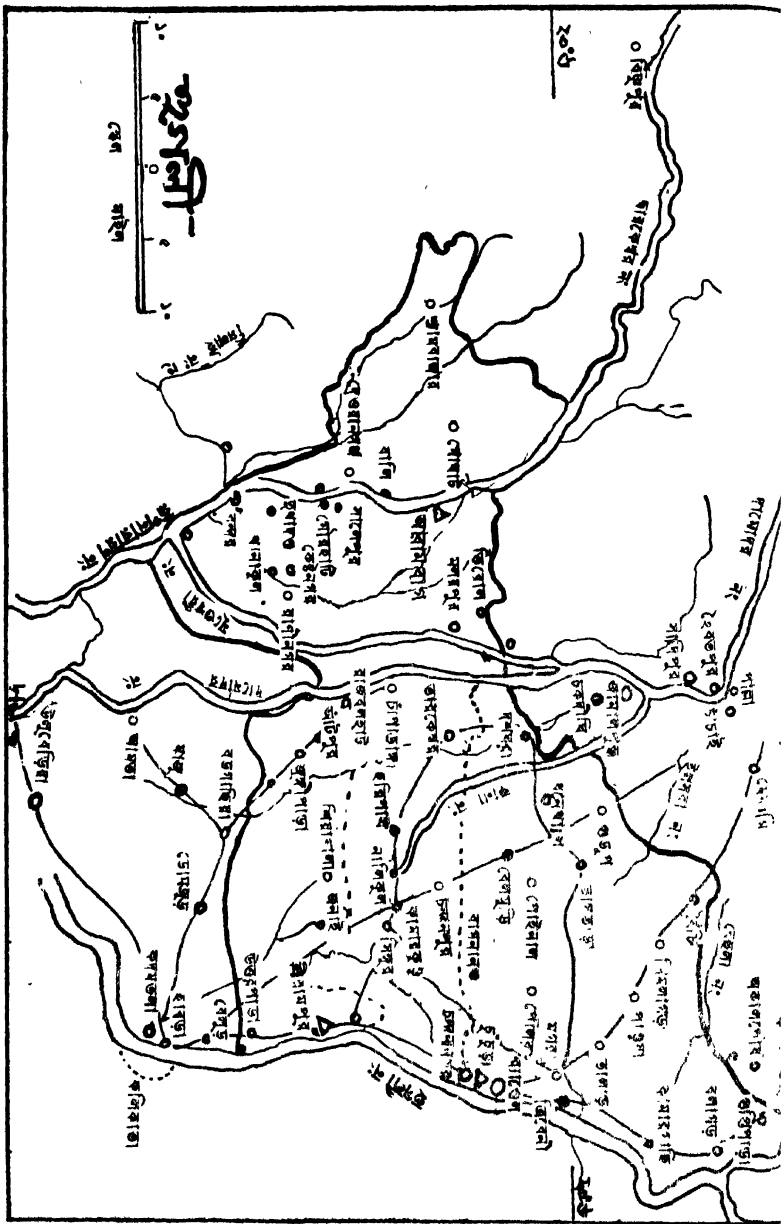
হুগলী জেলার মহকুমা তিনটি।

সদর বা চুঁচুড়া মহকুমার থানা: চুঁচুড়া, পাণ্ডুয়া, ধনেখালি, পোলবা, বলাগড় ও মগরা।

শ্রীরামপুর মহকুমার থানা: শ্রীরামপুর, হরিপাল, তারকেশ্বর, জঙ্গীপাড়া, ভদ্রেশ্বর, সিঙ্গুর, চণ্ডীতলা ও উত্তরপাড়া।

আরামবাগ মহকুমার থানা: আরামবাগ, পুড়শুড়া, গোঘাট, ও খানাকুল।

মাটি:—সদর ও শ্রীরামপুর মহকুমা মোটের উপর দোআঁশ। আরামবাগ মহকুমার মধ্যে আরামবাগ ও খানাকুল থানার নদীর ধার বাদে এঁটেল, নদীর ধারে দোআঁশ। গোঘাট থানার পূর্বদিকে এঁটেল, পশ্চিমে কাঁকুরে। দোআঁশ অঞ্চলে মাঝে মাঝে যথেষ্ট বালি পাওয়া যায়। এই বালি রেলে অন্যত্র চালান যায়।

নদ-নদী:—আমোদর—বাঁকুড়া জেলায় উৎপত্তি। গড়মান্দারণ দিয়া বহিয়া দ্বারকেশ্বরে পড়িয়াছে। দ্বারকেশ্বর আরামবাগের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া বন্দরের নিকট রূপনারায়ণে পড়িয়াছে। বন্দরে শিলাই ও দ্বারকেশ্বর মিলিয়া রূপনারায়ণ হইয়াছে।

বলরামপুর খাল—দ্বারকেশ্বর হইতে বাহির হইয়া কানা নদীতে পড়িয়াছে। এই 'কানা' কৃষ্ণনগর ও খানাকুলের পাশ দিয়া গিয়াছে।

অরোরা খাল—খানাকুল থানার রামচন্দ্রপুর গ্রাম হইতে বাহির হইয়া খানাকুল থানার লাঙ্গুলপাড়া পর্যন্ত গিয়াছে।

মুণ্ডেশ্বরী—বর্ধমান জেলার বেগোর থানায় দামোদর হইতে ইহার উৎপত্তি এবং খানাকুল থানার পানসিউলিতে রূপনারায়ণে পড়িয়াছে।

দামোদর হইতে কানানদী জামালপুরের কাছে বাহির হইয়াছে। কানা দামোদর কানানদীর ডানপাড় হইতে বাহির হইয়াছে। ইলসরা, বেহুলা দামোদর হইতে বাহির হইয়াছে (?)। গঙ্গা হইতে সরস্বতী ত্রিবেণীতে বাহির হইয়া দক্ষিণে বহিয়া গিয়াছে। ইহাই কি শেষে ডানকুনির জলাতে পরিণত হইয়াছে?

পুকুর, কূয়া: গঙ্গার ধারটায় কূয়ার চলন আছে, অন্যত্র পুকুর। আজকাল নলকূপ সর্বত্র হইয়াছে। ইহার গভীরতা ১০০ হইতে ২৫০ ফুট। হরিপালে প্রথমে মাটি, তারপর মিহি বালি, তারপর মোটা বালি, তারপর এঁটেল

এবং তারপরে যে মিহিবালি পার হইয়া মোটা বালি পাওয়া যায়, সেই স্তর হইতেই নলকূপের জল নেওয়া হয়।

কৃষি :—আরামবাগ মহকুমার নদীর ধার ছাড়া আমন ধানই প্রধান ফসল। নদীর ধারে আলু ও রবিশস্য হয়। সদর ও শ্রীরামপুর মহকুমাতে ধানই প্রধান ফসল। তাহা ছাড়া আলু, পাট, তরিতরকারী, পান, কলা ইত্যাদির যথেষ্ট আছে। বেগমপুরের কাছে পানের চাষ খুব বেশি হয়। আলু নালিকুলের কাছে খুব ভাল, অন্যত্রও বেশ হয়। ধনেখালি থানায় করলা, বেগুন প্রভৃতি বেশ হয়। আনারস মন্দ হয় না। বন্তিবাটি, ব্যাণ্ডেল সিঙ্গুর থানায় কলার চাষ ভাল হয়। আম, কাঁঠাল, নারিকেল, অল্পস্বল্প খেজুর রসও হয়।

তৈলবীজ :—উল্লেখযোগ্য হয় না। চালানি সরিষার তেলের উপরেই লোক নির্ভর করে।

দুধ :—উল্লেখযোগ্য নয়।

খাবার :—বর্ধমানের মত। তবে তরিতরকারীর চলন বেশি। আরামবাগে কলাইয়ের ডাল চলে, তবে সদর ও শ্রীরামপুরে মুগ, মুসুর বেশি। মুড়ি প্রভৃতি বর্ধমানের মত, তবে লোকে পরিমাণে কম খায়। বিখ্যাত—গুপ্তিপাড়ার কাছাকাছি কাঁচাগোল্লা, জনাইএর মনোহরা, ধনেখালির খইচুর।

মাছ :—উল্লেখযোগ্য নয়।

ঘর :—বর্ধমানের মতন, তবে খোলার চাল ও টিনের চালের চলন অপেক্ষাকৃত বেশি। বর্ধমানে মাটির ঘরে যত কাঠ ব্যবহৃত হয়, হুগলীতে তার চেয়ে কম। বসতবাড়িতেও অনেক ক্ষেত্রে বাঁশের চলন আছে, বর্ধমানে তাহা প্রায় করে না। কোঠাবাড়িও যথেষ্ট।

জ্বালানি :—কয়লার চলন বেশি আছে। গরীব দুঃখী কাঠ, ঘুঁটে ব্যবহার করে।

শিল্প :—(১) জেলায় তাঁতশিল্পই প্রধান। ফরাসডাঙ্গার ধুতি বলিতে নিজ ফরেসডাঙ্গা, রাজবলহাট, কোমপুর, হরিপাল, ধনেখালির কাজ বুঝায়। এসব জায়গায় মিহিকাজ হয়। গৌরহাটিতে অপেক্ষাকৃত মোটা কাজ হয়। (২) বালি-দেওয়ানগঞ্জে, বাঁশবেড়ে ও ধনেখালির থানার মামুদপুরে ভাল কাঁসার কাজ হয়। (৩) ধনেখালি থানার বাগনান অঞ্চলের মুসলমানেরা চিকনের কাজ করে। ইহারা দক্ষিণ আমেরিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য জায়গাতে

ব্যবসায় করিয়া বেশ রোজগার করে। (৪) কোৎরঙ, কোন্নগর প্রভৃতি জায়গায় ইট, টালি প্রভৃতির বড় কারবার আছে। গঙ্গার ধারে হাঁড়িকুড়ি ভাল হয়। (৫) চন্দননগরে কাঠের ফার্নিচার হয়। (৬) ধনেখালি থানায় দশঘরা এবং গোঘাট থানায় হাতে তৈয়ারী তুলোট কাগজ হয়। (৭) শেওড়াফুলি অঞ্চলে পাট ও শনের দড়ি তৈয়ারী হয়। (৮) কয়াপাটে (বদনগঞ্জ) হুঁকোর খোল ও নলচে তৈরী হয়। নলচের জন্য কাঠ ঝাড়গ্রাম অঞ্চল হইতে খরিদ করে।

বিদেশী শিল্প - পাটকল ও কাপড়ের কল, বেলটিং ওয়ার্কস, ডানলপের কারখানা। পাটকল গঙ্গার ধারে ধারে। কাপড়ের কল রেল লাইনের পাশাপাশি দেখা যায়।

হাট বাজার :—শহর অঞ্চলে দৈনিক বাজার বসে। হুগলাতে মল্লিক কাশিমের হাট ও বস্তিবাটি এবং ধনেখালির হাটের বেশ নাম আছে। ধনেখালির হাট অপেক্ষাকৃত ছোট।

মেলা :—তারকেশ্বরে শিবরাত্রি ও চৈত্র সংক্রান্তি। শ্রীরামপুরে মাহেশে রথের মেলা।

যাতায়াত :—গরুর গাড়ী, রেল, ঘোড়ার গাড়ী। আরামবাগ অঞ্চলে গরুর গাড়ীর চলন কম, সেখানে বলদের পিঠে ছালায় মাল লইয়া যায়। অল্প বিস্তর সর্বত্র বাঁকের চলন আছে। ইহা গোয়ালা ও বাহিরের উড়িয়ারা বহিয়া থাকে। পাল্কী প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

অন্যান্য :—জেলার বহু মধ্যবিত্ত কলিকাতায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে ও সেখানে বিভিন্ন অফিসে চাকরী করিয়া থাকে। পাটকলে বাঙালী মজুর কম, বিহারী বেশী। কাপড়ের কলে মধ্যবিত্ত ঘরের লোক এবং তাঁতি জাতের অনেকে মজুরি করে।

বাঁকুড়া

বাঁকুড়া জেলার তুইটি মহকুমা।
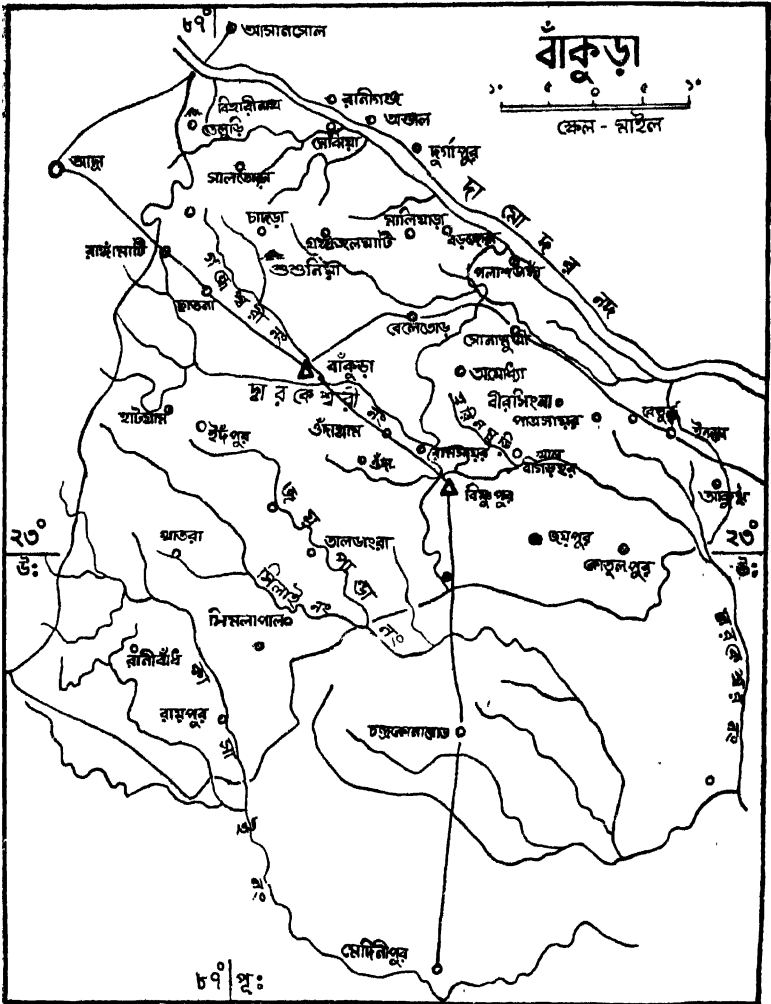
সদর বা বাঁকুড়া মহকুমার থানা: বাঁকুড়া, ছাতনা, ওঁদা, তালডাঙ্গরা, গঙ্গাজল ঘাটি বড়জোড়া, শালতোড়া, মেজিয়া, খাতরা, ইদপুর, রাণীবাঁধ, রায়পুর ও সিমলাপাল।

বিষ্ণুপুর মহকুমার থানা: বিষ্ণুপুর, জয়পুর, সোনামুখী, পাত্রসায়ের, কোতলপুর, ও ইন্দাস।

মাটি :—ইন্দাস, জয়পুর, পাত্রসায়ের বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, তালডাঙ্গরা, সিমলাপাল থানার মাটি এঁটেল। অবশ্য নদীর ধারে দোআঁশ। ঐসব থানার মধ্যে কয়েকটি অংশে কাঁকুরে মাটি, এঁটেল আদৌ নয়। সেই কাঁকুরে জমিতে শাল ও অন্য গাছের বন আছে। জেলার অবশিষ্ট অংশ পাথুরে বলা চলে অথবা পাথর ভাঙ্গা মাটি (দোআঁশ বলা চলে)। দামোদরের পাশাপাশি দোআঁশ, পূবে এঁটেল (ইহাকে মেটেলও বলে)।

ইদপুর, খাতড়া, রাণীবাঁধ, ছাতনা, গঙ্গাজলঘাটিতে পাথর (চাণ্টান) বাহির হয়।

নদনদী :—দামোদর নদের বানে কাছাকাছি গ্রামের ক্ষতি হয়। দ্বারকেশ্বরের পাড় উঁচু, বন্যায় ক্ষতি কম হয়, কুল প্রায় ছাপাইয়া যায় না। কাঁসাইএর বন্যায় রায়পুর প্রভৃতি গ্রামের ক্ষতি হয়। সিলাইএর পাড় উঁচু বলিয়া বন্যা হয় না।

পুকুর, কুয়া ইত্যাদি :—এঁটেল অঞ্চলে অর্থাৎ বিষ্ণুপুর মহকুমায় পুকুর ও দীঘি প্রধান। নদীর জলও লোকে যথেষ্ট ব্যবহার করে। সদরে কিছু কিছু কাঁচা কুয়ার চলন আছে, পুকুর কম। বাঁধের চলন ইদানীং বেশ হইয়াছে, জেলায় নলকূপ সামান্য তাহাও বিষ্ণুপুর মহকুমায় বেশী।

চাষ :—বন—শাল, পিয়াল, মোল (মহুয়া), হরিতকী বেশী। অল্প বয়ড়া, আমলকী আছে। সারা জেলায় ধানই প্রধান শস্য। আমনই বেশী হয়। কেবল দোফসলী জমিতে আগে আউস করিয়া তাহার পর রবিশস্য লাগায়। কিছু কিছু শণের চাষ আছে। বাঁকুড়ার কাছে গন্ধেশ্বরীর ধারে তরিতরকারীর চাষ ভালরকম হয়। তৈলবীজ অতি সামান্য। বাটনার জন্য সরিষার চাষ করে, জেলায় উৎপন্ন সরিষা হইতে তেল কমই হয়, চালানী তেলের উপরেই লোকে বেশী নির্ভর করে। সদরের ডাঙ্গা অঞ্চলে তিলের চাষ ভাল। তিলের তেল খায়। কচড়ার তেল জ্বালায় ও গুড়-পিঠে করিতে ব্যবহার করে।

ধানের ফলন প্রায়ই কম। আমনই বেশী, আউসের পর নোয়ান ওঠে, নোয়ানের পর বাড়ান। আউশ পাকে আশ্বিনে, কেলেশও মন্দ হয় না। নোয়ান পাকে কার্তিকের শেষের দিকে, বাড়ান পাকে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি হইতে।

দুধ :—বীরসিংহা প্রভৃতি গ্রামে ও নদীর ধারে ধারে গোয়ালারা

মহিষ ও গরু রাখে। জঙ্গলের কাছে চারণভূমি পায় বলিয়া গোয়ালারা সেখানে বাস করে। (পূর্ববঙ্গে চরে গরুকে খাওয়াইবার সুবিধা হয়, এখানে বনভূমিতে।)

খাবার :—ভাত ও মুড়ি প্রধান খাদ্য। বিউলির পাতলা ডাল, পোস্তার তরকারি, সজিনা শাক বিশেষ চলে।

ভাল খাবার—ইন্দাসের খাজা, বেলেতোড়ের ম্যাচা, বিষ্ণুপুরের মতিচুর (এখন উঠিয়া গিয়াছে)। মজুরেরা সকালে মুড়ি ও আমানির জল খাইয়া যায়। ২৷০-৩টেতে ভাত খায়, রাত্রে প্রায় জোটে না। গৃহস্থ লোকে সকালে অল্প পরিমাণ গরম ফেন দিয়া ভাতের সঙ্গে মুড়ি দিয়া পেট ভরিয়া জলখাবার খাইয়া চাষের কাজে যায়। চিঁড়া কম, রুটি খাওয়া খুব কম চলে। সামান্য আখের ও খেজুরের গুড় হয়। ছোট পাটালীকে লবাত বলে। চালানী গুড় ও চিনি বেশী। বেতুড়ে তালপাটালি করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

মাছ :—নগণ্য। বাহির হইতে পদ্মার বরফ দেওয়া ইলিশ মাছ বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর শহরে চালান যায়। অবশিষ্ট পুকুর ও বাঁধের মাছই চলে।

ঘরদোর :—মাটির ঘরই বেশী। ধানের খড়ের ছাউনি। কিছু কিছু কেশে দিয়া গরীবেরা ছোট ঘর ছায়। কোটাবাড়ির চলন আছে। টিন সস্তা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ঘর টিন দিয়া ছাওয়া হইয়াছিল, ইদানীং তাহা আবার কমিয়া গিয়াছে।

আসবাব :—চালানী মাদুরের ব্যবহার আছে। খেজুরের চাটাই খুব বেশী চলে (ধাউড়িরা তৈয়ারি করে) বাক্স ও বেতের প্যাটরা কিছু চলে, প্যাটরার ব্যবহার আজকাল কমিয়া গিয়াছে।

জ্বালানি :—কাঠেই প্রধান, জঙ্গলের শালকাঠ বিক্রয় হয়।

শিল্প :—তাঁতি—বিষ্ণুপুর, সোনামুখী ও বীরসিংহায় রেশম, তসর, জয়পুর থানায়—চ্যাংডোবা ও রাজার বাগানে কেটের কাপড় হয়। তাঁতিরা জলচল। সুতার কাজ জেলার সব জায়গাতে আছে। কোতুলপুর থানায়—বামুনাইরি, জয়পুর থানায়—বৃন্দাবনপুর, বাঁকুড়া শহরের মধ্যে গোপীনাথপুরে সূতার কাজ হয়। ধুতি (মোটা সূতা), গোপীনাথপুরে চেক চাদর, রঙ্গীন শাড়ী, কিছু ঝাড়ন প্রভৃতিও করে। বাঁকুড়া শহরে ও বিষ্ণুপুরে টেকনিক্যাল স্কুলেও তাঁতের কাজ শেখান হয়।

বাসন—বিষ্ণুপুর, জয়পুর থানায় ময়নাপুর ও বামুনাইস্নিতে এবং পাত্রসায়েরে কাঁসার বাসন হয়। সদরে, গুগুনিয়াতে বাসন হয়। ইঁদপুর থানায় মল্যানখানবাজারে বহু কাঁসার কর্মকার বাস করে। বড়জোড়া থানায় এবং সিমলাপাল থানার লক্ষ্মীসাগর গ্রামেও তদ্রূপ। এদের মাল বাঁকুড়া শহরে মহাজনের দ্বারা বিক্রী হয়।

কামার—শশিপুরে ভাল ছুরি কাচি হয়। কোন কোন গ্রামে সারা বৎসর লাঙ্গল, কাস্তে প্রভৃতি মেরামত করার মজুরি স্বরূপ কামার ধানের কিছু অংশ পায়। কিন্তু এ ব্যবস্থা ভাঙিয়া যাইতেছে। শালতোড়া থানার পাবড়াতে বহু লোহার কর্মকার বাস করে। ছুতোরের ও চাষের যন্ত্রপাতি ভাল গড়ে।

কলু—কলু জল অচল। বিষ্ণুপুর ও শহরের বেশীর ভাগ অংশে এক বলদের ফুটাওলা ঘানি। ইঁদপুর, খাতড়াতে জলচল আছে, তাদের ঘানি নয় ঘানা বেড়। সাঁওতালেরা কচড়ার তেল 'স্নুমপাটা' দিয়া করে।

শাঁখারি -বিষ্ণুপুর পাত্রসায়েব, কোতলপুর থানায় বায়বাঘিনীতে। সদরে, ইঁদপুর থানায় হাটগ্রামেও আছে। কম্বল—বাঁকুড়া হইতে ২ মাইল দূরে লোকপুরে আগন্তুক হিন্দুস্থানীরা মোটা কম্বল বোনে।

বিদেশী শিল্প—বাঁকুড়ায় কিছু ধান ও তেলের কল আছে। গ্রামে এখনও ঢেঁকির চলন যথেষ্ট আছে। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর শহরেও চাষীরা মাথায় করিয়া ঢেঁকিতে ছাঁটা চাল বিক্রয় করিতে আনে।

হাট :—সারা জেলাতে থানার হেড কোয়ার্টার্সে প্রায়ই হাট আছে। পাত্রসায়ের, ইন্দাস প্রভৃতি স্থানে নিত্য বাজার বসে। কোতুলপুরে শুক্রবারে গরুর হাট আলাদা বসে।

বিভিন্ন থানায় বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রের নাম :—মেজিয়া :—(দামোদর নদের ধারে, মেজিয়ার পশ্চিমে ৩ মাইলের মধ্যে ১৩টি কয়লার খনি আছে) মেজিয়া—তাঁত, ঠাকুরের ডাক (শোলা ও অভ্র দিয়া অলঙ্কার)। পাবড়া, মেজিয়ার পশ্চিমে সাত মাইল, লোহার যন্ত্রপাতি (চাষের)।

শালতোড়া :—(উত্তরপূর্বে ৪।৫ মাইলের মধ্যে বিহারীনাথের পাহাড় উল্লেখযোগ্য) তিলুড়ি—শালতোড়ার পশ্চিম উত্তর কোণে ৩ মাইল দূরবর্তী, তরিতরকারীর হাট।

বড়জোড়া :—জগন্নাথপুর, বড়জোড়া হইতে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে প্রায়

৬।৭ মাইল, তরিতরকারীর হাট এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের খুব বড় মেলা হয়। বেলিয়াতোড়, বড়জোড়া হইতে দক্ষিণে দশ মাইল, তরিতরকারীর হাট। এই থানার বিভিন্ন গ্রামে কাঁসা-পিতলের বাসন, কুরচি কাঠের মালা অনেকেই করে।

গঙ্গাজলঘাটি :—গঙ্গাজলঘাটিতে তরিতরকারীর হাট আছে, বিভিন্ন গ্রামে বেলমালা অনেক তৈরী হয়। কিছু কিছু বাসন ও তৈরী হয়।

বাঁকুড়া :–বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে গোপীনাথপুর, রামপুরে অনেক তাঁতে সূতার কাপড়, চাদর, কেটের চাদর প্রস্তুত হয়। উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে লোকপুরে প্রচুর ভেড়ার লোম হইতে কম্বল তৈরী হয়। কামারপাড়া লালবাজার অঞ্চলে প্রচুর বাসন তৈরী হয়। এই থানার বিভিন্ন গ্রামে তসরের ধুতি, শাড়ী ও মাটির পুতুল, বাসন তৈরী হয়। কেঁঞ্জেকুড়া বাঁকুড়ার পশ্চিমে ১২ মাইল—তাঁতের কাপড়, বাসন প্রচুর তৈরী হয় এবং হাট বসে।

ছাতনা :—ছাতনা গ্রামে চাউল, ধান, তরিতরকারী কেনাবেচা হয়। অনেক তাঁতও চলে। ঝাঁটিপাহাড়ী ছাতনার পশ্চিমে ৭।৮ মাইল, ধান চাউলের খুব বড় বড় আড়ত আছে ; ইহাই প্রধান। তাছাড়া তরকারীর হাট বসে। ইহার নিকটবর্তী কয়েকটি গণ্ডগ্রামে বহু তাঁতি তাঁত চালায়। পাহাড় শুশুনিয়া, ছাতনা হইতে উত্তরে ৭।৮ মাইল, এখানে অনেক বাসন তৈয়ারী হয়। পাহাড়ের সাদা পাথরের নানা রকম জিনিস তৈরী হয়।

ইঁদপুর :–হাটগ্রাম (বড় গ্রাম), ইঁদপুরের পশ্চিমে ১০।১২ মাইল। এখানে শাঁখের কাজই প্রধান তাছাড়া প্রতিদিনই চাল পাত, কাঠ, তরকারী দুধ ছানা প্রভৃতি সব কিছু কেনা-বেচা চলে।

খাতড়া :—এখানে সব কিছু কেনাবেচা চলে, হাট বসে। স্বাস্থ্যকর পাহাড়িয়া জায়গা।

রাণীবাঁধ :—পাহাড়িয়া স্বাস্থ্যকর স্থান, এই অঞ্চলের পাহাড়ের পাথরে লোহার অংশ বেশী। সমতল জমির নীচে অভ্রের স্তরও কিছু পাওয়া যায় (শুনিয়াছি)।

রায়পুর বা রাইপুর :–রাইপুরে হাট বসে। শারেঙ্গা, রাইপুরের পূর্বে ৪।৫ মাইল, এখানে মিশনারীদের হাসপাতাল, স্কুল আছে, আগে বহু সাঁওতাল (এই অঞ্চলের) খ্রীশ্চান হইয়াছে। এখানেও তরকারীর হাট বসে। রাইপুর

থানার বিভিন্ন গ্রামে কাল পথেরের বাসন প্রস্তুত হয়। জেলার বাহিরেও বিক্রয় চলে।

সিমলাপাল :—লক্ষ্মীসাগর, সিমলাপালের পশ্চিমে ৩।৪ মাইল। এখানে কাঁসা পিতলের বাসন তৈরীর কেন্দ্র।

তালডাঙ্গরা :—এই থানায় অনেক তাঁতির বাস, সাধারণতঃ কাপড় বোনা তাহাদের পেশা, কেটে কাপড় এখানের প্রসিদ্ধ। (সদর মহকুমার মধ্যে)।

ওঁদা :—ওঁদায় ধান চালের আড়ং আছে। কাঁচা তরকারীর হাট বসে। রামসাগর ওঁদার পূর্বে ৩।৪ মাইল। এখানে হাট বসে, এই অঞ্চলের কোন কোন গ্রামে প্রতিমার ডাক তৈরী হয়। ওঁদা, বড়জোড়া, গঙ্গাজলঘাটি ও বাঁকুড়ায় প্রচুর খেজুরগুড় তৈরী হয়। বাঁকুড়া, রাণীগঞ্জে বিক্রয় হয়।

শালতোড়া থানায় করঙ্গা নামে একটি জাত আছে, তারা কাঠের নানা প্রকার জিনিস তৈরী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

গঙ্গাজলঘাটি থানায় মাহালী একটি জাতি আছে। তাহারা বাঁশের জিনিস তৈরী করিয়া জীবিকা নির্বাহ্ করে।

মেলা :—গাজনের সময়ে বাঁকুড়ার পাশে একতেশ্বরের শিবতলায় বড় মেলা হয়, রথের সময়ে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে। দুর্গাপূজার সময়েও খুব মেলা হয়।

পাথর :—রায়পুর থানায় মগড়া গ্রামে কাল পাথরের থালা, বাটি, গ্লাস, চন্দন-পিঁড়ি খুব ভাল হয়। শুশুনিয়া গ্রামে (ছাতনা) চাকি, বেলুন, চন্দন-পিঁড়ি ইত্যাদিও ভাল হয়। পাথর কুঁদিয়া কাজ করে, বিশেষ জাতি আছে তারাই করে।

আধুনিক শিল্প—ধানকল। মেজিয়া থানায় কয়লার খাদ।

যাতায়াত :—রেল, মোটর সার্ভিস (অনেকগুলি), গরুর গাড়ী, বর্ষাকালে নৌকা। নদীমাত্রেই জেলা বোর্ডের অধীনে জায়গায় জায়গায় খেয়াঘাটে নৌকা থাকে।

সমাজ :—হাটগ্রামে শাঁখারি ছাড়া ব্রাহ্মণেও শাঁখার কাজ করিতেছে। ব্রাহ্মণে তাঁতের কাজও করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (ছত্রী) সকলে শহরে মোহন মাড়োয়ারীর সূতা রঙের কারখানাতেও অপক্ষপাতে কাজ করিতেছে। তিলিদের জল চলে। তারা ভাল চাষী। ইঁদপুর, খাতড়াতে তারা ঘানা চালায়। গড়াইরা জল অচল। বাউড়ি অস্পৃশ্য। গরুর মাংস খাওয়া

ছাড়িয়ে দিতেছে। তাহাদের গুরু রামাইত বৈষ্ণবরা। তাঁহারা বাউড়িদের বাড়িতে মকাম করিলে রান্না করিয়া খান, তাহাদের হাতে খান না।

মাহালী জাতি বাঁশের কাজ (সদর মহকুমায়) খুব ভাল করে। ভাষা সাঁওতালদের মত কিন্তু সামান্য প্রভেদ আছে। সাঁওতালদের সংখ্যা জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমে খুব বেশী। বাউড়িরা উত্তর পশ্চিমে (মানভূমের সংলগ্ন) খুব বেশী।

হাটবাজার :—তিলুড়ি ছোট, স্থানীয় প্রয়োজনের মত। হাটগ্রামে (ইঁদপুরে) ধানচালের কেনা বেচা মন্দ হয় না, কারণ শাঁখারিদের তো চাষ নাই। অন্যত্র সকলেরই ধান থাকার কারণে, হাটে ধান চাল কেনাবেচা কম। মহাজনেরা হয়ত গাঁয়ে গিয়া এক একজন বড় চাষীর কাছে ধান খরিদ করিয়া নিয়া যায়। সেই চাষীর কাছে আবার গাঁয়ের ছোট চাষীদের চাল জমা হয়। মহাজন একজনের ঘরে বসিয়া সব খরিদ করে।

ঐতিহাসিক সম্পদ—শুশুনিয়াতে চন্দ্রবর্মার শিলালিপি। মন্দির বাহুলাড়া (ওঁদা থানা), একতেশ্বর (বাঁকুড়া হইতে ২।৩ মাইল) সোনাতাপল, বিষ্ণুপুরে অনেক মন্দির।

মেদিনীপুর
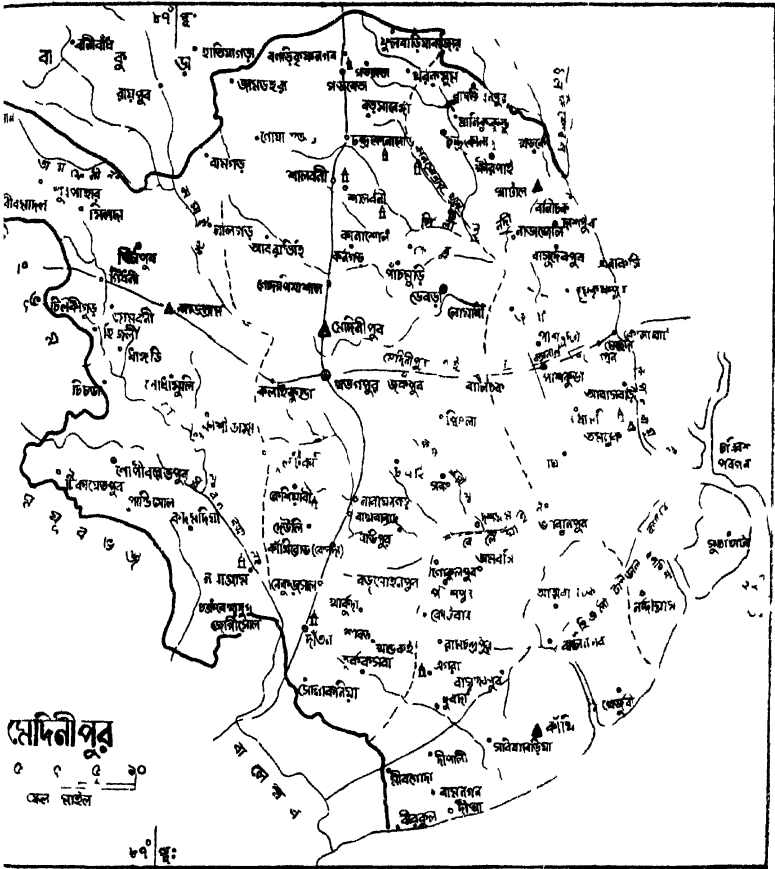
মেদিনীপুব জেলায় পাঁচটি মহকুমা।

সদব মহকুমাব থানা : মেদিনীপুব, গড়বেত, শালবনি, ডেবরা, কেশপুব, খড়্গপুব, নারায়ণগড়, পিংলা, সবং, দাঁতন, কেশিয়াড়ি, মোহনপুব ও খড়্গপুর টাউন।

ঝাড়গ্রাম মহকুমাব থানা : ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুব, বিনপুব, নয়াগ্রাম জামবনী।

ঘাটাল মহকুমার থানা : ঘাটাল, দাসপুর, চন্দ্রকোণা।

তমলুক মহকুমার থানা : তমলুক, পাশকুড়া, মহিষাদল, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, ময়না।

কাঁথি মহকুমার থানা: কাঁথি, এগরা, পটাশপুর, খেজুরি, রামনগর ভগবানপুর।

মাটি :—উত্তর পশ্চিমে যে রেলের লাইন গিয়াছে, মোটামুটি তার পশ্চিমে দো-আঁশ মেশান কাঁকুরে (বা পাথুরে) মাটি। কাঁথি, তমলুকে কিছু দোআঁশ। পটাশপুরের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল এঁটেল। ঘাটাল, তমলুক ও কাঁথি বেশীর ভাগ এঁটেল। নদীর ধারে দোআঁশ, সমুদ্রের ধারে বালি বা বেলে জমি।

জঙ্গল অঞ্চল :—গড়বেতা, শালবনী, মেদিনীপুর, কেশিয়াড়ি, খড়্গপুর, কেশপুরের কিছু অংশ ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, জামবনী, বীনপুর, চন্দ্রকোণা থানার অর্ধেক। মাটি কাঁকুরে, খুঁড়িলে মাকড়া পাথর বা চাটান (চাট) পাথর বাহির হয়। তাহাকে তেঁতুলে পাথরও বলে ; তেঁতুল বীচির মত শক্ত, এই কল্পনায়। গুঁড়িকে 'কল্লাচ' বলে।

নদী :—কেলেঘাইএর বানে সবং থানা, পিংলা থানা, ময়না থানার অল্প অংশ এবং কাঁথি মহকুমার মধ্যে প্রধাণতঃ ভগবানপুর ও পটাশপুর জখম হয়। (খুব বেশী বানে কাঁথির অন্য অংশেরও ক্ষতি হয়)। সুবর্ণরেখার বানে রামনগর থানার কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাঁসাইএর বানে পাশকুড়া ও তমলুকের কিছু অংশে ক্ষতি হয়। কাঁসাই হাই লেভেল ক্যানালের স্লুসের কাছে বাধা পায়। কেলেঘাইএর দুইটি বাঁধ ভাঙে, সেগুলি ডানপাড় বা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। রূপনারায়ণে ক্ষতি হয় না।

রূপনারায়ণে রাণীচক পর্যন্ত ষ্টিমারে মাল আসে ; তারপর নৌকায় ঘাটাল যায়। প্রবাদ আছে যে ক্ষীরপাইএও আগে জাহাজ আসিত।

পূর্বে কেলেঘাইএর সঙ্গে কাঁসাইএর যোগ ছিল না। রাজা কল্যাণ রায় বাণিজ্যের সুবিধার জন্য দুই নদীর মধ্যে খাল কাটাইয়া দেন।

শিলাইএ কয়েকবার বন্যা হইয়াছে তাহার ফলে ঘাটালের ক্ষতি বেশী হইয়াছে। (পরিশিষ্ট)

জলাশয় :—ঝাড়গ্রাম মহকুমা, সদরের যে অংশ কাঁকুরে সেখানে কূয়ার চলন বেশী। ছোটনাগপুরের মত বাঁধও আছে। বগড়ি-কৃষ্ণনগর গ্রামের ১ মাইল দূরে টিউবয়েল করা হইয়াছে। তাহা হইতে ৭।৮ বছর অবিরত জল বহিতেছে। ব্যবহারের পর সে জল কালামাটিতে বাহিয়া যায়, আর ছেঁচ দিতে হয় না। পলাশচাপড়ির ঘাটে আর একটি ঐরূপ নলকূপ আছে।

কাঁথি মহকুমা, নদীর পলি অঞ্চল, সদরের দক্ষিণে পুষ্করিণীর চলন বেশী। কূয়া নাই বলিলেই চলে। কাঁথির বালি অঞ্চলে টিউবয়েল ২৫।৩০ ফুট গভীরে বেশ চলে।

কূয়াবহুল অঞ্চলে ১২।১৪ হাত হইতে ৬০।৬৫ হাত পর্যন্ত গভীর করিয়া কূয়া কাটিতে হয়। নলকূপ ৪০০।৫০০ ফুট নীচে হয়। ঝাড়গ্রামে কোন কোন কূয়া ৪০০ হাত গভীর।

ঘাটালে পুকুর ও ডোবা বেশী, প্রায়ই অপরিষ্কার ও পানায় ভর্তি।

চাষ:—(ক) জঙ্গল অঞ্চল বা পাথর কাঁকুরে মাটির দেশ—চাষ মধ্যম। ক্ষেত রাঁচির মত ধাপে ধাপে সাজান। ধান প্রধান। গড়বেতার কাছে কাঁচা তরিতরকারী ও আলু যথেষ্ট হয়। এই আলুর জন্য খইল বিহার হইতে আমদানী হয়। আলু কোলিয়ারী অঞ্চলে ও পুরী লাইনে চালান যায়। বছরে গড়বেতা হইতে ২ লক্ষ মণ আলু চালান যায়।

ডাঙা জমিতে যথেষ্ট কোদো ও গুন্দলুর চাষ হয়। সাঁওতালেরা করে। বিঘায় ৩ মণ পর্যন্ত ফলে, পুড়া বাঁধিয়া রাখে। সাঁওতালদের দেখাদেখি অপরেও গুন্দলুর চাষ করিতেছে। ইহা হইতে ভাত, মুড়ি, খৈ ও পিঠা পায়সও হয়। মকাই (জনার) ও সাঁওতালী বেগুন সময়মত হাটে খুব আসে। জলের দরকার হয় না। ভাদ্রে লাগায়, কার্তিক, পৌষ, মাঘ পর্যন্ত চলে। বনের মধ্যে নানাবিধ ছাতু (মাশরুম) সংগ্রহ করিয়া সকল বর্ণের লোকে খায়, (১) দুর্গাছাতু, (দুর্গাপূজার সময় হয়), (২) উই ছাতু (উই ঢিবিতে হয়), (৩) কাড়ান ছাতু (যেখানে ধান কাড়া হয়, সেইখানে হয়), (৪) খড়ের ছাতু, (৫) ফুড়গি ছাতু, (৬) তসর ছাতু, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন—এ অঞ্চলের প্রতি হাটে অনেক বিক্রয় হয়। নানা রকমের মেটে আলু পাওয়া যায়।

বনপালো নায়েক ও মাঝিরা তৈরী করিয়া বিক্রয় করে। কুন্দরি, বনকুন্দরি, কাঁকরোল, ভেলাইএর ফল পাওয়া যায়। ভেলার পাকা ফল দুধে জ্বাল দিয়া ছাঁকিয়া সেই দুধকে আবার ঘন করিলে বরফির মত বসিয়া যায়।

এছাড়া জঙ্গল হইতে অনন্তমূল, কুচিলা, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, ঈশের মূল, কুড়চি ও তার বীজ, ইন্দ্রযব, শতমূল, কন্টিকারি (কেঁটকেরি), প্রচুর শিমূল তুলা, চিরতা, কালমেঘ, কিছু ধূনা ও তসর চালান যায়।

নূতন চাষের মধ্যে ঝাড়গ্রামের ৪ মাইল পূর্ব হইতে রজনীগন্ধা ও অন্য ফুল কলিকাতা ও খড়্গপুরে যায়। বাবুই ঘাস ডাঙা জমি ইজারা নিয়া চাষ

হইতেছে, চন্দ্রকোণা রোড ও শালবনী ষ্টেশন হইতে পেপার মিলের জন্য চালান যাইতেছে।

বন অঞ্চল হইতে শালপাতা ও জ্বালানি কাঠ খুব চালান যায়। ঝাড়গ্রাম চন্দ্রকোণা গড়বেতা প্রভৃতি ষ্টেশন হইতে রপ্তানী হয়। (কাঠ ও পাতা চালানের কারবার ১৮৯৮—১৯০০-র আগে নৌকায় হইত। ঐ সময়ে রেল হওয়ার পর হইতে রেলেই প্রধানতঃ যায়। বেহারী কুর্মী ও বাঙালীর হাতে এই ব্যবসাটি আছে।) শণের চাষ এদিকে বেশ আছে। শালবনী ও গড়বেতার হাটে বিক্রী হয়।

(খ) নদীর পার্শ্ববর্তী বা পলিমাটির দেশ—চাষ ভাল। ধান (পরে খেসারির ডাল) যথেষ্ট। ঘাটালের কাছে কিছু বোরোধানের চাষ হয়। জমিদার শিলাইতে বাঁধ দেয়, জলকর নেয়। উত্তরে ঘাটাল মহকুমায় উচ্ছে, কলা, আনাজপত্র, পেঁপে, আম, কাঁঠাল, ডাব, নারিকেল খুব হয় এবং নদীপথে কলিকাতা ও পশ্চিম দিকে গরুর গাড়ী ও মোটর ট্রাকে চন্দ্রকোণা রোড ও গড়বেতা যায়। নাড়াজোলের আম ও আনারস বিশেষ ভাল। সন্তাও যথেষ্ট হয়।

পাঁশকুড়া হইতে তমলুকের মধ্যে পান যথেষ্ট হয়। বাহিরে রেলপথে চালান যায়। (সকল জাতির লোক করে।)

গেঁওখালির কাছে রাধাপুরের চরে খুব আলু, পটল, কুমড়ো, উচ্ছে, মিষ্টি আলু জন্মে। গেঁওখালি হইয়া কলিকাতা যায়।

কেলেঘাইএর বানের জন্য পিংলা, সবং নারায়ণগড়, পটাশপুর, ভগবানপুর থানায় উঁচু জমিতে মাদুরকাঠির চাষ হয়। মাদুরও তৈরী হয়। মাদুরকাঠির জমিতে ভাল ওল হয়। বাঘুই ও কেলেঘাইএর বান নামিয়া গেলে কার্তিকে পেঁয়াজ, সরিষা, তিসি, মুগ লাগায় ও চৈত্রে তোলে। এই পেঁয়াজ খুব ভাল ও যথেষ্ট পরিমাণে উড়িষ্যায় চালান যায়। জলা অঞ্চলে সরের মত খড়িকাঠি জন্মায় ও তাহা দিয়া ঝুড়ি যথেষ্ট তৈরী হয়।

সুবর্ণরেখার ধারে ধারে সব রকম চাষই ভাল হয়। গোপীবল্লভপুর থানায় আখের গুড় বিখ্যাত (ঠাকুরবাড়িয়া গুড়), কেননা এখানে ভাল আখ হয়। বিরি, আখ ও মুগ সুবর্ণরেখার ধারে ভাল হয় ও গড়বেতা প্রভৃতি অঞ্চলে চালান যায়। দক্ষিণ সদর, কাঁথি, তমলুক অঞ্চলে পানের খুব ভাল চাষ আছে। এগরা ও পাঁচরোল পোষ্ট অফিসে সপ্তাহে ২০০০৲ মনি অর্ডার

আসে। বেশীর ভাগ মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ হইতে আসে। কাঁথি মহকুমায় কাজু বাদামের গাছ হয়, আজকাল চাষ হইতেছে।

রামনগর থানায় প্রচুর পাট জন্মায়। তাহা ছাড়া শণ ও নারিকেলও হয়। পালি, পারুল প্রভৃতি গ্রামে পাট, শণ বিক্রয় হয়। কাঁথি মহকুমায় ধনচে ও কাঙ্গুরা গাছ দড়ির জন্য চাষ হয়।

তৈলবীজ :—জঙ্গল অঞ্চলে কচড়া (মহুয়া), করঞ্জ, নিম, কুসুম, বাঘনখী, ভেলা, কলকে বীজ হইতে তেল করে। 'তেল পেড়ানা কাঠ' দিয়ে কচড়া, করঞ্জ, নিম ও কুসুম তেল হয়, ড্রাই ডিষ্টিলেশানে বাঘনখী, ভেলা ও কলকে বীজের তেল হয়। ভেলার তেল গাড়ীর ধুরোতে দেয়, কচড়া মাখে ও খায়, কুসুম তেলে গরু মহিষের ঘায়ের ওষুধ হয়, নিম তেলও ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নীচে চাটান পাথরে নালি কাটিয়া গাছের ফুটায় পেড়বার কাঠ লাগাইয়াও করে। খেজুর পাতার টুকরি ব্যবহৃত হয়, কুটিয়া ভাপানোর পর তাহতে বীজগুলি রাখিয়া পেড়া হয়।

আগে সাঁওতালেরাই করিত, এখন অপরেও করে।

কিছু চীনাবাদাম ও প্রধানত সরিষার তেল কুলুর ঘানিতে পিষিয়া লোকে খায়।

দুধ :—জঙ্গল অঞ্চলে গরু ছাগল যথেষ্ট ছিল, এখন বাবুই চাষের ফলে গোচারণের ভূমি কম হওয়ায় গরু কমিয়া যাইতেছে। ঘাটাল অঞ্চলে দৈ, মটকি ঘি, মাখন খুব ভাল। পূর্বার্ধে দুধ দই পাওয়া যায়, পশ্চিমভাগে কম।

মাছ ইত্যাদি :—গড়বেতা অঞ্চলে বাঁধে পোনার চাষ হইতেছে ! ঘাটালের হাটে প্রচুর মাছ আসে এবং মোটর ট্রাকে গড়বেতার দিকে চালান যায়। কেলেঘাই নদীর বাগদা চিংড়ি জেলার বহু জায়গায় চালান যায়। কোলাঘাটের ইলিশ মাছ জেলার ভিতরে ও বাহিরে চালান যায়। জেলার দক্ষিণদিকে বাঙালী জেলেরা শুকা তৈয়ারী করে, জেলায় সর্বত্র এর চলন আছে। উত্তর দিকে সাঁওতাল ও মুসলমানেরা বেশী খায়। অন্যত্র সর্ববর্ণের লোকেই খাইয়া থাকে। খড়্গপুরেও বেশ বিক্রয় হয়। ঘাটাল হইতে গড়বেতার দিকে কিছু শুকা চালান যায়। মুরগী, ছাগল বন অঞ্চলে ও অন্যত্র যথেষ্ট পালা হয়, পাঁচখুরি ও ট্যাঙরার হাটে যথেষ্ট বিক্রয় হয়। খড়্গপুরে খুব বিক্রয় হয়।

পুকুর যেখানে আছে, সেখানে হাঁস পোষা হয়। গেঁড়ির চলন ঘাটাল, সদর মহকুমার সর্বত্র আছে। এটি খাইতেও ভাল। সকলে খায়।

সাঁওতাল, হাড়ি, বাউরী জাতি মুরগী ও শূয়ার পালে ও বিক্রি করে।

খাবার দুবেলা ভাতই বেশী চলে। জলখাবারের মধ্যে পান্তা ভাত—কাঁথির দিকে চলন বেশী। উত্তরে মুড়ি, ছোলা, লঙ্কা পেঁয়াজ বা মুড়ি দুধের চলন। পান্তার নয়। মুড়ির ও চিনির চলন বেশী।

সদর মহকুমায় উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে চিঁড়া খুব চলে। জলখাবারের মধ্যে ক্ষীরপাইএর বাবরসার, চন্দ্রকোণার চাঁদসাই (খাজার মত), লোয়াদা ও নাড়াজোলের মুগের জিলিপি। মাঝি, ডোম ও ছুতারে চিঁড়া কোটে। আমলপুরের (কেশপুর থানা) খইচুড়, এগরার নিক্তিড়ি, কাঁথির বাদামের বরফি, ময়নার অলঙ্করণ বিশিষ্ট ভাজা বড়ি বিখ্যাত। ভগবানপুর ও তমলুক অঞ্চলে তালের গুড় হয়। আখের গুড়ত আছেই। লোয়াদাতে বাতাসা, মুগের জিলিপি, গুড় ভাল হয়। আগে মিছরির জন্য খ্যাতি ছিল।

শিল্প—(ক) আধুনিক—

পাথর—খড়কুসমাতে মুসলমানরা ভাল ডাল-গম ভাঙা যাঁতা তৈরী করে। শিলদাতে শিলনোড়া হয়।

লোহা—ফুলবেড়েতে ভাল ছুরি হয় (কাঞ্চননগরের মত কিন্তু দামে সস্তা) দাঁতনে ভাল জাঁতি হয়। দাসপুর থানায় সোনাখালির লোহার জিনিসও বিখ্যাত। ভগবানপুর থানার লালবাজারে খুব ভাল কামার আছে। বন্দুক পর্যন্ত তৈয়ারী করিতে পারে।

মাটির কাজ—ঘাটালের কাছে ভাল পাৎলা মাটির হাড়িকুঁড়ি হয়, কলিকাতা চালান যায়। মঙ্গলামাড়োর শক্ত তাড় (গরুকে খাওইবার নাদ) বিখ্যাত। থানার দক্ষিণ পূর্ব অংশে গড়বেতার কাছে মাটি দিয়া ভাল খোল তৈরী হয়। মাটি তার উপযোগী।

মোষের শিং—কয়েক বছর হইতে দাসপুর ও তমলুকের কাছাকাছি হিন্দু কারিগরেরা (মাহিষ্য) মোষের শিঙের চিরুণী গড়িতেছে। শিং কলিকাতা হইতে আসে। নৌকাতেই এই মাল যাতায়াত করে।

কম্বল—মেদিনীপুর শহর, গোদাপিয়াসাল, শালবনী গড়বেতায় কিয়াবনিতে গাঁড়ুড়ি জাতি ভেড়া পালে ও কম্বল তৈরী করে। ১৷৷০ / ২৲ / ৫৲ কম্বল, ৵১০ আসন।

তাঁতের কাজ—জেলার সর্বত্র আছে। জঙ্গল অঞ্চলে মোটা কাপড় পান-তাঁতি ও জোলা-তাঁতিরা করে। জোলা-তাঁতিরা গড়বেতা অঞ্চলে মুসলমান নয়। এরা সাঁওতালদের পরণের কাপড় বোনে। ঠকঠকি তাঁতে অপর বর্ণেও মোটা কাপড় বোনে।

প্রতাপদীঘি, অমরসি প্রভৃতি জায়গায় মশারি ভাল হয়। অমরসির মিহি কাপড়ও বিখ্যাত। লোয়াদা, চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, রামজীবনপুরে ভাল কাপড় হইত। এখন তাঁতিরা স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। গোকুলনগরেও নেট ভাল হয়। তমলুক মহকুমার রাধামণি হইতে পাঁশকুড়া হইয়া লেপের কাপড়, মশারি কলিকাতায় চালান যায়। নৌকাযোগে কিছু পাঠান হয়। এগুলি হাবড়ার হাটে বেচিতে যায়। তমলুকে জোলা-তাঁতিরা মুসলমান। তারা গামছা, নেট প্রভৃতি বোনে। তাছাড়া ঝরণা-শাড়ী ইত্যাদিও এদিকে বোনা হয়। মাহিষ্য এমন কি ব্রাহ্মণ আদিও (ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ছত্রী প্রভৃতি) আজকাল তাঁত ধরিয়াছেন। ঝরণা-শাড়ী প্রভৃতির ব্যবসায় কলিকাতার মহাজনদের হাতে। পটাশপুর থানার প্রতাপদীঘি এবং চন্দ্রকোণা থানার কুঁয়াপুরের মশারি ভাল।

রেশম ইত্যাদি—নিমতলার রেশম, আনন্দপুরের তসর ও কেটে, দাঁতনের রেশমের কাপড়, কেশিয়াড়ি ও পটাশপুরে রেশমের ব্যবসায় ভাল ছিল। আজকাল পড়িয়া গিয়াছে। (আশ্বিনে তাঁতিরা তসরের কাজ করে।)

বাসন—চন্দনপুরে লক্ষীকরা ঘটি ও কাঁসার বাটি বিখ্যাত। তাছাড়া এগরায় কল্যাণপুর, রামচন্দ্রপুর ও কৈঁথোড়ে বাসন ভাল হয়। খড়ার বাসনের বড় কেন্দ্র। খড়ারের বগিথালা, রামজীবনপুরের ঘড়া বিখ্যাত।

কামার—জঙ্গল অঞ্চলে ও উত্তর ভাগে ঢোগরা কামারের বাস। (জল চলে না) তাহারা বাসন গড়ে, সাঁওতালদের গহনা গড়ে। গ্রামে আসিলে ঝাঁজ বাজায়, তখন সবাই পুরাণা বাসন দিয়া নূতন বাসন কেনে। এখনও এ প্রথা আছে। ইহারা লোহার কাজও করে।

শাঁখা—পাঁচরোলে ৩০০ ঘর শাঁখারির বাস। এরা আদিতে উড়িষ্যাবাসী ছিল। অমরসিতে অল্প শাঁখারি আছে। তাছাড়া প্রতাপদীঘি, এগরা ও নারায়ণপুরেও আছে।

নুন—দক্ষিণ অঞ্চলে হয়। কোন বিশেষ জাতি করে না।

তৈলকার—রামজীবনপুর অঞ্চলে ঘানির তেল খুব চলে, এদিকে কলের তেলের চলন কম। কলুদের জল চলে না। গরুর চোখে 'ঠুলি', ঘানিতে এক বলদ ও ফুটা আছে। এক আধজন তেলি আছে তারা ফুটাবিহীন (২ বলদ) ঘানিতে তেল করে, ন্যাকড়া দিয়া তেল তোলে। গড়বেতার পূর্বে পানিকোটর গ্রামে আছে। আজকাল তেলিরা অধিকাংশ চাষবাস করে। মেদিনীপুর শহরেও দুই বলদের ফুটাবিহীন ঘানিই চলে। কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় ঘানির তেলই চলে। সেখানে ঘানি বেশীর ভাগই ফুটাবিহীন, দুই বলদ, জলচল। গোলঘরে ঘানি চালায়। তেলিরা আজকাল নিজেদের তিলি বলিতেছে।

মাদুর—থাকুর্দার কাছে রেড়িপুর এবং সবং, পিংলা, নারায়ণগড়, পটাশপুর, এগরা অঞ্চলে খুব ভাল্ মাদুর হয়। ৩০০৲।৩৫০৲ জোড়া পর্যন্ত মাদুরের দাম হইতে পারে। পাশকুড়া ষ্টেশন দিয়া চালান হয়। রঘুনাথবাড়ির মসলন্দ মাদুর প্রসিদ্ধ। জঙ্গলে শালপাতা কাঠি দিয়া বোনা হয়। ।৵০ / ।৶০ হাজার কিনিয়া কলিকাতায় ৩৲ হাজার বেচে। তাছাড়া বেল-কাঠের বা তুলসী প্রভৃতির মালা হয় সেগুলি অযোধ্যা, কাশী পর্যন্ত চালান যায়। বিশেষ কোন জাতি নাই।

চূণ—জেলার সর্বত্র ঘুটিং পাওয়া যায়। বাউরি, মাঝি, হাড়ি পুড়াইয়া বিক্রী করে। সারা জেলায় চলে।

পাখা—মেদিনীপুর সহরের কাছে গ্রামে খুব ভাল পাখা হয়।

পুরাণো শিল্প—ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর ও ঘাটাল (নিমতলা) অঞ্চলে আগে তাঁতশিল্প ছিল, এখন ক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাঁতিরাও স্থান ছাড়িয়া গিয়াছে।

শিলাই নদীর ধারে ধারে লোহাগু (স্ল্যাগ) যথেষ্ট পড়িয়া আছে। আজকাল অবশ্য লোহা গালানোর কারবার নাই। ঐ লোহাগুর গুঁড়া গাবের আঠা দিয়া তবলার উপরে লাগায়। রামপুরে (গড়বেতা) পুরাণো কালে ভাল টালি হইত।

নীলকুঠি গড়বেতা প্রভৃতি অঞ্চলে ছিল। মেদিনীপুরের পাশে ছিল। এখন নীল চাষ আদৌ নাই। তুলার চাষ ও সূতা কাটা জেলায় সর্বত্র ছিল।

বিদেশী শিল্প—ধানকলই প্রধান। গড়বেতা ৫, চন্দ্রকোণা রোড ১, শালবনী ৩, গোদাপিয়াসাল ১, বালিচক ১১, মেচাদা কোলাঘাট প্রভৃতি

ষ্টেশনে ষ্টেশনে দু' একটি করিয়া জেলার চতুর্দিকে হইয়াছে। মফঃস্বলে কম, হরিখালিতে একটি আছে। তার ফলে গরীবদের অন্ন মারা যাইতেছে। এখনও ঢেকিছাঁটা চালের চলন বেশ আছে। গড়বেতা অঞ্চলের ধানকলগুলি প্রধানতঃ মাড়োয়ারী ও কচ্ছিদের হাতে। কিছু বাঙালীর হাতে (যথা লোধা জাতি)। কাঠ চেরাইএর কল চন্দ্রকোণা রোডে একটি হইয়াছে, ইলেকট্রিক ডায়নামোতে চলে। মেদিনীপুরের পাশে গোকুলপুরে টালি ও ইটের কারখানা হইয়াছে। রাউতাডায় (কাঁথি) টালির কারখানা আছে। খড়্গপুরে বার্ন কোম্পানীর টালির কারখানা আছে। আমলাগুড়ার পাশে ফতেসিং-পুরে বেলচার (শোভেলের) হাতলের একটি কারখানা হইয়াছে। ছুতোর দিয়া করায়।

প্রধান হাট ও ব্যবসার কেন্দ্র :—(১) গড়বেতা—কাঁচা তরিতরকারী, আলু এদেশী পাইকারেরা চালান দেয়। কোলিয়ারি অঞ্চলে ও পুরী লাইনে যায়। মনোহারী, কাপড়, কেরোসিন, ভূষিমাল বাঙালী ব্যবসাদারেরা আমদানী করে। (শ্রাবণ-ভাদ্রে গড়বেতা ও মেদিনীপুব পর্যন্ত হাটে হাটে ভুট্টা আসে।) (২) আমলাগুড়া (গড়বেতা ষ্টেশন) এখন বড় বড় আড়ত গড়িয়া উঠিয়াছে। (৩) বিনপুর, (৪) লালগড়, (৫) রামগড়—গরু, ছাগল ও মহিষ যথেষ্ট আসে। বন অঞ্চলে সাঁওতাল, মাহাতো ও অন্যান্য জাতি পালে ও এদিকে বিক্রয় হয়। প্রতি রেল ষ্টেশনেও আজকাল এক একটি হাট বসিতে আরম্ভ করিয়াছে। (৬) খড়্গপুরের পাশে ট্যাংরার হাট জেলায় সবচেয়ে বড়। শনি ও মঙ্গলবার বসে। গরু, ছাগল, ভেড়া যথেষ্ট। আলু, গুড় প্রভৃতি আমদানী হয়। (৭) খাকুর্দার হাট—রবি ও বৃহস্পতিবার বসে। রপ্তানী—ধান এবং কেলেঘাই ও বাবুই অঞ্চলের পেঁয়াজ উড়িষ্যায় যায়। সুবর্ণরেখার আলু, কাঁথির নুন, ডাব, নারিকেল। সবং, পটাশপুর ও এগরার মাদুর, প্রতাপদীঘির মশারী, জলা অঞ্চল হইতে খড়ির ঝুড়ি, শাঁখা, গরু, ছাগল ও ভেড়ার চামড়া, পান, শুকা বিক্রয়ের জন্য আসে। আমদানী—কাপড়। গোপীবল্লভপুরের গুড়, চন্দ্রকোণার আলু, বন অঞ্চলের বাবুই দড়ি, পানের বরোজ বাঁধার চাড়ুয়া লতা। (৮) ধানগাদির হাট—বৃহস্পতিবার বসে। উড়িষ্যার দিক হইতে ১০।১২০০০ গরু আসে। তাছাড়া ছাগল আমদানী হয়। এগুলি নন্দকুমারে নদী পার হইয়া গেঁওখালি ও তমলুক প্রভৃতি ষ্টেশন হইতে ষ্টীমারে কলিকাতা চালান যায়। তাঁতের কাপড়ও রপ্তানী হয়। (৮ ক) কুসবাসন—বড় হাট ;

মাদুর, খড়ির ঝুড়ি ও কেলেঘাইএর বড় চিংড়ী মাছ বিক্রয় হয়। (৯) পাঁচখুরির হাট—তরিতরকারী, মুরগী ও হাঁসের ডিম, খাসী, মাটি কাটা ঝোড়া বিক্রয় হয়। (১০) জাহালদা—পান, নুন, শুঁটকি, ডাব, নারকেল। (১১) এগরা, (১২) নীয়ারি, (১৩) পাঁচরোল, (১৪) আলমগিরি, (১৫) দেপাল, (১৬) দেউলি, (১৭) মীরগোদা, (১৭ ক) একারুখী প্রভৃতি হাটে খুব পান বিক্রী হয়। পাট ও শণ আসে। (১৮) তমলুক—বৃহস্পতিবার ও রবিবার, (১৯) গেঁওখালি—আমদানি: কলিকাতা হইতে কলের তেল, সুপারী, ভূষিমাল, কাপড়, মনোহারী জিনিস ষ্টীমার ও নৌকায় আসে। বাঙালী ব্যবসাদার বেশী, কিছু মাড়োয়ারীও আছে। রপ্তানী—রাধাপুরের চর হইতে আলু, পটল, কুমড়া, উচ্ছে, মিষ্টি আলু প্রভৃতি নানাবিধ তরকারী। (২০) কোলাঘাট—রেলে কিছু ব্যবহারের জিনিস আসে। (২১) বাক্সি—প্রচুর তরীতরকারী নৌকা-যোগে কলিকাতায় চালান যায়। (২২) নন্দীগ্রাম থানার তেরপেখিয়া হইয়া বাহির হইতে জিনিসপত্র আসে, এগুলি খেজুরি, নন্দীগ্রাম ও মহিষাদল থানার সর্বত্র বিক্রয়ের জন্য যায়। রপ্তানী—ধান চাল যায়। (২৩) ক্ষীরপাইএ আড্ডার হাট—তরিতরকারী ও ফল নৌকায় কিছু কলিকাতা রপ্তানি হয়। কিছু মোটরে গড়বেতার দিকে যায়। ফল ও তরিতরকারী নাড়াজোল অঞ্চল হইতে আসে। (২৪) রামজীবনপুর—স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী আমদানী। (২৫) ঘাটাল—মাছ যথেষ্ট আসে। গড়বেতার দিকে মোটরে বা সাইকেলে চালান যায়। কাঠের গোলা আছে। তাছাড়া নৌকায় নারকেল, সুপারী, ভূষিমাল, মনোহারী দ্রব্য ও কিছু শুকাও আসে। রেল হইবার পর কমিয়া গিয়াছে। পূর্বে ঘাটাল হইতে বাঁকুড়ায় মাল যাইত। রপ্তানী—ধান, আলু, পেঁয়াজ, খড়ার, রামজীবনপুরের বাসন, মটকি ঘি, দৈ, কিছু রেশম, যথেষ্ট কাঠ, মাটির বাসন। (২৬) চন্দ্রকোণাতে সাধারণ হাট বসে। (২৭) খড়ার হাট সাধারণ কিন্তু বাসনের জন্য জঙ্গল হইতে প্রচুর কাঠকয়লা আমদানী হয়। (২৮) কালিনগর—শনি, বুধ মাল জমা হইয়া কলিকাতার দিকে নৌকায় চালান যায়। ধান, চাল তেঁতুল ইত্যাদি থাকুর্দাহাটের মত। (২৯) বীরবন্দর।

রেলে কোথায় কি চালান যায়:—বন অঞ্চলের মাল—গড়বেতা, চন্দ্রকোণা রোড, শালবনী, ঝাড়গ্রাম হইতে যায়। পাতা, কাঠ, চামড়া, প্রচুর বাবুই ঘাস। কণ্টাই রোড, নেকুড়সেনি, দাঁতন হইতে পান যায়।

পাঁশকুড়া, মেচেদা, (পান ও ডাব) বালিচক হইতে মাদুর, চাল, পান (রাধামণির) মশারি, লেপের কাপড়, চেক চাদর ইত্যাদি চালান যায়। পাঁশকুড়া হইতে কলিকাতা ও টাটানগরে আখের গুড় এবং তরিতরকারীও চালান যায়। বাখরাবাদ ষ্টেশন হইতে মাদুরই বেশী চালান যায়। কণ্টাই রোড হইতে নারিকেল কাঠি চালান যায়।

মেলা ও মেলায় কি কি পাওয়া যায় :—(১) গড়বেতার কাছে বগড়িকৃষ্ণনগরে দোলের সময় বড় মেলা বসে। লোহার জিনিসপত্র, শিলনোড়া, বাসন, খুব ভাল কাঠের কাজ, মাটির খেলনা। সবং প্রভৃতি জায়গার মাদুর আসে। বন হইতে চন্দনা প্রভৃতি পাখী খুব বিক্রয় হয়। খঞ্জনী, ঢোলকও বিক্রী হয়। ফুলবেড়ের ছুরি প্রভৃতিও আসে। লাঙ্গল, জোয়াল, ফাল, ঈশ। (২) বড় সারেঙ্গা—পৌষ মাসে ১০০০০ সাঁওতাল আসে। তীর, কোদাল, কুড়ুল, কাটারী। (৩) গোপীবল্লভপুর। (৪) বালিচকে কেদারের মেলা। (৫) কুঁআইএর মন্দিরে—পৌষ সংক্রান্তিতে বসে। কালো মাটির বাসন খুব বিক্রয় হয়। (৬) চন্দ্রকোণা—আষাঢ় ও আশ্বিনে রথ হয়। বাঁশের ঘুনি, চালুনী, বঁড়শী, ছিপ, বড় বড় সিওনি বিক্রয় হয়। মাঝি, বাগদী ও জেলেরা জাল যথেষ্ট আনে। (৭) তুলসীচারার মেলা (১লা মাঘ)—সিওনিও বিক্রয় হয়। (৮) কানাসোল—চৈত্র মাসের মেলা। (৯) রেভিপুর—চড়কের মেলা। এখানে মাদুর তৈরী ও বিক্রী হয়। (১০) এগরার মেলায় হরিতকী প্রভৃতি, শটীর পালো, শিল-নোড়া, পাথরের থালা-বাটি ঝাড়গ্রামের দিক হইতে। ঘরের বাক্স, কাপড়চোপড়; নূন রাখার কুঁড়ি (মাটির পাত্র)। (১১) পঁচেটের মেলায় এগরারই মত জিনিসপত্র বিক্রী হয়। (১২) কুদি (এগরা থানা) তেও তাই। (১৩) মহিষাদলের (রথের) মেলায় আনারস, কাঁঠাল, পাখী খুব আসে। (১৫) দারুয়া জুনপুটের মেলায় বাদাম খুব আসে।

হাট সম্বন্ধে সংবাদ—জমিদার হাটের ইজারা দেন। যে ইজারা লয় সে ৫, ১০, ৴০, ৵০ করিয়া তোলা আদায় করে। হাটের জন্য কিছুই করে না। চালা দোকানীরা নিজে তোলে। যে ঝাঁট দেয় সে তরিতরকারীতে তোলা নেয়। যে কর্মচারী তোলা আদায় করে সেও আবার ভাল জায়গার জন্য ঘুষ লয়। খাসমহলের জমিতে এগরা অঞ্চলে তোলা আদায় নাই। হাটের জায়গাও ইজারা দেওয়া হয় না।

হাট ও মেলা বাদে ব্যবসায় :—(১) বাঙ্গালী মুসলমান (তুঁত্যে) জাতি—

তুঁতের চাষ অর্থাৎ রেশম পোকার চাষ করিত। এখন গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া তসর, মুরগী, শিমূলতুলা বাবুই দড়ি, গরু সংগ্রহ করিয়া অন্যত্র চালান দেয়। মাহাতোরাও এই কারবার কিছু করে। তসর সংগ্রহ করিয়া বিষ্ণুপুরে পাঠায়। এছাড়া এই মুসলমানেরা গ্রামে গ্রামে গরু বিক্রী করিয়া দাম আদায় করিয়া নেয়। (২) বাবুই ঘাসের চাষ বাড়ার ফলে গোচারণের জমি কমিয়া গিয়াছে। গরু ছাগল রাখিয়া সাঁওতালদের যে আয় হইত তাও কমিয়া যাইতেছে। তাদের পূর্বে দরকার হইলে গরু ছাগল বেচিয়া বিপদের সময় টাকা সংগ্রহ করিত, এখন পারে না। গরীবের মত দিনমজুরি করিয়া দিন যাপন করিতেছে। (৩) পাহাড় অঞ্চল হইতে কিছু রঙিন মাটি বাহিরে চালান যায়। যথা, শালবনী হইতে কল্লাচ যায়। গড়বেতার কাছে গনগনির ডাঙা হইতে লাল, গেরুয়া ও সাদা রঙের মাটি রপ্তানী হয়। (৪) সাইকেলে দুধ, মাছ, বিড়ি কিছু পান, মনোহারীর জিনিস গাঁয়ে গাঁয়ে যাইতেছে। দর্জিরাও তৈরী জামা নিয়া যায়। (৫) গরুর গাড়ীতে গ্রামাঞ্চলে কাঠ, দরজা, জানালাও যায়।

বিভিন্ন জাতি:—বন অঞ্চলে (মাহাতো) কুর্মী, ভূইঞা, সাঁওতাল, লোধা, লায়েক, বাউরিদের বাস। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বাস গড়বেতা, ঝাড়গ্রাম বা কুঁআই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া। ব্রাহ্মণাদি সকলেই আজকাল পানের চাষ বা তাঁতের কাজও করে। বাউরিরা কুয়াকাটে, পালকী ও ভার বয়। ডোম বাজনা বাজায়, বাঁশের কাজ করে। কনৌজী ব্রাহ্মণ—চাকরী উপলক্ষে ২।১ শত বছর আসিয়াছেন, তারা গম ও রবিশস্য কিছু কিছু চাষ করেন। উৎকল ব্রাহ্মণ—ঘাটাল ছাড়া জেলার সর্বত্র বাস আছে। পশুপালন করা অপরের চেয়ে বেশী। তালগাছ লাগান, তালখাওয়াও অপেক্ষাকৃত বেশী। জঙ্গল মহলে মুড়ির বদলে চিড়া খায় বেশী। শিলাই নদীর ধারে ধারে এদের বাস দেখা যায়। ছুতার উত্তরে চিঁড়া কোটে, কাঠের কাজও করে। দক্ষিণে শুধু চিঁড়া কোটে। বড়ই জাতি কাঠের কাজ করে। ময়নার প্রাচীন রাজারা মাহিষ্য জাতীয়। তাঁহারা উপবীত ধারণ করেন। লোহার জলচল নয়। মুরগী পালে, ইদানীং ছাড়িয়া দিতেছে। প্রধান চাষী ঐ জেলার মাহিষ্য। করণরাও কিছু কিছু আছে। মাহিষ্যরা ভাল চাষী ও নাবিক। মুসলমান তাঁতি কিছু পাঁশকুড়ার কাছাকাছি আছে। নন্দীগ্রাম চর অঞ্চলে কিছু চাষ আবাদ করে। চনসরাতে, সহরেও কিছু কিছু; তাছাড়া তুঁত্যেদের কথা আগেই বলা হইয়াছে, তারা করাতির কাজ, কাঠ চালান ইত্যাদির

ব্যবসায় করিয়া থাকে। দাঁতনের আশপাশে সমৃদ্ধিশালী মুসলমানদের ব স আছে। পটীকার (পোটকার) জাতি—নাড়াজোলে হিন্দু। পঁচেটের ৯ মাইল উত্তরে পটীকারশাহী আছে। (বড়কুমোরদা গ্রামে) তারা নিম্নশ্রেণীর মুসলমান, পট আঁকে, গান গাহিয়া চাল, পুরানো কাপড় নেয়। আজব না বাজী দেখায় তারের উপর হাঁটা বা অন্য খেলা। পোদ—খেজুরির কাছাকাছি দক্ষিণ অঞ্চলে বাস। সাঁওতাল, লোধাদের বাস প্রধানতঃ ঝাড়গ্রাম মহকুমা। তুবদা গ্রামের ১৫০০ জন অধিবাসীর প্রায় সব জেলে জাতীয়। বারচৌকার পাড়ে বাল্যগোবিন্দপুর ও প্রতাপদীঘিতেও।

গ্রামে প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙবে নাতে এখনও কয়েকটি পুরানো ব্যবস্থা চলিত আছে। আঁতুড়ে নাড়ি কাটে হাড়ি মেয়েরা। তাদের চাল, কাপড় পাওনা হয়। নাপিত গৃহস্থের কাছে মাথাপিছু ॥০ মান (২) বা০ বছরে পায়। কিন্তু বড়দের জন্য অর্থাৎ চুল কাটা ও দাড়ি গোঁফ কামাইতে বছরে ১ মান বা ৴৩ সের নেয়। মালাকারের ঐ রকম বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে। সে পূজার ফুল মালা ইত্যাদি দেয়।

কামার লাঙ্গল পিছু ১০।১২ মান (॥০ মণ) পায়। বাস্তে, কোদাল ঠিক রাখে। নতুন কিছু গড়িতে হইলে আলাদা মজুরী নেয়। ছুতার ও ধোপার কিছু পাওনা নাই। কাজ অনুসারে পয়সা পায়।

কবিরাজ—ঘর পিছু ৪ কুড়ি (১৴৫) ধান বা ৬ কুড়ি (১॥০) ধান নেন। ওষুধের দাম সচরাচর নেন না। কঠিন রোগ হইলে ঠিকার বন্দোবস্ত আছে। যেমন বাত শ্লেষ্মায় ৫৲। ওষুধ তিনি দিবেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সঙ্গেও ঐ রকম চিকিৎসার চেষ্টা হইতেছে, তবে তাঁরা আমেরিকা হইতে ওষুধ আনান বলিয়া সহজে রাজী নন।

পূর্বে বৃত্তি ও চাকরান জমি অনেক ছিল, আজও কিছু কিছু আছে। চাষের সময় গাঁতার নিয়ম এখানে বেশ প্রচলিত আছে। একসঙ্গে এক একটি দল বাঁধিয়া পরস্পর পরস্পরের চাষের কাজ করে।

ঘরবাড়ি :—অধিকাংশ ঘরবাড়ি মাটির দেওয়াল দিয়া উপরে খড়ের চাল দেওয়া হয়। সহরে কিছু কিছু পাকাবাড়ি আছে। গ্রামে ক্বচিৎ পাকাবাড়ি দেখা যায়। আজকাল গ্রামে কিছু কিছু টালির ও অল্প কিছু টিনের চালা দেখা যাইতেছে। রেলষ্টেশনের পাশে আড়ৎ ও ব্যবসায়ীদের ঘরে টিনের চাল অপেক্ষাকৃত বেশী।

ছিটাবেড়ার দেওয়ালেরও বেশ চলন আছে। বাঁশের বেড়াতে মাটি লেপিয়া করা হয়। পূর্বাঞ্চলে যে সকল জায়গায় বন্যা হয়, সেখানে ভিটা বেশ উঁচু, পশ্চিমাংশে তেমন প্রয়োজন হয় না।

যাতায়াত :—আগে জঙ্গলে শগড় (গোটা কাঠের চাকা) চলিত, এখন দশ-বার আরার (সিঙ্গল স্পোক-আরা) (কেশপুর ইত্যাদি) গরুর গাড়ি ও স্থানে স্থানে তাহার পরিবর্ত্তে যোড়া আরার গাড়ীও চলিতেছে।

মাল গরুর গাড়ীতে, বলদের পিঠে, মানুষের মাথায় বা নৌকায় প্রধানতঃ যায় বাঁকেও কিছু যায়। আজকাল রেল ও মোটর ট্রাকেও যাইতেছে। সাইকেলও ক্রমশঃ ব্যবহৃত হইতেছে।

হিজলির কাছে পেটুয়াঘাট ও খেজুরির কাছে তালপাটি হইতে সুন্দরবনের দিকে সপ্তাহে দুবার নৌকা যায়। নৌকা তৈরী ঘাটাল, কাঁথি, বালিঘাই, সাতমাইল, প্রতাপদিঘীতে সকল জাত করে।

জ্বালানি :—কাঠ, ঘুঁটে, খড় নাড়া (মাঠে ধান কাটার পর ধানগাছের যে অংশ থাকিয়া যায়), গাছের পাতার চলনই বেশী। কয়লার ব্যবহার নাই বলিলেই চলে। রেলের লাইনের পাশে পাশে সামান্য কিছু বাড়িতেছে।

ধানের চাষ :—কাঁথি মহকুমা—আউস হয় না। হৈঅংই সব। ভগবানপুর থানায় বন্যা অঞ্চলে সামান্য বোরো চাষ হয়। তমলুক—ঐরূপ। ঘাটাল-চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুরে আউশ ও কেলেশ (ঝাঁজি ধান বলে)। কেলেশের মাড় বেশী হয় বলিয়া বিদেশে কাপড়ে মাড় দিবার জন্য যথেষ্ট চালান যায়। সদর—গড়বেতা—কেলেশ উপরের মত। আমনের মধ্যে সীতাশাল (সরু), ডহর নাগরা, (মোটা), পাটনাই (লম্বা চাল হয়, ছাঁটাই করিয়া টেবল রাইসও হয়)। (ঝিঙ্গাশালের মুড়ি ও সরু ধানের চিঁড়া ভাল হয়। সুগন্ধ ধান—কনকচুর ধানের খৈ খুব ভাল হয়; কাঁথির দিকে ফলনও সবচেয়ে বেশী।) জলের মধ্যে বাঁকই ধান হয়। বাঁধের ধারে জল বাড়িলেও গাছ বাড়ে। সব শেষে পৌষ মাসে কাটে। একেবারে ডাঙ্গা জমিতে চালি ধান হয়। ফলন আউসের মত। জল দরকার হয় না মাঠে জল হইলে কাটিয়া বাহির করিয়া দিতে হয়।

পরিশিষ্ট : নদী :—শিলাবতী বা শিলাই, কুবাই, দ্বারকেশ্বর ও রূপনারায়ণ : বুড়ি, গোপা ও পুরন্দর রামগড় পর্বত হইতে বাহির হইয়া এই জেলার গড়বেতা থানার সীমানায় এক সঙ্গে মিলিয়া শিলাই নদী নাম গ্রহণ

করিয়াছে। গড়বেতা, চন্দ্রকোণা, কেশপুর, দাসপুর থানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া শিলাইনদী ঘাটাল থানার মধ্যে বাঁকুড়া জেলা হইতে আগত দ্বারকেশ্বর নদীর সহিত মিলিত হইয়া নিজ নিজ নাম ছাড়িয়া রূপনারায়ণ নদ নাম লইয়াছে। রূপনারায়ণ হুগলী, হাবড়া ও এই জেলাকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া প্রবাহিত হইয়া তমলুক শহরের অদূর দিয়া মহিষাদল থানার গেঁওখালি নামক বন্দরের নিকট হুগলী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। রামগড় পাহাড় হইতে উৎপন্ন কুবাই নদী স্বতন্ত্র ভাবে প্রবাহিত হইয়া গড়বেতা, শালবনী থানার ভিতর দিয়া আসিয়া কেশপুর থানার মধ্যে শিলাই নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে।

শিলাই নদীতে কয়েকবার বন্যা হইয়াছে এবং তাহার জল সংশ্লিষ্ট থানাগুলিকে প্লাবিত করিয়াছে। ঘাটাল মহকুমাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই প্লাবন প্রায় প্রতি বছরই আসে, তবে সর্বশেষে ভয়াবহ প্লাবনগুলির মধ্যে ১৯৩৯ ও ১৯৪৩ সালের প্লাবন উল্লেখযোগ্য।

এই নদীর প্রথম গতি জেলার মধ্যে দক্ষিণাভিমুখে। পরে স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হইয়া খানিক দূর পূর্বাভিমুখী হইয়া একটু উত্তরে গিয়া ইহা বাঁকুড়ার মধ্য হইতে আগত একটি ছোট্ট নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, পুনরায় পূর্বাভিমুখী গিয়া আবার একটি ছোট নদীর সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। পথে বাঁকুড়া হইতে আগত আর একটি ছোট নদীর সহিত মিলিত হইয়া নদীটি দুই ধারায় বিভক্ত হইয়া পুনরায় একসঙ্গে মিলিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়াছে। গড়বেতা ও চন্দ্রকোণা থানার মধ্য হইতে উৎপন্ন দুইটি স্বতন্ত্র ছোট নদী আসিয়া ইহার সহিত মিলিয়াছে।

এদিকে কুবাই নদী গড়বেতা থানার মধ্যে প্রথমে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করে। এই থানার গোয়ালতোড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এই নদী স্রোত পূর্ব-দক্ষিণাভিমুখে ফিরাইয়া কেশপুর থানার মধ্যে আনন্দপুরের কাছাকাছি কেশপুর থানার সীমায় উৎপন্ন একটি ছোট নদীকে নিজের মধ্যে মিলাইয়া লইয়া পূর্বাভিমুখে গিয়া শিলাই নদীতে মিলিত হইয়াছে। নদীর স্বাভাবিক গতি এইভাবে বিভিন্ন স্থানে বাধা পাওয়ার জন্যই বন্যা আনয়ন করে।

কংসাবতী বা কাঁসাই, তারাফেনী নদী : কংসাবতী ছোটনাগপুর পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া বাঁকুড়া জেলা হইয়া এই জেলার বিনপুর থানার মধ্যে

প্রবেশ করিয়াছে। বিনপুর থানার পশ্চিম-উত্তর সীমান্ত পাহাড় হইতে তারাফেণী নদী বহির্গত হইয়া প্রথম পূর্ব-দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া কিছুদূর আসিয়া পূর্বাভিমুখে গমন করতঃ এই থানার মধ্যেই কাঁসাইএর সহিত মিলিত হইয়াছে। মিলনের পর কাঁসাই নদী ঈষৎ পূর্ব-দক্ষিণাভিমুখে বাঁকিয়া ঝাড়গ্রাম থানার ভিতর দিয়া পূর্বাভিমুখ হইয়া মেদিনীপুর শহরের প্রথম দক্ষিণ, পরে দক্ষিণ-পূর্ব পাশ দিয়া প্রবাহিত হয়। মেদিনীপুর কোতোয়ালী থানা অতিক্রম করিয়া নদীটি উত্তর-পূর্বাভিমুখ হইয়া ডেবরা থানার মধ্যে প্রবেশ করে। ডেবরার দক্ষিণ-পার্শ্বে পূর্ব অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ইহা ময়না থানার টেংরাখালী নামক স্থানে কেলেঘাই নদীর সহিত মিলিত হয়। পথে ঝাড়গ্রাম শহরের কাছাকাছি হইতে একটি, সরডিয়ার কাছাকাছি হইতে একটি, শালবনি থানার মধ্যে উৎপন্ন মেদিনীপুর থানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত একটি, ডেবরা থানার মধ্য হইতে একটি, ও তমলুক থানার মধ্য হইতে একটি ছোট নদী ইহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। কাঁসাই নদী সদর ও তমলুক মহকুমার মধ্যে প্লাবন আনে। তন্মধ্যে তমলুকই বেশী আক্রান্ত হয়। পাঁশকুড়া থানার মধ্যে কাঁসাই-এর বাঁধ ভাঙ্গিয়া সাধাবণতঃ এই ভয়াবহ বন্যা আসে। সর্বশেষ ভয়াবহ বন্যার মধ্যে ১৯৪৩ সালের বন্যাই প্রধান।

কেলেঘাই—সিংহভূম ও মানভূমের শৈলশ্রেণী হইতে উৎপন্ন কয়েকটি ঝরণা মেদিনীপুর জেলার মধ্যে প্রবেশ করতঃ একসঙ্গে মিলিত হইয়া কেলেঘাই নদী নাম গ্রহণ করিয়াছে। ঝাড়গ্রাম মহকুমার মধ্য দিয়া পূর্ব-দক্ষিণাভিমুখে খড়গপুর থানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তরপূর্বাভিমুখে চলিলে পর খড়গপুর থানার কলাইকুণ্ডার নিকট হইতে একটি, খড়গপুর শহরের পশ্চিম হইতে আগত একটি ছোট নদী ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। মিলন স্থান হইতে দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া নারায়ণগড়ের কাছাকাছি পৌছাইলে প্রথমতঃ খড়গপুর থানার জকপুরের নিকট হইতে ও পরে কেশিয়াড়ির নিকট হইতে আর একটি ছোট নদী আসিয়া মিলিয়াছে। মিলনস্থান হইতে দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া নারায়ণগড় থানার গোপীনাথপুরের কাছাকাছি আসিলে বেলদার নিকট হইতে আগত একটি খাল ইহার সহিত মিলিয়াছে। তারপর একই গতিতে চলিয়া পটাশপুর থানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সিলমাবাদ নামক গ্রামকে বেষ্টন করিয়া

তাহাকে দ্বীপে পরিণত করিয়াছে। দাঁতন থানার মধ্যে উৎপন্ন বাঘুই নদী উত্তর-পূর্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া দাঁতন ও নারায়ণগড় থানার মধ্য দিয়া পটাশপুর থানার মধ্যে কেলেঘাই নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। মিলনস্থান হইতে উত্তর-পূর্বাভিমুখে চলিবার সময় খড়গপুর থানার মধ্যে উৎপন্ন কপালেশ্বরী নদী সবং থানার মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া পটাশপুর ও ভগবানপুর থানার সীমায় মিলিয়াছে। পরে খড়গপুরের জকপুর অঞ্চলে উৎপন্ন এবং খড়গপুর ও পিংলা থানার সীমায় উৎপন্ন একটি ছোট নদী দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া পরপর ভগবানপুর থানার মধ্যে উক্ত নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। অতঃপর নদী পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ময়না থানার টেংরাখালি নামক স্থানে কাঁসাই নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই মিলনের পূর্বে ডেবরা থানার মধ্যে উৎপন্ন একটি নদী পূর্ব-দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া পিংলা থানা অতিক্রম করতঃ ময়না থানার মধ্যে প্রথম দক্ষিণ মুখে পরে দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে এবং তারপর দক্ষিণমুখে আসিয়া উক্ত নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে।

পটাশপুর থানার মধ্যে আমগাছিয়া নামক স্থান হইতে ভগবানপুর থানার পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত স্থানটির মধ্যে কেলেঘাই নদীতে চর উঠিয়া নদীর গতিকে রুদ্ধ করিয়াছে। এই চরে এখন জনবসতি স্থাপিত হইয়াছে। উৎপন্ন চরগুলির মধ্যে নকরাসিচক গ্রামই প্রধান। এই চরের মধ্য দিয়া এত সরু আকারে নদীটি প্রবাহিত হইয়াছে যে বর্ষাকালে উহার অতগুলি উপনদী ও অনেক অববাহিকাসহ নিজের জল টানিবার শক্তি আদৌ থাকে না। নদীটি উক্ত আমগাছিয়ার উত্তর দিকে সবং থানার বিষ্ণুপুর গ্রামের সালমারা জলার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া উপরোক্ত চরগুলির উত্তর পার্শ্বে কপালেশ্বরীর জলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া আপন স্রোতে পড়ে। সেই কপালেশ্বরীর সহিত মিলিত স্থানের পরে প্রথমতঃ নদীর গতি উত্তরাভিমুখী ও দ্বিতীয়তঃ নদীগর্ভ অত্যন্ত উঁচু হওয়ায় উক্ত জল যখন প্রবল স্রোতে আসিয়া পড়ে তখন সামলাইতে না পারিয়া ঐখানে (গ্রাম শিউলীপুরে) নদীর বাঁধ ভাঙিয়া সমগ্র কাঁথি মহকুমা ও তমলুক মহকুমার কতকাংশ প্লাবিত করে। যে বছর নীচে না ভাঙে সে সে বছর উক্ত জেলার উত্তরের বাঁধ ভাঙিয়া সবং ও পিংলা থানাতে ভয়াবহ প্লাবন আনে। এই নদী প্রায় বছরই ভাঙে। দু-তিন বছর অন্তর ভয়ানক ভাঙন আনে। যতবার নদী ভাঙিয়াছে ততবার অন্য স্থান ভাঙুক বা না

ভাঙুক উক্ত শিউলীপুর ভাঙেই। এই ভয়াবহ ভাঙ্গনগুলির মধ্যে ১৯১৩, ১৯২৬, '৩২।৩৩, '৪০, '৪৩ সালের ভাঙন উল্লেখযোগ্য। '৩২ সালে যখন নদীর বাঁধ পটাশপুর থানার পাঁচুড়্যা গ্রামের নিকটে ভাঙে, সে ভয়াবহ ভাঙনে বাঁধের নীচে এক ভয়াবহ গর্ত হইয়াছিল, তাহাতে আজও গ্রীষ্মকালে প্রায় ৫০ হাত গভীর জল থাকে। ইহার নাম 'বত্রিশা গত্ত'। প্রতিবার ভাঙনের স্থানে একটি গর্তের সৃষ্টি হয়।

হলদি নদী—কেলেঘাই ও কাঁসাই নদীর মিলিত নাম হলদি। এই নদী দক্ষিণ পূর্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া ময়না, মহিষাদল, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রাম থানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া হুগলী নদীর সহিত মিলিয়া দক্ষিণাভিমুখে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

বাগদানদী—পটাশপুর থানার উত্তর পশ্চিম অঞ্চল কেলেঘাই হইতে বহির্গত হইয়া ঐ থানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বিখ্যাত বারচৌকা জলার মধ্য দিয়া পটাশপুর ও এগরা থানার সীমায় জলেশ্বরী নদীর সহিত একধারায় মিলিত হইয়া ভগবানপুর থানার বরোজ নামক স্থানে বরোজ নদী নাম লইয়াছে। পথে বহু অববাহিকা সহ দাঁতন থানার মধ্যে উৎপন্ন একটি সরু নদী ইহার সহিত মিলিয়াছে। বাগদা নদীর আজ আর কোনো অস্তিত্ব নাই। তাহার স্থলে বারচৌকা হইতে একটি খাল কাটা হইয়াছে। এই খাল নদীর সহিত সমান তাল না রাখিয়া ইহার স্রষ্টার মতই নিজ রূপ লইয়াছে। ইহার বর্তমান নাম প্রতাপদিঘী খাল ও পাহাড়পুর ক্যানেল।

জলেশ্বরী—এই জেলার দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ পূর্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া দাঁতন থানা অতিক্রম করিয়া এগরা থানার ডুবদা পাঠের (জলা বা বিল) মধ্যে দুই ধারায় বিভক্ত হইয়া একটি সোজা দক্ষিণ দিকে রামনগর ও কাঁথি থানার মধ্য দিয়া সমুদ্রপুর নামক স্থানে সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে; অন্য ধারাটি পূর্বাভিমুখে ধাবিতহইয়া বাগদা নদীর সহিত মিশিয়াছে। যে ধারাটি সোজা সমুদ্রে পড়িয়াছে তাহা 'ক্যানালাইজড' হইয়াছে। কিছু কিছু চিহ্ন ব্যতীত নদীর আর কিছুই নাই। কোথাও কোথাও পুকুর, ডোবা ইত্যাদি দেখা যায়। এগরা থানার কুদীর নিকট কয়েক মাইল একটি ক্ষীণ ধারা আছে। ইহা 'আদিগঙ্গা' নামে পরিচিত। বর্ষাকালে ইহার প্রবল স্রোত দুই পাশের ভূমিকে প্লাবিত করিয়া ডুবদা পাঠে গিয়া পৌছে। সেখান হইতে এই জল নির্গমনের আর কোনও পথ না থাকায় ভীষণ বন্যা আনয়ন

করে। বালিঘাইতে কাঁথি-বেলদা রাস্তার উপর পুল হইয়াছে এবং বাগদা নদীতে পতিত ধারাটিও নাই বলিলেই চলে। একমাত্র গাহাড়পুর ক্যানেল হইতে বালিঘাই পর্যন্ত একটি ছোট খাল আছে।

বরোজ নদী—পর পর কেলেঘাইএর ভাঙনের ফলে কতকগুলি সরু নদী (একটি মঙ্গলামাড়োর দিক দিয়া দক্ষিণমুখী হইয়া ভগবানপুর থানার ইটাবেড্যার নিকট দিয়া প্রবাহিত, এখন ইহাকে ইটাবেড্যার খাল বলে, একটি ভগবানপুর থানার ভীমেশ্বরীর নিকট দিয়া দক্ষিণ পূর্ব মুখে উদ্বাদাল হইয়া প্রবাহিত, এখন ইহা ভীমেশ্বরীর খাল, বড়বেড়িয়া খাল ও উদ্বাদাল খাল নামে পরিচিত, কয়েকটি অন্যান্য খালসহ এক্তারপুর খাল) আসিয়া বরোজ গ্রামে একসঙ্গে মিলিত হইয়াছে। বাগদা নদীও এখানে আসিয়া মিশিয়াছে, তৎপর বরোজ নদী নাম লইয়া কিছুদূর গিয়া রসুলপুর নদী নাম গ্রহণ করিয়াছে। এই বরোজ নদী এখন সদর খাল নামে পরিচিত।

রসুলপুর নদী—বরোজ নদী রসুলপুর নাম লইয়া কাঁথি খেজুরি থানার মধ্য দিয়া বিরাট কলেবরে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে।

সুবর্ণরেখা—রাঁচি জেলায় উৎপন্ন হইয়া মেদিনীপুর গোপীবল্লভপুর ও নয়াগ্রাম থানার মধ্য দিয়া দাঁতন থানার পশ্চিম সীমানা দিয়া প্রবাহিত হইয়া বালেশ্বর জেলাকে অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। সিংহ-ভূমের শৈলশ্রেণী ও বিনপুর থানার শিলদার পাহাড় হইতে উৎপন্ন জলস্রোত ডোলাং নদী নাম লইয়া দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে আঁকাবাঁকা ভাবে চলিয়া গোপীবল্লভপুর থানার মধ্যে সুবর্ণরেখা নদীতে মিলিত হইয়াছে। এই নদীতে প্লাবন আসিলে দাঁতন মোহনপুর থানাকে প্লাবিত তো করেই, তা ছাড়া ইহার জল বাঘুই নদীতে পড়িয়া বাঘুই ও কেলেঘাইতেও প্লাবন আনে। তাহার ফল বাঘুই কেলেঘাই নদীতে উল্লিখিত হইয়াছে।

বারচৌকা জলা—পটাশপুর থানার মধ্যে এই বিখ্যাত বিলটি অবস্থিত। কতকগুলি অববাহিকা ও খাল আসিয়া এই বিলে পড়িয়াছে। বাগদা নদী লুপ্ত হওয়ায় ইহার সৃষ্টি হইয়াছে।

মেদিনীপুর হাইলেভেল ক্যানেল—মেদিনীপুরের নিকট কাঁসাই নদী হইতে বহির্গত হইয়া খড়্গপুর ও ডেবরা থানার ভিতর দিয়া পাঁশকুড়া থানার মধ্যে কাঁসাই নদীকে অতিক্রম করিয়া কোলাঘাটের নিকট রূপনারায়ণ নদে পতিত হইয়াছে। ইহা কাটা ক্যানেল। ইহাতেও এত জলের চাপ

হয় যে, মাঝে মাঝে পাঁশকুড়া থানার মধ্যে উহার বাঁধ ভাঙ্গিয়া বন্যার সৃষ্টি করে।

উড়িষ্যা কোষ্ট ক্যানেল—উড়িষ্যার মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া বালেশ্বর জেলার সুবর্ণরেখা নদীকে অতিক্রম করিয়া রামনগর, এগরা ও কাঁথি থানার ভিতর দিয়া রসুলপুর নদীর উৎপত্তিস্থলে পতিত হইয়াছে। ইহা কাটা ক্যানেল।

হিজলী টাইড্যাল ক্যানেল—রসুলপুর নদী হইতে বহির্গত হইয়া খেজুরি, নন্দীগ্রাম থানার ভিতর দিয়া তেরপেখিয়া নামক স্থানে হলদি নদীকে অতিক্রম করিয়া মহিষাদল রাজবাড়ির পার্শ্ব দিয়া গেঁওখালি নামক স্থানে রূপনারায়ণ নদে পতিত হইয়াছে। ইহাও কাটা ক্যানেল।

উপরোক্ত তিনটি ক্যানেলকেই উৎপত্তি, পতিত ও পথিমধ্যে নদী অতিক্রম করিবার স্থানে 'লগ' (কপাট-যুক্ত পুল) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই কাটা ক্যানেলগুলির পথের সমস্ত সরু নদী, খাল ও অববাহিকাগুলিকে রুদ্ধ করায় জল নিকাশ বন্ধ হইয়া বন্যা সৃষ্টি করে।

পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন নদীর ক্ষেত্রে উল্লিখিত সরু নদীগুলির অধিকাংশ লুপ্ত হইয়াছে, কিছু খালের আকার লইয়াছে। এইভাবে সমস্ত জল নিকাশ গণ্ডগোল হইয়া গিয়াছে।

বীরভূম

বীরভূম
১০ ৫ ০ ৫ ১০
স্কেল-মাইল
৮৮° পূঃ
মুরারই
পাইকর
নলহাটি
ব্রাহ্মণী নং
রামপুরহাট
গনপুর
মল্লারপুর
মামুদবাজার
ময়ূরাক্ষী নং
তাঁতিপাড়া
সিউড়ি
সাঁইথিয়া
বাতাসপুর
আমদপুর
বক্রেশ্বর
খয়রাশোল
দুবরাজপুর
কোপাই
লাভপুর
নানুর
কোপাই নং
বোলপুর
ইলামবাজার
রায়পুর
ভেড়িয়া
অজয় নং
অণ্ডাল
২৪° উঃ
৮৮° পূঃ
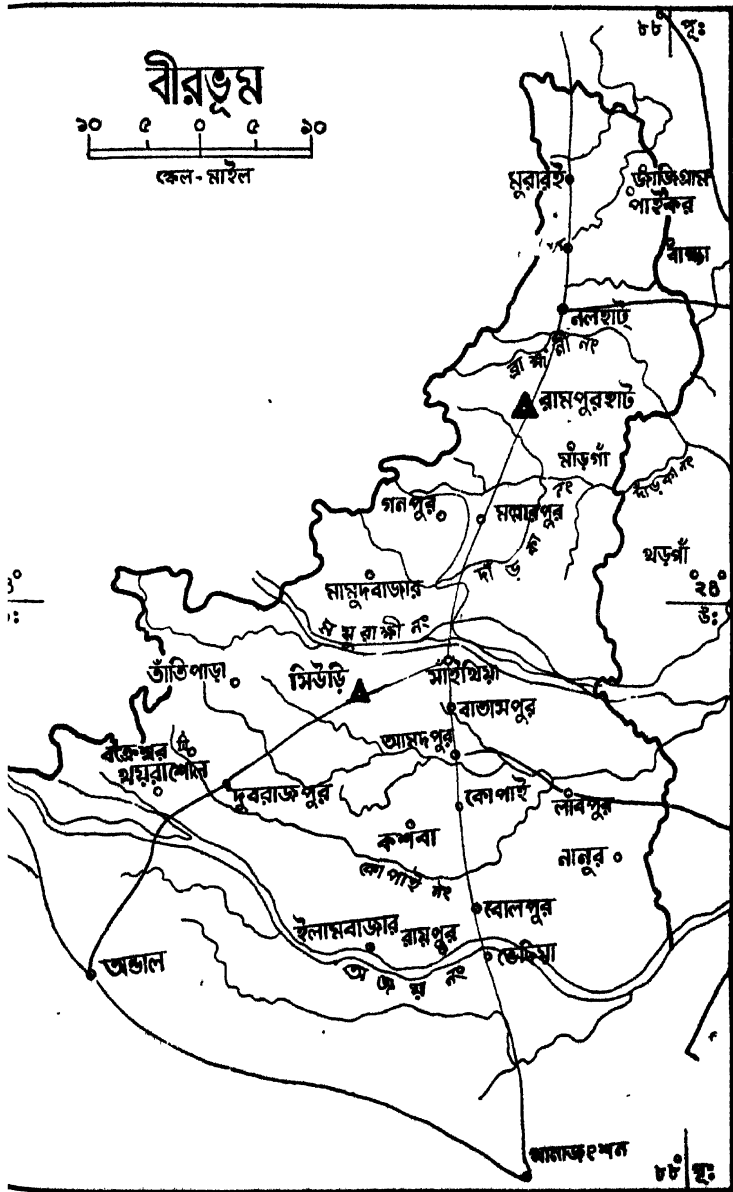
বীরভূম জেলায় দুইটি মহকুমা।

সদর মহকুমার থানা: সিউড়ি, মামুদ (মুহম্মদ) বাজার, সাঁইথিয়া, লাবপুর, নানুর, বোলপুর, ইলামবাজার, দুবরাজপুর, খয়রাশোল, রাজনগর।

রামপুর হাট মহকুমার থানা: রামপুর হাট, নলহাটি, মুরারই, ময়ুরেশ্বর।

মাটি: মেটেল—আমন ধান, আখ, গম, কলাইয়ের জন্য উপযোগী মাটি। রস থাকে। এঁটেল মাটি ভিজা অবস্থায় পায়ে আঁটিয়া যায়, শুকাইলে শক্ত হয় ও ফাটিয়া যায়। বাঘা-এঁটেল একটু লালচে রঙের হয়। শুকাইলে অত্যন্ত শক্ত হয়। ইহা ছাড়া নদীর পাশে যেখানে বন্যায় জল আসে সেখানে পলিমাটি জমে। তরিতরকারী চাষের জন্য ইহা খুবই ভাল।

সিউড়ির ৪ মাইল উত্তর-পূর্বে নগরীতে ভাল নারিকেলী কুল হয়। সাগরদীঘির কাছে ভদ্রপুরে তুঁতপাতা দিয়া রেশমের পোকা পালা হয়।

নদী:—জেলার পশ্চিম হইতে পূবের (ঈষৎ দক্ষিণ) দিকে ঢালু। অজয়, কুয়ে ময়ুরাক্ষী, দাঁড়কা, শাল বা কোপাই, ব্রাহ্মণী ও বাঁশমতী নদী জেলার দক্ষিণ হইতে উত্তর সীমা পর্যন্ত পর পর বিন্যস্ত। সকল সময়ে এগুলিতে জল থাকে না, বর্ষার জল নামিলে ইহারা সময়ে সময়ে ক্রুদ্ধ মূর্তি ধারণ করে ও বন্যায় মাঠ বা গ্রাম ভাসাইয়া দেয়।

বিভিন্ন নদীর মাঝে উচ্চভূমিতে লাল কাঁকুরিয়া মাটি, বেঁটে শালের বন। এক সময়ে এগুলি ডাকাতের আড্ডা ছিল। দুশ' বছর আগে বুনো হাতীর অত্যাচারে গ্রামবাসীরা পীড়িত হইত।

জল:—জেলায় বাঁধ বা পুষ্করিণীর সংখ্যা মন্দ নয়। কিন্তু কুয়া বা পাতকূয়ার যথেষ্ট চলন আছে। সাঁওতাল জাতি নদীর বালি খুঁড়িয়া তাহাতে যে জল জমে, তাহা দু'একবার ছেঁচিয়া ফেলিয়া পরিষ্কার জল জমিলে তাহাই কলসীতে ভরিয়া ব্যবহারের জন্য লইয়া যায়।

ঘরদুয়ার:—মাটির কাঁথ-বিশিষ্ট ঘর বেশি। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ দো-তলা, এমনকি তিন-তলা পর্যন্ত ঘর করে। খড়ের ছাউনি, কোর দেওয়া চাল (ধনুকের মত গোল)।

বাড়ির মাঝখানে উঠান, চারিদিকে অসংলগ্ন কয়েকখানি কুটির থাকে। বীরভূমের মাটি স্যাঁতা নয় বলিয়া পিড়ি বেশি উঁচা হয় না। পূর্বে হয়তো জানালা হইত না, এখন জানালার রেওয়াজ হইয়াছে। পাটি, মাদুর, চ্যাটাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। খাটিয়ারও বেশ চলন আছে।

জ্বালানি কাঠের টান আছে। বোলপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মড়া পোড়াইবার জন্যও কয়লা ব্যবহৃত হয়। জেলার পশ্চিম প্রান্তে কয়লার খাদও আছে, কিন্তু জিনিস তত ভাল নয়।

হাট, মেলা :—(১) মুরারই—জঙ্গিপুর মুর্শিদাবাদের গামছা, পেঁয়াজ বিক্রয় হয়। (২) চাতরা—তরকারীর বেশ বড় হাট দুদিন হয় ও গরুর হাট একদিন। (৩) পাইকর—শিবরাত্রিতে বেশ বড় মেলা বসে। মিষ্টি, মনোহারী জিনিসই বেশি। (৪) জাজিগ্রাম—সাধারণ হাট। কিন্তু কালীপূজা উপলক্ষে জাজিগ্রাম ও হিলোড়ার মধ্যে শ্যামচাঁদের মেলা বসে। এখানে মুর্শিদাবাদের বাসন, কাপড় খুব বিক্রয় হয়, সার্কাসও বসে। (৫) নলহাটি—দুটি জায়গায় ২ দিন করিয়া। বাজারে হিন্দুস্থানী ব্যাপারী আসে। বাঙ্গালী মুসলমান কাপড়ের ব্যবসায়ী। নলহাটি, চাতরা মুরারই, পাইকর এসকল স্থানে দৈ ও ঘি যথেষ্ট পরিমাণ আমদানী হয়। (৬)—রামপুরহাট—দুই জায়গায় ২ দিন করিয়া বসে। আজিমগঞ্জ, ধুলিয়ান, ভাগলপুর প্রভৃতি জায়গার পটল, মাছ, ইত্যাদি চালান আসে। স্থানীয় জিনিসের মধ্যে দই, ঘি, হাতা, খুন্তি, বঁটি, পেরেক, কড়াই, হাঁসকল আসে। ডুমকার কাঠ হইতে বিহারী ছুতোরের তৈয়ারী দরজা, জানালা, চেয়ার, টেবিল, কড়িবরগা আমদানি হয়। রামপুরহাট হইতে ১ মাইল দূরে ব্রাহ্মণী গ্রামে অনেক তেলীর বাস। ইহাদের ঘানি ফুটাযুক্ত, বলদের চোখে ঠুলি। চালানী সরিষা পেড়িয়া তেল বেচে। স্থানীয় তিল হইতেও কিছু তেল মাখিবার ও খাইবার জন্য পেড়িয়া বেচা হয়। (৭) মাড়গাঁ—মুসলমান প্রধান বড় গ্রাম। দৈনিক বাজার বসে, তরকারীর হাট হয়। পৌষমাসের মেলায় তাঁতের কাপড়, সুতার কাজ বেশি। ২॥ মাইল পূবে বসোয়া-বিষ্ণুপুরে রেশমের কাজ হয়। (৮) মল্লারপুরে সাধারণ হাট দুদিন বসে। ৮।৯ মাইল পূবে বীরচন্দ্রপুরে লক্ষ্মীপূজায়, তারাপুরে কোজাগরী পূর্ণিমায় ও কলেশ্বরে শিবরাত্রি উপলক্ষে মহোৎসব বসে। (৯) ময়ুরেশ্বরে সাধারণ হাট। (১০) গণপুরে ছোট বন আছে, তাই হাটে জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায়। (১১) সাটপলসা নদীর ধারে বলিয়া ভাল তরকারীর হাট বসে। অধিকাংশ সাঁইথিয়া ও সিউড়িতে চালান যায়। (১২) সাঁইথিয়া সাধারণ বড় হাট। কিছু তাঁতের কাপড় ও গরু আসে। (১৩) আমদপুর, লাবপুর, রামনগর, দাঁড়কা, কীরনাহার, বোলপুর, নান্নুর, রাহিরি, ইলমবাজার, খয়রাশোল, তাঁতিপাড়া, মামুদ-

বাজারের হাট সাধারণ। (১৪) কেন্দুলীর মেলায় সারা দেশের বাউলদের বৃহৎ সমাগম হয়।

শিল্প ঃ—বোলপুর অঞ্চলে তাঁতের কাপড়, তাঁতিপাড়া ও কেটুগুেতে রেশম ও কেট্যের কাপড় হয়। কোয়া মুর্শিদাবাদ বা চাইবাসা (সিংহভূম জেলা, বিহার গভর্ণমেণ্ট) হইতেও আসে। দাসপলসায় ফার্মে কোয়া বিক্রয় হয়।

কোপাই নদীর ধারে চণ্ডীপুর গ্রামের কাছে কুকুট্যেতে শেওলা দিয়া আখের রস সিদ্ধ করিয়া দেশী চিনি তৈয়ারি হয়।

দুবরাজপুরে বাসন ও লোহার কাজ হয়। রামপুরহাটে কাঠের জিনিস, ইলমবাজারে গালার খেলনা, কেন্দুলীর কাছে পাড়ু, ঘড়া, ঘটি বাটি ইত্যাদি তৈয়ারি হয়।

অন্যান্য—দুবরাজপুরে খুব বড় ও হালকা বাতাসা হয়। সিউড়ির মোরব্বা বিখ্যাত।

সীজে কড্ডাং (দুবরাজপুর থানা) গ্রামের ধর্মরাজ ঠাকুরের হাঁপানির ওষুধ এবং আমদপুরের কাছে বেলিয়াগ্রামের বাতের তেল (ধর্মরাজ ঠাকুরের) বিখ্যাত।

হাবড়া

হাবড়া
স্কেল
মাইল
চাঁপাডাঙ্গা
শিয়াখালা
হরিশপুর
মুন্সীরহাট
বড়গাছিয়া
বালি
চিত্রসেনপুর
জগৎবল্লভপুর
ডোমজুর
হাবড়া
মাজু
নারিট
পানপুর
আমতা
পাঁচলা
সাঁকরাইল
বাউড়িয়া
কুলগাছিয়া
দেউলটি
বাগনান
উলুবেড়িয়া
বজবজ
সপাটি
শ্যামপুর
তমলুক
ফলতা
মহিষাদল
ডায়মণ্ডহারবার
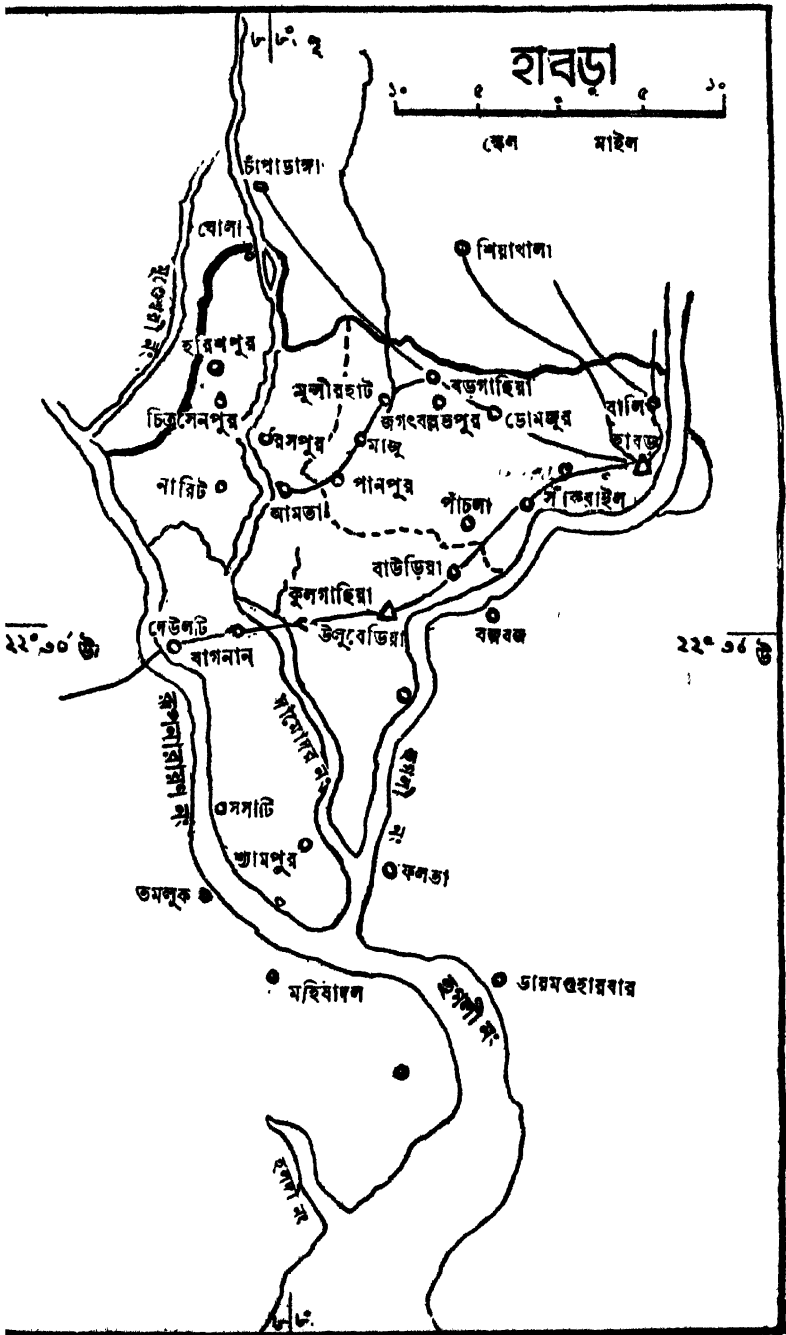
হাবড়া জেলার দুইটি মহকুমা।

সদর বা হাবড়া মহকুমার থানাঃ হাবড়া, ব্যাটরা, গোলাবাড়ী, মালি-পাঁচঘড়া, শিবপুর, বালি, ডোমজুড়, জগাছা, সাঁকরাইল, জগৎ বল্লভপুর ও পাঁচলা।

উলুবেড়িয়া মহকুমার থানা: উলুবেড়িয়া, আমতা, বাগনান, শ্যামপুর ও বাউড়িয়া।

মাটি :— জেলার প্রায় সর্বত্র পলিমাটি মিশ্রিত। তবে নদীর গর্ভ কোথাও বালির ভাগ বেশী, কখনও বা নদীর ধারে আঁটাল পলিযুক্ত মাটি দেখা যায়।

নদনদী :— জেলার পূর্বদিকে হুগলী, দক্ষিণ-পশ্চিমে রূপনারায়ণ ও মধ্য দিয়া দামোদর বহিয়া যাইতেছে। নদনদীর গতি অনুসারে জেলাটিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। ভাগিরথী বা হুগলী হইতে সরস্বতী নদী পর্য্যন্ত উত্তর পুর্ব-অংশ, কৌশিকী ও দামোদর প্রবাহিত অঞ্চল: মধ্য অংশ, দামোদর ও রূপনারায়ণের মধ্যস্থিত অঞ্চল দক্ষিণ পশ্চিম অংশ। দক্ষিণ-পশ্চিম অংশটি অত্যন্ত নিচু, বাঁধ দিয়া রক্ষা করিতে হয়। হুগলী নদীতে জোয়ার ভাঁটার প্রাবল্য দেখা যায়। ফেব্রুয়ারী, মার্চমাসে গঙ্গায় খুব উঁচু বান আসে। ইহাকে 'ষাঁড়াষাড়ি'র বান বলে। সরস্বতী নদী দিয়া ছোট নৌকা করিয়া আন্দুল পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। নদীটি এক কালে খুব বড় ছিল। ২।১ বার বড় বড় নৌকা নদীগর্ভে নিমজ্জিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। 'মাকড়দহ' ঝাপরদহ' প্রভৃতি বড় বড় দহ বা পুকুর এই নদীরই অংশ বিশেষ।

খাল: জেলার মধ্যে অনেক ছোট শাখা নদী আছে। এগুলিকে জেলায় সাধারণতঃ খাল বলা হয়। বালি, রাজগঞ্জ, সাঁকরাইল, সিজবেড়িয়া খাল হুগলী নদীতে পড়িয়াছে। সরস্বতীর নিম্নঅংশ সাঁকরাইল, কৌশিকীর নিম্নঅংশ সিজবেড়িয়া নামে পরিচিত। দামোদরের খালের মধ্যে মাদারিয়া, বাঁশপতি ও গাইঘাঁটা প্রধান। বক্সীখাল রূপনারায়ণের প্রধান খাল।

জলা: জেলার উত্তর পূর্ব অংশে অনেক বিল ও জলা আছে। হুগলী ও সরস্বতী নদীর মধ্যে হাবড়া জলা, সরস্বতী ও কানা দামোদরের মধ্যে রাজপুর জলা, কানা দামোদর ও দামোদরের মধ্যে আমতা জলার নাম করা যাইতে পারে। বর্ষাকালে ধানক্ষেত, জলা, বিল সমস্ত ভরিয়া সমুদ্রের মত দেখায়।

চাষ :—জেলার জলাভূমির ধারে ধারে বা খুব নিচু জমিতে মোটা বোরো ধান লাগান হয়। সুনা জমিতে (একটু উঁচু জায়গায়) আউসের চাষ হয়। মোটা আউসই বেশী করে। মে মাসে লাগায়, অগাষ্ট/সেপ্টেম্বরেই ধান কাটিতে পারে। এখন অনেক জায়গায় আউসের বদলে পাট লাগান হইতেছে। জমির উর্বরতা ইত্যাদি হিসাবে চাষের জমি—আউল—প্রথম শ্রেণীর, দোয়াম—দ্বিতীয় শ্রেণীর, সোয়াম—তৃতীয় শ্রেণীর, চাহারাম—চতুর্থ শ্রেণীর এইভাবে ভাগ-করা হয়। শীতকালে আমন ধানের চাষই প্রধান। (মে-জুন) গ্রীষ্মের শেষে বীজ ধান লাগাইয়া বর্ষায় (জুলাই-আগষ্ট) জমিতে চারা লাগায়। অগ্রহায়ণ-পৌষে ধান কাটা আরম্ভ হয়। বর্ষায় দামোদর নদের বন্যার পর পলি পড়িয়া জমি উর্বরা হয়। ধান ও ধান না হইলে রবিশস্য প্রচুর উৎপন্ন করে। ডালের মধ্যে খেসারী, মটর, মসুরী প্রচুর হয়। যে জমিতে আমন ধান নষ্ট হইয়া যায় সেখানে অনেক সময়ে খেসারী বা 'তেওরা' লাগানো হয়। গরীবেরা এই ডাল বেশী ব্যবহার করে। সুনা জমিতে যেখানে এঁটেল মাটি বেশী আখের চাষ হয়। জেলায় প্রচুর পান বরজ দেখা যায়। পান বরজের জন্য ঝাপরদহ, বাটুল প্রসিদ্ধ। কড়ুই ও কর্পূরজাত পান অতি সুগন্ধিযুক্ত। পানের চাষ বারুই জাতিরাই বেশী করে।

ফল—আম, কলা, নারিকেল, কাঁঠাল, পেঁপে, আনারস, আতা যথেষ্ট হয়। মাকড়দহ কোড়ালা, নিবড়ে, বেগড়ি ও উলুবেড়িয়ার প্রায় সমস্ত গ্রামে প্রচুর নারিকেল গাছ দেখা যায়।

শাক শবজী—খাল ও নদীর ধারে ও অন্যত্র লোকের বসতবাটিতেও লাউ, কুমড়া, মিষ্টিআলু, আলু, ফুলকপি জন্মায়। ডোমজুড় চরের পটল, সাঁতরা-গাছির ওল, আমতার মুক্তকেশীর বেগুন, মূলা, দামোদর চরের তরমুজের নাম আছে। বর্ষাকালে লম্বা লম্বা কুলি বেগুন প্রচুর হয়।

গাছপালা :—বাঁশঝাড় প্রচুর আছে। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী বাঁশঝাড় আছে। জলা জমিতে হোগলা প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে।

জেলায় পতিত জমি কমই আছে। ধান ও পাটের চাষ বাড়িতেছে। বিদেশী চিনি সস্তায় পাওয়া যাইতেছে বলিয়া আখের চাষ কমিয়া যাইতেছে। জমিতে সারের জন্য গোবর ও খইল সাধারণতঃ ব্যবহার করে। জেলায় পশুচারণ ভূমির অভাব। ক্ষেতে বেড়া না থাকায় গরু, ছাগল অবাধে ক্ষেতের শস্য নষ্ট করে।

মাছ :—হুগলী (গঙ্গা) নদীর প্রধান মাছ ইলিশ, ট্যাংরা, ভেটকী। তপসে মাছও খুব পাওয়া যায়। ডায়মণ্ড হারবার হইতে উলুবেড়িয়া পর্য্যন্ত অঞ্চলের তপসের স্বাদ খুবই চমৎকার। বৈশাখ-আষাঢ় মাসে প্রচুর ধরা হয়, উলুবেড়িয়া বাজারে বিক্রি করা হয়। গঙ্গার ইলিশের খুব নাম। রুই জাতীয় মাছ প্রায় প্রত্যেক পুকুরে চাষ করা হয়। রূপ-নারায়ণ ও দামোদরের মাছ খুব মিষ্টি। বর্ষার সময় পুকুরে মাছের চাষ করিবার জন্য দামোদরের পোনা ও ডিম এই জেলার সর্বত্র ও কলিকাতার বাজারেও খুব বিক্রয় হয়। বর্ষার শেষে দামোদরে অতি সুমিষ্ট গলদা চিংড়ী পাওয়া যায়।

ঘরবাড়ী :—হুগলী নদীর ধারে ঘরের চালে সাধারণতঃ চুঙ্গী খোলা বেশী ব্যবহার করে। দেশের ভিতরে বড় খোলার চলন বেশী দেখা যায়। আজকাল বালটিকারী, আন্দুল প্রভৃতি জায়গায় রাণীগঞ্জ টাইলের মত টাইল দ্বারা ঘর ছাইয়া থাকে।

শিল্প :—তাঁত—ডোমজুড়, জগৎবল্লভপুব ও বাগনান থানায় তাঁত বোনাব কেন্দ্র আছে। জগৎবল্লভপুরেব নবাসন গ্রাম মিহি সুতার কাপড়ের জন্য পরিচিত। মোটা ধুতি চাদর, শাড়ী, গামছা বিক্রয় করিবাব জন্য কলিকাতায়, হাবড়ার হাটে, রামকৃষ্ণপুরের হাটে পাঠান হয়। ডোমজুড়েও কিছু মিহি সুতার কাপড় বোনা হয়। ডোমজুড়, আমতা, ও জগৎবল্লভপুর থানাব মেয়েরা অবসর সময়ে চিকনেব কাজ করিয়া থাকে।

কুমোর—জেলাব কোন কোন অঞ্চলে উৎকৃষ্ট টেকসই মাটিব বাসন তৈয়ারী করার উপযোগী মাটি পাওয়া যায়। সেইরূপ অঞ্চলে মাটির নানারূপ বাসন তৈয়ারী হয়। জেলার বাহিরেও ইহা বিক্রয় হয়। জগৎবল্লভপুরের পাতিহালের রান্নার হাঁড়িকুড়ি, সাঁকরাইলের জালা ও দীর্ঘপাত্রের সুনাম আছে। ইহা ছাড়া ডোমজুড়ের মুখোস, চণ্ডীপুরের রংযুক্ত খেলনা অতি সুন্দর। উলুবেড়িয়ায় মাটির ফল, ব্রাকেট পাওয়া যায়।

মাদুর চাটাই—বসন্তপুর, আমতা উলুবেড়িয়ায় সুন্দর মাদুর তৈয়ারী হয়। নমশূদ্র ঘরের মেয়েরা খেজুর পাতা দিয়া চাটাই বোনে। ইহাতে ধান শুকান হয়। কেহ কেহ শয্যারূপেও ব্যবহার করে। হাবড়ায় বেতের ধামা, পোয়া, বাঁশের কুলা, ডালা, ধুচনি, চালুনি, মোড়া টোকা তৈয়ারী হয়। ডোমেরা করে। রথের মেলায় প্রচুর বিক্রয় হয়।

চামড়ার শিল্প—পূর্বে অনেকেই খোল মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, তবলা, বাঁয়া

প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে পারিত। জুতাও অনেকে করিত। বর্তমানে এই সকল শিল্পে অবনতি ঘটিতেছে।

বিবিধ শিল্প ঃ—পাহাড়পুর, আমতা, বাগনানের মুসলমানগণ হলদে রং এর কাগজ তৈয়ারী করিত। ইহাদের কাগজি বলা হইত। আমতা থানায় কলিকাতা গ্রামে ইহারা এখনও এই কাজ করে। সোলার কাজের জন্য বালি ও ডোমজুড় বিখ্যাত। আমতা ও উলুবেড়িয়াতে সোলার টুপি তৈয়ারী করে। কলিকাতায় চালান যায় হাবড়া শহরের নিকটে কয়েকটি গ্রামের লোকেরা দড়ি বিক্রয় করিয়াই জীবিকা উপার্জ্জন করে। পাঁচলা থানার দেউলপুর গ্রাম পোলো বল তৈয়ারী করার জন্য বিখ্যাত। ডোমজুড়ের দফরপুর, কেশবপুরের লোকেদের তালাচাবি তৈয়ারীই প্রধান ব্যবসায়। পাঁচলা গ্রামে পাট দিয়া নকল চুল তৈয়ারী হয়। নারিকেল মালার হুক্কা হয়, ডোমজুড়ে তৈয়ারী হয়। কলিকাতায় চালান যায়। কোড়লার নারিকেল তৈল অতি সুন্দর। বালি হইতে বাউড়িয়ার মধ্যে বালিখালের ধারে ধারে প্রচুর ইট খোলা গড়িয়া উঠিয়াছে। আগে ইটের পাঁজা কাঠ দিয়া পোড়ান হইত এখন কয়লা দিয়া হয়। লোকে বলে কাঠে পোড়ান ইটে নোনা লাগে না। উলুবেড়িয়া ও তাহার আশে পাশের গ্রামে রাণীগঞ্জ টাইলের অনুকরণে টাইল তৈয়ারী হয়। কলিকাতায় চালান যায়।

কামারশালা—হাবড়া জেলার প্রায় প্রতি গ্রামেই কামারশালা আছে। লাঙ্গলের ফাল, কুঠার, বাইশ, খড়্গ, দা, বটি, কাস্তে প্রভৃতি প্রয়োজন মত তৈয়ারী করে। গজাল, পেরেক হাবড়াতে প্রচুর তৈয়ারী হয়। ইহা ছাড়া দেশীয় লোহার কারখানাতে আখমাড়া কল, লোহার সিন্দুক, ট্রাঙ্ক, কড়া, বালতি প্রভৃতি তৈয়ারী হয়।

নৌশিল্প—ছোট নৌকা, শালতি, মালপত্র লইয়া যাইবার বড় নৌকা প্রভৃতি তৈয়ারী হয়।

কাষ্ঠ শিল্প—কাঠের নানাবিধ আসবাবপত্র তৈয়ারী হয়। জগৎবল্লভপুরের গোবিন্দপুর গ্রামে একটি পরিবার ভেনস্তা চেয়ারের মত 'কদম চেয়ার' তৈয়ারী করে।

বিদেশী শিল্প—হাবড়ায় প্রধান শিল্পকেন্দ্র শিবপুর রামকৃষ্ণপুর ও ঘুসুড়ী অঞ্চল। হাবড়ায় বার্ণ কোম্পানী, জোসেফ কোম্পানী প্রভৃতির বহুবৃহৎ লৌহশিল্পের কারখানা আছে।

কার্পাশ শিল্প—প্রধানকেন্দ্র শালকিয়া—ঘুসুড়ী অঞ্চল। অনেকের মতে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে বাউড়িয়াতে প্রথম কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাটের কল—শিবপুর রামকৃষ্ণপুর এবং ঘুসুড়ী অঞ্চলে (হাবড়ার ১৪টি পাটের কলের মধ্যে প্রায় সবগুলিই) অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে ইহাই হাবড়ার প্রধান শিল্প। ২০,০০০ হাজারের বেশী লোক এই শিল্পে নিযুক্ত। ইহাছাড়া ময়দার কল; চিনির কলও রহিয়াছে। শালকিয়ায় দেশীয় লোকের পরিচালিত কয়েকটি তেলের কলও রহিয়াছে। শালকিয়াতে বামারলরি কোম্পানীর লবণ-চূর্ণ করিবার কল, মানিকপুরের কিলবার্ণ কোম্পানীর সিলেটচুর্ণের গোলা, সালিমাব রঙ-এর কারখানা, শিবপুর ও সালিমারে বড় বড় টিম্বার-ইয়ার্ডও আছে। · জাহাজ মেরামত কারখানা দড়াদড়ির কারখানা প্রধানত শালকিয়াতে আছে। বালিতে একটি কাগজের কল আছে।

যাতায়াত :—জেলার মধ্য দিয়া ২টি বেলপথ চলিয়া গিয়াছে—বি, এন রেলপথ ও লাইট রেলপথ। বড়গাছিয়া জংশন হইতে শাখালাইন চাঁপাডাঙ্গা পর্য্যন্ত গিয়াছে। নদী পথেও নৌকা, শালতি, ডোঙ্গা দিয়া যাতায়াত করা যায়। নদীর বাঁধ পথ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অহল্যা বাই রোড ও গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এই জেলার মধ্য দিয়া গিয়াছে।

গঞ্জ-হাট-বাজার—হাবড়া ভারতেব সবচেযে বড রেলওয়ে ষ্টেশন ও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। আমতায় রাণীগঞ্জ হইতে কয়লা ও মেদিনীপুর হইতে লবণ আমদানী হইত এবং নৌকাযোগে দামোদর পথে দেশের নানা জায়গায় রপ্তানী করা হইত। আমতার দামোদরের তীরের কিছু অংশের নাম বন্দর। বামকৃষ্ণপুবে অনেক চাউলেব গোলা আছে। সুন্দরবন, মেদিনীপুর, উলুবেড়িয়া হইতে নৌকাযোগে ও হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম হইতে রেলযোগে এই অঞ্চলে প্রচুর চাল আমদানী হয়। সালিমার ও শিবপুরগঞ্জে বর্মা হইতে সেগুন কাঠ আমদানী হয়, এখানে অন্যত্র চালান যায়। হাবড়ায় প্রচুর গম ও পাট আমদানী হয়। শনিবার উলুবেড়িয়ার হাটে গরু মহিষ বেচা কেনা হয়। হাবড়ায় মঙ্গলবারে একটি দেশী কাপড়ের হাট বসে।

মেলা :—বলুহাটি হইতে ২ মাইল দক্ষিণে গয়েশপুর গ্রামে পীর গায়েস উদ্দিনের মসজিদ ও আস্তানা আছে এখানে পৌষ সংক্রান্তিতে বড় মেলা হয়। গয়েশপুরের কাছে নার্ণার কালীমন্দির ও পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দির

আছে। পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দিরের মাটি গায়ে মাখিলে বাত সারে বলিয়া লোকের বিশ্বাস। চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে বৃহৎ মেলা হয়।

হাবড়ার শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন্‌স একটি অতি সুন্দর মনোরম উদ্যান।

সামাজিক অবস্থা :—রেলপথ, নূতন নূতন কলকারখানার প্রতিষ্ঠার ফলে শ্রমিকের চাহিদা বাড়িয়াছে। সাধারণ জনমজুর ছোট চাষীদের অবস্থার পরিবর্তন আসিয়াছে। জনমজুরী বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু অপর পক্ষে চাষের জিনিষের দামও বাড়িতেছে। শহর বা অন্যত্র যে সকল মধ্যবিত্ত গৃহস্থ নির্দিষ্ট বেতনের উপর নির্ভরশীল তাহারা জিনিষপত্রের দাম ক্রমাগত বাড়িয়া যাওয়ায় ক্রমশঃ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছে।

জেলায় হিন্দুর সংখ্যা বেশী, মুসলমানও কম নহে। ইহা ছাড়া বাগ্দী, রাজবংশী, নমঃশূদ্র, ক্যাওড়া যথেষ্ট সংখ্যক আছে। কিছু সংখ্যক সাঁওতালও আছে।

বাঘ বা সাপ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'বাঁকুড়া রাই' বা 'মনসা' পূজার প্রচলন আছে। নানা রোগের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য 'পঞ্চানন', 'শীতলা', ওলাবিবি, ঘণ্টাকর্ণ, জ্বরাসুরের পূজা করা হয়। শিশু ও অন্য সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া ষষ্ঠী', সত্যনারায়ণ, মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা করে। সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরকে মুসলমানগণও মানে। এইসব দেবতার সাধারণতঃ কোন মূর্ত্তি পূজা হয় না।

— ——